আর একদিন

গোপাল হালদার

বেঙ্গল পাবলিশার্স ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রথম মুদ্রণ—আশ্বিন, ১৩৫৮

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদপট-পরিকল্পনা—

আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

মুদ্রাকর—শ্রীকার্তিকচন্দ্র পাণ্ডা

মুদ্রণী

৭১, কৈলাস বোস ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ—

ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও

বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

চার টাকা

কবিকিশোর

সুকান্ত ভট্টাচার্যের

উদ্দেশে

লেখক

৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫১

লেখকের কথা

'একদা' ও 'অন্যদিনের' মত এ গ্রন্থও লেখা আরম্ভ হইয়াছিল আলীপুরের প্রেসিডেন্‌সি জেলে। তখন ১৯৪৯ এর মে মাস। কিন্তু লেখা শেষ হইয়াছিল ১৯৪৯-এর আগষ্ট মাসে, পাটনায়।

যাঁহারা 'একদা' ও 'অন্যদিন' পড়িয়াছেন তাঁহারা সহজেই বুঝিবেন—'আর একদিন' সে কাহিনীরই শেষ স্তবক; এবং অন্য গ্রন্থ দুইখানির মতই ইহাও স্বয়ং-সম্পূর্ণ।

একটি বিশেষ দিনকে অবলম্বন করিয়া এই কাহিনীও উদ্‌ঘাটিত। সেই দিনটি কাল্পনিক না হইলেও যাঁহারা সেই দিনের সাক্ষী তাঁহারা জানেন, এই গ্রন্থের চরিত্র ও ঘটনা সবই অন্যরূপ; তাঁহাদের কাহারও সহিত, সেদিনের কিছুর সহিত, ইহার সম্পর্ক নাই। এই অর্থে ছাড়া, মানুষ ও ঘটনা সবই সত্য—যতটা সত্য তাহা গল্পে-উপন্যাসে।

মুদ্রণের ভুল-ত্রুটির জন্য লেখকও দায়ী, শুধু মুদ্রালয় নয়। পাঠক তাহা মার্জনা করিবেন। ইতি

৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫১।

লেখক

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

কথা-সাহিত্য :

একদা, অন্যদিন, আর একদিন ;
পঞ্চাশের পথ, উনপঞ্চাশী, তের শ' পঞ্চাশ ;
ভাঙন, স্রোতের দীপ, উজান গঙ্গা ;
ধূলিকণা (কথা-সংগ্রহ)

প্রবন্ধ-সাহিত্য :

সংস্কৃতির রূপান্তর ; বাঙালী সংস্কৃতির রূপ ; বাজেলেখা ; এযুগের যুদ্ধ

এক

নিস্তব্ধ রাত্রির বুকের উপর দিয়া সবুট পদধ্বনি আগাইয়া আসিল।

—অমিতবাবু—অমিতবাবু—

ঘুমের ঘন পর্দাটা ধরিয়া কে যেন টানাটানি করিতেছিল, এবার বুঝি নখাঘাতে তাহা ছিঁড়িয়া গেল। শয্যায় উঠিয়া বসিতে বসিতে অমিত বলিল,—কে ?

খোলা দুয়ার হইতে টর্চের আলো আসিয়া শয্যায় পড়িতেছিল।

থানা থেকে আসছি আমরা।

বিস্মৃত একটা বাস্তব। অপ্রত্যাশিত এই আবির্ভাব। মন তখনো তাহা সম্পূর্ণ স্বীকার করিয়া লইতে পারে নাই। তথাপি অভ্যাস মত শিয়রের নিকটস্থ সুইচটা টিপিয়া দিতে দিতে অমিত আবার বলিল,—কে ?

পরমুহূর্তেই আলোকিত গৃহের দ্বারে তাহার অস্পষ্ট ধারণা ও সেই অর্ধগৃহীত তথ্য এক রূঢ় জীবন্ত সত্য হইয়া উঠিল : রাইফেলধারী একজোড়া গুর্খা পুলিশ ; দুইজন পুলিশ কর্মচারী—একজন খাকী-পরা থানার দারোগা, অন্যজন মুফতিতে ; শার্টের উপরে কোট পরা যুবক, গোয়েন্দা সাব-ইন্‌স্‌পেক্টর।

উন্মোচিত এবার রাইফেলের রাজত্ব। ঝুটা হইয়া গিয়াছে তবে' ৪৭ এর ঝুটা স্বপ্ন ?—অমিতের মন আপনাকেই আপনি জানাইয়া দেয়।

—নমস্কার, স্যর। ঘরের মধ্যে পদার্পণ করিতে করিতে বহু পরিচিত শিষ্টাচারের সংগে বলিল গোয়েন্দা বিভাগের যুবকটি।—সার্চ করতে হবে একবার—

সংগে সংগে অন্যরা আসিয়া দাঁড়াইল তাহার পার্শ্বে ও পিছনে।—আমাদের সার্চ করে নিন।—এই পিস্তলটা আছে ; আর জামা, পকেট দেখবেন নিশ্চয়ই—

প্রয়োজন নেই,—জানাইল অমিত।

প্রিয়দর্শন যুবক। স্বাস্থ্য আছে, রূপ আছে, বুদ্ধিও সম্ভবত আছে। গোয়েন্দা পুলিসের কাজ করে; হয়ত আজ কুণ্ঠামুক্ত:—স্বাধীন দেশের 'দুষ্কৃতি বিমর্শ বিভাগের' কর্মচারী। যুবক বলিল, আসতে পারি ত? মানে, আপনি ত ব্যাচেলর—ঘরে আর কেউ নেই—

জানা কথাটাই সে সুনিশ্চিত করিয়া লইবে—নিজের সংশয় আছে বলিয়া নয়; নিজের বুদ্ধি ও কাল্‌চার আছে, তাহা প্রমাণিত করিবার জন্য। অমিত তাহা বুঝিল; তাই হাসিল, বলিল,—হ্যাঁ, আমি একাই।

আর জিজ্ঞাসা করিল নিজেকে: তুমি একা, অমিত? একা তুমি?…ইন্দ্রাণী সবিতা—অথবা অনু, মনু…তাহারা কেহ তোমার নয়? কোনো জীবন-সঙ্গিনীর সঙ্গে জীবনের নব-রস আস্বাদন করিয়া লও নাই তুমি, তা'ই না? কিন্তু তাই বলিয়া একা কি তুমি—আগামী দিনের মানবসন্ততির সংগে যে-তুমি তোমার সত্তার সান্নিধ্য তোমার কর্ম ও চেতনার মধ্য দিয়া অনুভব করো আজও,—উপলব্ধি করো তোমার দেহের রক্তধারায়, তোমার বাহুর পেশীতে ভবিষ্যত মানুষের সে আলিঙ্গন-আভাস…সেই তুমি একা?

—আপনার বোন্ অনু—মানে, মিসেস রায় ও মিষ্টার রায়, অর্থাৎ ইয়ে শ্রীঅনুজা রায় ও শ্রীশ্যামল রায়—তাড়াতাড়ি নাম দুটিতে স্বাধীন রাষ্ট্রের পরিভাষা-সম্মত মর্যাদা যোগ করিয়া একটু আত্মপ্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকাইল স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের যুবক। তারপর বলিল,—তাঁরা কোন ঘরে থাকেন?

মুহূর্ত মধ্যে অমিত সতর্ক হইয়া উঠিল: কি চাই এই পুলিশদের? কাহাকে চাহে ইহারা? অনুকে ও শ্যামলকে? অমিতকে চাহে না নাকি তবে?… 'সার্চ'ও নয় শুধু তবে?—মনে মনে অমিত জিজ্ঞাসা করিল: এ স্পেক্‌টর ইজ হন্টিং দি ওয়ার্ল্ড?…হাঁ, এ স্পেক্‌টার ইজ হন্টিং দি ওয়ার্ল্ড।

—কোথায় তাঁরা?

অমিত বলিল, তাঁরা কেউ এখানে নেই।

চকিত, সন্দিগ্ধ, শাণিত হইয়া উঠিল অমনি যুবকের আত্মতৃপ্ত দৃষ্টি।—নেই কেমন? নিশ্চয়ই আছেন—আমরা জানি।

অমিতের সন্দেহ রহিল না—এ স্পেকৃটর ইজ্ হন্টিং বিল্লি! সে হাসিল।

—একটু ভুল জানেন। আগে থাকতেন—এখন নেই।

কোনটা তাঁদের ঘর?

পাশের ঘরে ছিলেন।

ঘরটা দেখতে হচ্চে। আসুন,—বলিয়া অমিতকে সে-ই ডাকিল।

একজন রাইফেলধারী অমিতের ঘরে পাহারা রহিল। অন্যেরা তাড়াতাড়ি চলিল পার্শ্বের ঘরের উদ্দেশ্যে। দুয়ার বন্ধ। বাহির হইতে তালা দেওয়া।

আমিত ডাকিল,—সাধু।

ফ্ল্যাটের প্যাসেজের ছায়া হইতে উত্তর হইল,—বাবু।

চাবিটা দে।

ফ্ল্যাটের দুয়ার খুলিয়া দিয়া এতক্ষণ হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল সাধুচরণ। সেখান হইতে এবার ভীতপদে সে অগ্রসর হইয়া আসিল; কম্পিত হস্তে তালা খুলিয়া দিল। ঘর অন্ধকার। তথাপি বুঝা যায় ঘরে কেহ নাই। স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের যুবক কিন্তু গৃহদ্বারে ইতস্তত করিতে লাগিল; ঝুঁকিয়া মাথা বাড়াইয়া দিল ঘরের মধ্যে। কাহার হাতের টর্চ্চও জ্বলিয়া উঠিল। তীব্র আলো ঘরের খানিকটা অংশকে উজ্জল করিয়া তুলিল, অস্বাভাবিক করিয়া তুলিল ঘরটাকে।

চেয়ার, টেবিল, তাক-ভরা বই, আর তোরঙ্গ, সুটকেশ, ছোট তক্তাপোষ, বিছানাপত্র—মানুষের ব্যবহার্য সবই আছে। মানুষ এই ঘরে থাকে, সন্দেহ নাই। কিন্তু মানুষ নাই এ মুহূর্তে, তাহাও নিঃসন্দেহ।

অমিত উত্তেজনাহীন হস্তে আলোর সুইচ্ টিপিয়া দিল।

একটু বিভ্রান্ত বিক্ষুব্ধ হইল যুবক গোয়েন্দা কর্মচারী। পরক্ষণেই অমিতের দিকে তাকাইয়া স্বাভাবিক কণ্ঠে বলিতে গেল,—কেউ নেই, না?

দেখতে পাচ্ছেন।

কিন্তু এ ঘরেই থাকেন তাঁরা। আপনার বোন অনুজা দেবী আর তাঁর

স্বামী শ্যামলবাবু। আমাদের সেরূপই খবর। আর দেখছিও—ওই রয়েছে মেয়েদের কাপড় চোপড়, পুরুষেরও জুতোজামা।

বলেছি, থাকতেন। জিনিষ পত্র সব নিয়ে যাননি এখনো।

ততক্ষণে বাড়িটা দেখিয়া লইবার জন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে ভদ্রলোক। তাহার গতিতে একটা ব্যস্ততা; কিছুতেই চেষ্টা করিয়াও সে তাহা গোপন করিতে পারে না। অথচ গোপন করা তাহার প্রয়োজন;—তাহা শোভনও বটে। কিন্তু গোপনতা সেজন্ত প্রয়োজন নয়। বেশি ব্যস্ততা দেখাইলে, শিকার যদি বা এখনো শিকারীদের আবির্ভাব না জানিয়া এই বাড়িতে কোথাও রাত্রিশেষের নিদ্রায় এখনো নিশ্চিন্ত থাকিয়া থাকে এথনি তাহাদের শব্দ পাইয়া সচকিত হইয়া উঠিয়া পালাইবে;—গোয়েন্দা ভাষায় 'চিড়িয়া' ভাগিয়া যাইবে। গোয়েন্দা কর্মচারীটি সঙ্গেকার সিপাহীকে ওদিককার দুয়ার খুলিয়া ফেলিতে বলিল।

পিছনে বারান্দা আছে না? বারান্দা দিয়ে কোথাও যাওয়া যায় নাকি? —সন্দিগ্ধ ব্যস্ত কণ্ঠস্বর তাহার।

...না, ১৮৪৮ নয়, আজ ১৯৪৮। শুধু আর ইউরোপ নয়, এ স্পেকটার ইজ হন্টিং দি ওয়ার্ল্ড্। সারা পৃথিবী জুড়িয়া আজ এই জুজুর ভয়—ভাবিয়া অমিত স্মিতহাস্যে বলিল,—আপনারাই দেখুন তা। কিন্তু আমাকে যদি দরকার না থাকে তাহলে আমি যাই। ঘুমোইগে।

না, না; আপনি সংগে থাকুন। এখ্খুনি সার্চ সুরু করে দোব। বারান্দা আর ছাদ-টাদগুলো একবার দেখে আসছি তার আগে।—'এনটায়ার প্রেমিসেজ' সার্চের হুকুম রয়েছে কিনা।

ফ্ল্যাটের বাড়ী; বড় না হউক ছোট ছোট গুটি পনের ফ্ল্যাট বাড়িটায়। বলা যায় কি কিছু কোথাও পালাইয়া আছে কিনা অজু বা শ্যামল?

বারান্দা হইতে অমিত দেখিল পথেও চারিদিকে পাহারা; ফটকে জন দুই রাইফেলধারী গুর্খা আর জন দুই লাঠিধারী পুলিশ ও জমাদার। তাহারা

আগেই নির্দেশ পাইয়াছে—'কিসিকো ইয়ে মকান সে বাহার যানে মৎ দো'। 'হুজুর'—স্যালুট ঠুকিয়া জানাইয়াছে গুর্খা সিপাহীও।

এদিক সেদিক দেখিয়া পুলিশের দল ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল আবার অমিতের ফ্ল্যাটের দ্বারে।

—অন্য ফ্ল্যাটের লোকদের আর তা হলে বিরক্ত না করলাম, কি বলেন অমিতবাবু? আপনাদের ফ্ল্যাটের ত কেউ নেই, সেসব ফ্ল্যাটে?

খুঁজে দেখতে পারেন।

না, না; আপনার কথাই যথেষ্ট। তবে আমাদের উপর অর্ডার ওইরকমই কিনা, 'সমস্ত বাড়িটা সার্চ করো'।—লোককে আমরা বিরক্ত করতে চাই না, অমিতবাবু। বিশ্বাস করবেন এ কথাটা,—আপনি পুরনো লোক। তখনো করতাম না, এখনো না। আর এখন ত সেদিন নেই,—আর-এক দিন—আমাদের নিজেদেরই গবর্ণমেণ্ট।

তল্লাশীর সাক্ষীদের ডাকিয়া লইয়া ঘরে আবার প্রবেশ করিল সমস্ত দলটি।

আর-এক দিন সন্দেহ নাই;—হাসিতে কুঞ্চিত হইল অমিতের ওষ্ঠাধর। অনেকটা নিজের মনেই বলিল,—আপনাদেরই গবর্ণমেণ্ট বটে!

কেন? আপনার নয় নাকি? আপনারাই ত সংগ্রাম ক'রে এনেছেন স্বাধীনতা।—একটু পরিহাসের রেশ পুলিশী ওষ্ঠে ও চক্ষে ফুটিয়া উঠিতেছে কি? মুখে কিন্তু অটুট গোয়েন্দা-গাম্ভীর্য।—আমাদের অবশ্য সৌভাগ্য,—স্বাধীন গবর্ণমেণ্টকে সার্ভ করতে পারছি। দেখেছেন ত, এখন মীরা সোম জাতীয় পতাকা তুল্লেন আমাদেরই অফিসে পনেরই আগষ্ট,—

...জাতীয় পতাকা আর মীরা সোম আর পনেরই আগষ্ট—

কিন্তু শেষ হইতে পারিল না ভদ্রলোকের কথা। অমিত গম্ভীর কণ্ঠে থামাইয়া দিল তাহাকে: সে বুঝেছি—এখন আর-এক দিন—আর-এক পালা—। কিন্তু আপনারা এখানে কী চান আজ বলুন ত?

ভদ্রলোক একবার নীরব হইল, তারপর বলিল—কাজের মানুষের মত কাজের

কথা এইবার,—সার্চ ওয়ারেণ্ট দেখবেন কি? এই যে—সার্চ করতে হবে, কন্স্ আর্মস্, এক্স্প্লোসিভস।

কাগজ হইতে মুখ তুলিল না অমিত, কিন্তু নিষ্পলক হইয়া রহিল তাহার চক্ষু। বাঙলায় ছাপা ওয়ারেন্টের মধ্যে কার্বোন কাগজের দাগে দাগে ইংরেজী অক্ষরগুলি সত্যই ক্রমে ভূতপ্রেতের মত নাচিতে লাগিল। তারপর—

…তরুণ সুন্দর দীর্ঘ গৌরবর্ণ এক যুবকের মুখ:—এই গৃহে, ওই আসনেই অমিত সুবীরকে দেখিয়াছে কতদিন। মাদুরের উপর ওখানটিতে বসিয়াছিল—এই সেদিনও। দীর্ঘ দেহ, নব কিশলয়ের সুচিকণতা তাহার গৌর তনু-সুন্দর দেহে, দীর্ঘ ভ্রূ-যুগলের নিচে চঞ্চল চক্ষু, উন্নত নাসা, পাপড়ীর মত ওষ্ঠাধর।

ডিকেন্স্ লেনের ওই গৃহে অমিত আরও কতবার গিয়াছে।—নারায়ণ রাও ব্যাসকে বোধ হয় অমিত প্রথম দেখিয়াছিল এইখানেই? না, 'শঙ্কর উৎসবে'? কিন্তু এইখানেই সে দেখিয়াছে একবার গোলাম আলী খাঁকে—আর কৈয়াজ খাঁকে; শুনিয়াছে আলাউদ্দীন খাঁর সরোদ আর অনোখে লালের তবলা। এইখানে সঙ্গীতের মধ্য দিয়া তেমন দুই একটি মহামুহূর্তের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছে অমিত, যখন মনে হইয়াছে জগৎ ও জীবন-প্রবাহের নিগূঢ় সত্যের কাছাকাছি গিয়া বুঝি সে পৌছিতেছে;—বিশ্ব-ভুবনের কোটি কোটি গ্রহ-নক্ষত্রময় নিবিড় রহস্যের দ্বার বুঝি খুলিয়া যাইতেছে ধ্রুপদে পাখোয়াজের কোন একটি বোলে, খেয়ালের আলাপের মায়াগুঞ্জরণে;—আপনার অবগুণ্ঠিত দল মেলিয়া দিয়া জীবন-সত্য আপনার মর্মকোষ উদ্ঘাটন করিয়া দিতেছে তাহার সম্মুখে। এই গৃহতল, এই প্রাচীর, ওই অঙ্গন, সঙ্গীতের সেই অপূর্ব সত্যের সাক্ষী।…

অতিথিরা ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণ সমুত্তীর্ণ হইয়া গৃহে প্রবেশ করিতেছে। হাস্যমুখর, পুষ্পামোদিত আসরে তাহাদেরই অপেক্ষায় কে সেতারে আলাপ করিয়া চলিয়াছে। কুশলপ্রশ্ন ও পরিচয় শেষে অমিতও অতিথিদের পশ্চাতে চলিতেছে। বিদেশীয় অতিথি তাহারা,—তরুণ যুবক, আর তাহাদের মতই তরুণী বিদেশিনী। বিশ্ব-বন্ধুত্বের ও মুক্তি-অভিযানের

যুক্ত সংকল্প লইয়া তাহারা আসিয়াছে ভারতের দ্বারে; লইয়া যাইবে এশিয়ায় ইউরোপে আমাদের আতিথেয়তার মধুর-স্মৃতি, সানন্দ বাণী। প্রাঙ্গণ উত্তীর্ণ হইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে অমিত—হঠাৎ বাহিরে দুড়ুম করিয়া কী শব্দ হইল? বোমা? পিস্তল, ষ্টেন-গানের আওয়াজ প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। কি ব্যাপার?—অমিত চমকিত হইয়া ফিরিয়া যাইতেছিল দ্বারের দিকে; কিন্তু কাহার দেহ দুয়ার হইতে ছিটকাইয়া পড়িল তাহার গায়ে? রক্ত ফিনকি দিয়া উঠিতেছে কপাল হইতে,—কে? সুবীর না?

বাহিরে বারুদের গন্ধ, বোমার ধূম্ররাশি, ক্রমাগত পিস্তল বন্দুকের শব্দ, আর তাহার ফাঁকে অট্টহাসি। আরও কে একজন পড়িয়া গেল অমিতের সম্মুখে। বিমূঢ়, ত্রস্ত নরনারী বালক বালিকা ছুটাছুটি করিতেছে চারিদিকে। আপনারই অজ্ঞাতে প্রাচীর ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া আপনাকে আড়াল করিতেছে অমিত। আর তাহারই সম্মুখে পড়িয়া আছে সুবীরদের রক্তাপ্লুত দেহ— নবকিশলয়ের মত গৌরবর্ণ সুবীরের সুন্দর মুখ রক্তে আচ্ছাদিত। পড়িয়া আছে সুবেশ, সরল, সঙ্গীত শ্রবণে সমুৎসুক আরও একটি নিষ্প্রাণ যুবক…

বিদেশী অতিথিদের এই সম্বর্ধনার আসরে সুবীরকে সংবাদ দিয়াছিল অমিতই। সুবীর গান গাহিবে; সঙ্গীতের জলসার ব্যবস্থা করিয়াছে তাহার গানের দলের বন্ধুরা এই উপলক্ষে। গান বাঁধিবার, গান গাহিবার নেশাতেই সুবীর অমিতদের সঙ্গে আসিয়া জুটিয়াছিল। বিধবা মায়ের সন্তান হিসাবে সে অনেক কষ্টে পাশ করিয়াছে। তারপর দিনের বেলা কোন্ বাঙালী যুদ্ধ-কণ্ট্রাকটারের আপিসে কেরাণীগিরি করিয়া রাত্রিতে আই, কম্ পড়িয়া তখন সে উঠিয়া গিয়াছিল বি, কমের কোঠায়। কিন্তু বাড়িতে আছে বিধবা মাতা, অনূঢ়া ভগ্নী, ও যক্ষ্মা-সন্দিগ্ধ রুগ্ন অনুজ। আর কুলায় না তাই যুদ্ধের কঠোর দিনে তাহাদের সংসার খরচ। মুনিবের সঙ্গে মাগ্‌গী ভাতার দাবী দ্বন্দ্বে তাহার যে চেতনা ফুটিয়া উঠিতেছিল—গান বাঁধিবার ও গান গাহিবার নেশায় সে তাহার সেই ক্ষোভকে চাপা দিত। আর

গানের আনন্দে ভুলিয়া রাইত তাহার বিধবা মা, অনূঢ়া বোন আর পীড়িত ভ্রাতাকে। কিন্তু একেবারে ভুলিতেও পারিত না। তাই দশটি বন্ধুর সঙ্গে সুবীরও আসিয়া বসিত কখনো সেই কেরাণী ইউনিয়নে, কখনো তাহাদের ক্লাবে। শুনিত কখনো 'পাঠচক্রে' অমিতবাবুর কথা, দেখিত কখনো তাহাদেরই আসরে অমিতবাবুদের নাট্যাভিনয়, গীতোৎসব। তাহাই দেখিতে দেখিতে ও শুনিতে শুনিতে নিজেও গান বাঁধিবার আগ্রহে এক-একবার সে চঞ্চল হইয়া পড়িত; এবং গান গাহিতে গাহিতে নতুন কালের গানের টানে মাতিয়া উঠিত—এমন গান সে গাহিবে যে গানে আর মানুষ ভুলিয়া যায় না তাহার বিধবা মাকে, অনূঢ়া বোনকে, অচিকিৎসিত ভাইকে। এমন গান তাহাকে রচনা করিতে হইবে যাহাতে হরিপদ কেরাণী জানে সে হরিপদ কেরাণীই, সে আকবর বাদশাহ্ নয়।···কে আকবর শাহ্? সে? সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায়? জীবনের অমৃতভাণ্ড ত তাহার মুখ হইতে কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে জন্মের পূর্ব হইতেই সমাজ আর রাষ্ট্রপতিরা। তাহার বিধবা মাতা তাই চল্লিশের তীরে না পৌছিতেই শীর্ণ-বিশীর্ণা,—শ্রান্ত, ক্লান্ত, বিগতদীপ্তি, বিলুপ্ত সমস্ত জীবনাভা। তাহার চৌদ্দ বৎসরের অনূঢ়া ভগ্নী শিক্ষাবঞ্চিতা, —পাড়ার দশটি ক্ষুধার্ত দৃষ্টির আর সমাজের সর্বাঙ্গীণ গঞ্জনার তলায় সে তরুণী আপনার অন্তরে আপনি নিষ্পিষ্টা, আবার আপনার দেহমনে নব-যৌবনের পীড়নে তাড়নায় একই কালে সংকুচিতা আর দুঃসাহসিনী, কুণ্ঠিতা আর চপলা প্রগল্‌ভা। বারো বৎসরের তাহার কনিষ্ঠ ভাইটি অভাবের সংসারে তাহার কচি মুখখানি আর নবাঙ্কুরিত স্বপ্ন লইয়া দাদার-দেওয়া বইএর মধ্য হইতে খুঁজিয়া ফিরে আপনার শয্যাশ্রয়ী আয়ুহীন দিনগুলির সান্ত্বনা।—এই কি আকবর বাদশাহ?—থাক্, আকবর বাদশাহ! জীবনের নির্মম সত্য ভুলিয়া সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায় ভাবিতে পারে কি জীবনের অমৃতপাত্রে তাহার ও তাহার মুনিব ইণ্ডিয়ান্ প্রোডাক্শানের কর্তা যুদ্ধ-কন্ট্রাক্টার মিষ্টার গাঙ্গুলীরই সমান অধিকার? হরিপদ কেরাণী আর আকবর বাদশাহ কোনো খানে কোনো কারণে এক? আর্ট কি এমনি এক রঙীন

মিথ্যার মায়ালোক? যে-মিথ্যা এমন করিয়া মানুষকে প্রতারণা করে—ছলনা করে সুবীর কেরাণীকে আর হরিপদ কেরাণীকে,—তাহা যদি গান হয়, কবিতা হয়, নাটক হয়, চিত্রকলা হয়, বিশ্বসৌন্দর্যের যে-কোনো বাহন হয়, তাহা হইলে,—হাঁ, সত্য কথাই বলেন অমিত বাবু,—সে গান, সে কবিতা, সে নাটক, সে চিত্রকলা, সে শিল্পবস্তুতে আর মজুর বস্তির মদের দোকানে বা তাড়ির দোকানে কী তফাৎ?

—না, না, আমাদের শিল্পকলা আপনাকে ভুলবার জন্য নয়—দুঃখদৈন্যকে ভুলবার জন্যও নয়। না, আর্ট কখনো আফিম নয়, তাড়ি নয়। সে বরং সত্যকে মনে করিয়ে দেবে,—মনে করিয়ে দেবে জীবনের বাস্তবকে—দুঃখকে দৈন্যকে;—আর মনে করিয়ে দেবে জীবনের অপ্রতুল সম্ভাবনাকেও,—মনে করিয়ে দেবে আপনাকে আপনার কাছে,—মনে করিয়ে দেবে মানুষকে মানুষ বলে—আর জাগিয়ে দেবে মানুষের এই মহান্ আত্মোপলব্ধি—"man makes himself"—

অমিতের সঙ্গে সেই পরিচয়ের দিনটি সুবীরের ঝাপ্‌সা হইয়া যাইতেছিল; মুছিয়াও যাইত একদিন অমিতের এই সব কথা—দুইজনার অনেক-অনেক দিনের স্বচ্ছন্দ পরিচয়ের মধ্য দিয়া। অমিতেরও মনে থাকিত না বেলেঘাটার কোন-একটি আসরে একদিন এই সুন্দর সুচিক্কণ-দেহ তরুণ আপনার প্রত্যয়ভরা যৌবন-দৃষ্টি লইয়া অমিতকে বলিয়াছিল,—'সত্য কথাই বলেছেন আর্ট আফিম নয়। কিন্তু একথাই আমাদের ভুলিয়ে রাখেন আর্টবাদীরা।' অমিতও ভুলিয়া যাইত বেলেঘাটার সেই স্বল্পালোকিত ঘর, সেই জন ত্রিশ কেরাণী ও মধ্যবিত্ত সাহিত্যাকাঙ্ক্ষী যুবকের আসর, আর সেই দীপ্তশ্রী যুবকের এই প্রথম কথা কয়টি। কিন্তু অমিতকে তাহা ভুলিতে দিল না ডিকেন্‌স্ লেনের সেই সম্বর্ধনা-সন্ধ্যা—সেই রক্তমাখা তরুণ মুখ—সেই বারুদের গন্ধ, বন্দুকের শব্দ, আর গৃহ প্রাঙ্গণে আততায়ীদের সেই উৎকট অট্টহাস্য!

যুদ্ধান্তের পৃথিবীতে ক্ষুদে হিট্‌লারী-গ্যাংষ্টাররা জাগিয়া উঠিতেছে দেশে দেশে—অমিত তাহা জানে। 'অহিংস' কংগ্রেসী নির্বাচন সে দেখিয়াছে, সে দেখিয়াছে

কলিকাতার বুকের উপরে ভ্রাতৃরক্তে পরস্পরের সেই ক্লেদারক্ত তাণ্ডব! কিন্তু কে জানিত আজ এইখানে এই বিদেশীয় অতিথিদের সম্বর্ধনার আসরে—যেখানে সঙ্গীতের উৎসব সন্ধ্যাটিকে আনন্দে মাধুর্যে সুমধুর করিয়া তুলিবে—যেখানে সে কত দিন জীবন-রহস্যের কাছাকাছি গিয়াছে—সেখানে,—ঠিক তাহারই পায়ের কাছে, তাহারই চোখের তলে,—এমন করিয়া সুবীর লুটাইয়া পড়িবে রক্তাপ্লুত মুখে। আর একটিবারও গান ফুটিবে না তাহার কণ্ঠে, চোখে ফুটিবে না একটি চাহনি।···

অমিত আর সুবীরকে দেখে নাই। রক্তপতাকার তলে সেই রক্তমোক্ষণে নিষ্প্রভ দেহ, অর্ধনিমীলিত নেত্র চলিয়া গিয়াছে মৌন শোকযাত্রায়—ক্ষুব্ধ, নিষ্ফল ক্রোধে হতবাক্ সহকর্মীদের স্কন্ধে—শ্মশান ঘাটের দিকে,—মিলাইয়া গিয়াছে শ্মশানভস্মে। অমিত আর দেখে নাই সুবীরকে। অন্যরা খোঁজ করিয়াছে তাহার মায়ের, তাহার বোনের, ভাইয়ের। কিন্তু অমিত আজ দেখিল—এখনো দেখিতে পাইতেছে—তাহারই মেজের মাদুরে যেখানে কত দিন সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায় বসিয়াছে—ঠিক সেইখানটিতে এই পুলিশ পার্টির সম্মুখে—সেই নব-কিশলয়ের মত সুচিক্কণ গৌরাভ মুখ—উচ্ছৃত রক্তে তাহা সমাচ্ছন্ন হইয়া যাইতেছে,—আর বাহিরে সেই বন্দুকের শব্দ ও ধোঁয়া, আর সেই বিকট 'গ্যাংষ্টারি' উল্লাসের অট্টহাস্য—সম্মুখে সেই গ্যাংষ্টারি গবর্ণমেণ্টের এই সাক্ষীরা···

আকণ্ঠ বিক্ষোভে অমিতের বুক ভরিয়া উঠিল। ত্রিবাঙ্কুর, ত্রিচিনাপল্লী, শোলাপুর, অমলনের হইতে এই ডিকেন্‌স্ লেন্—এতগুলি দরিদ্র মানুষের রক্তের রেখা কি এই কার্বোন কাগজের মিথ্যা অক্ষরগুলিতে ঢাকা পড়িয়া যাইবে?—'আর্মস্ এণ্ড এক্‌স্‌প্লোসিভ্‌স্'এর এই ধুয়া তোলা ত সেই উদ্দেশ্যেই।

হুকুমের কাগজটা ফিরাইয়া দিয়া অমিত বলিল,—ডিকেন্‌স্ লেনের এটাই বুঝি পুলিসী সাফাই, না?—কণ্ঠস্বর শান্ত, হাসিতে অন্তরের ঘৃণা যথাসম্ভব সংগোপিত। অমিত বলিল, দেখুন তা হলে, ষ্টেনগান ব্রেনগান, কি পান এ ঘরে।—বুক ঠেলিয়া

উঠিতেছিল অদম্য ঘৃণা আর বিদ্বেষ—ডিকেন্‌স্ লেনের নিরপরাধ তরুণদের রক্তকেই যেন ব্যঙ্গ করিতেছে এই মিথ্যার জয়পত্র!

না, না;—গোয়েন্দা যুবক হাসিল।—আপনার কাছে ওসবের খোঁজে আমরা আসিনি। তবে ঘরগুলো দেখতে হবে একবার।

কী দেখবেন, দেখুন।

বইভরা শেলফ্ আলমিরা, টেবিলের উপরকার বোঝাই করা বই সাময়িক পত্র, ঘরের কোণে জমা-করা অজস্র কাগজপত্রের দিকে তাকাইয়া ভাবিত হইয়া পড়িল গোয়েন্দা যুবক। বিপন্ন নিরুপায় বোধ করিল থানার দারোগা—সবই দেখিতে হইবে নাকি?

গোয়েন্দা অফিসার অমিতকে বলিল,—আপনার ত সবই বই;—ঘর-বোঝাই বই।

বই কে বল্‌লে? একস্‌প্লোসিভ্‌স্। সরকারের মতে বই যে বোমা।

ঠিকই বলেছেন—উৎফুল্ল হইল কর্মচারীটি।—বইই ত বোমা। কিন্তু তাতে আমাদের কি? আমরা জানি,—বই বোমা নয়, বই-ই। আপনাকে বলতে কি,—পারলে এক আধটুকু আমরাও ওসব পড়ি, আনন্দও পাই। পুলিস হয়েছি, কলেজের বিদ্যা পুড়িয়ে খেয়েছি অনেক কাল। তা'বলে বইপত্রও পড়্‌বনা, আনন্দ পাব না, একেবারে মুক্‌খু হয়ে থাকব—এমন কি পাপ করেছি? অত বড় চাকরিও করি না যে, পড়াশুনো না করলেও চল্‌বে।

বেশ মজা ত! মানুষটার একটা মজার দিক উঁকি দিতে শুরু করিয়াছে তাহার কথার মধ্য দিয়া। অমিত কুতূহলী হইল।

কাচের ভিতর দিয়া আলমিরাগুলির অভ্যন্তরস্থ বাঁধানো বইয়ের নাম কিছু কিছু পড়িবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিয়া চলে গোয়েন্দা যুবক:—আপনাদের এই মস্কোর বইগুলি কিন্তু অদ্ভুত। এত সস্তায় ওরা দেয় কি ক'রে? এমন ছাপা, এমন বাঁধাই!—'সোভিয়েট শর্ট ষ্টোরির' সংগ্রহটা কিন্তু আমিও কিনেছি,—তার মানে আমার স্ত্রী কিনিয়েছেন তাঁর ভাইকে দিয়ে—তিনি অণ্ডার গ্র্যাজুয়েট্—

শুধু নিজের নয়, স্ত্রীরও সংস্কৃতির পরিচয় দিবার সুযোগ উপেক্ষা করিবে না

সে। এবার অমিত মনে মনে কৌতুক বোধ করিতেছিল—মানুষের কত তুচ্ছ লোভই না আছে। 'আমি কাল্‌চারওয়ালা—আমার স্ত্রী কাল্‌চারওয়ালী' —সহজবোধ্য এই দুর্বলতা। কিন্তু ঔদ্ধত্য বা ইতরতা নাই লোকটার।—অমিত তাহার প্রয়াস বুঝিতে পারিতেছিল; তাই একটু আশান্বিতও হইতেছিল—লোকটা তল্লাশীর নামে বই পত্র তছনছ করিবে না; অন্তত ঘর-দুয়ার লণ্ডভণ্ড করিয়া ফেলিতে বসিয়া যাইবে না। তোরঙ্গগুলি নিশ্চয় দেখিবে,—বইপত্রে তাহা বোঝাই। দেখুক তাহা। বেশি বাড়াবাড়ি না করিলেই হইল।

অমিত জানাইল,—একটা সুটকেসে আছে জামা কাপড়; আর অন্য বাক্স পেঁটরায় বই-ই আছে। আপনার স্ত্রী হয়ত পেলে খুশী হতেন, কিন্তু আপনি যখন পাচ্ছেন তখন আমার থেকে এসব নিশ্চয়ই 'সীজ' করবেন।

সহাস্য গর্বে উত্তর হইল,—একবার খুলে দেখি। আপনাকে নামাতে হবেনা কিছু, উপর থেকে দেখলেই হবে। শুধু দেখা, বুঝলেন না? নইলেই ত দোষ হবে—'ডিউটি' পালন করা হয়নি।

অমিত লক্ষ্য করিতে লাগিল ততক্ষণ—বিছানাটা উল্টাইয়া দেখিয়া লইল থানার দারোগা ও পুলিশে—কিছু নাই।

সত্যই বাক্স উপর উপর দেখিয়াই যুবকটি প্রায় নিরস্ত হইল। অবশ্য পেঁটরার কোণগুলিতে তবু হাতড়াইয়া দেখিল—কিছু হাতে ঠেকে কিনা, পিস্তল বা বোমা।

টেবিলের উপর ছোট বড় নানা সাময়িক পত্র, বই। এখান হইতে ওখান হইতে দুই একসংখ্যা বই, দুই একখানা চিঠি, দুই একটি মাসিক পত্র সে টানিয়া বাহির করিয়া লইতে লাগিল। দেখিয়া আবার রাখিয়া দিল তাহা। ইচ্ছা করিয়া অযত্নে রাখিল না, কিন্তু যেখানে ছিল তেমনটিও রাখিল না। অমিত অস্বচ্ছন্দ বোধ করিল, সংগে সংগে তাহা পূর্বেকার মত সাজাইয়া গুছাইয়া রাখিতে লাগিল। একবার সতর্ক দৃষ্টিতে সে দেখিল টেবিলের সামনেকার ছোট নীল খামখানা গোয়েন্দা যুবকটি হাতে লইয়াছে। কেমন অস্বস্তি বোধ করিল অমিত। গত কল্যকার এই পত্রখানা ইহাদের

হাতে পড়িবে—কে জানিত? কিন্তু একবার চোখ বুলাইয়াই যুবক সে পত্রখানা খামে বন্ধ করিল—বুঝিল ব্যক্তিগত চিঠি। একটা শোভনতা বোধ সত্যই আছে তবে লোকটির। দেরাজের চিঠিপত্র একমুঠা তুলিয়া লইয়া সে বসিল, উল্টাইয়া পাল্টাইয়া আবার তাহা মুঠা ভরিয়া দেরাজে রাখিয়া দিল।

অমিত হাতমুখ ধুইয়া আসিল।

যুবক বলিল, দিল্লী যাচ্ছেন দেখছি।

অন্যান্য চিঠির সংগে নীল খামটা দেরাজে রাখিয়া দিতে দিতে অমিত বলিল, হাঁ। একটা সাহিত্য-সভা আছে দোলের ছুটিতে। তাড়াতাড়ি শেষ হলে হয় এখন আপনাদের এই তল্লাশীর পর্ব।

তল্লাশী আর কতক্ষণ? কিন্তু—কি একটা কথা বলিতে বলিতে অনুচ্চারিত রহিয়া গেল। যে অনুমান অমিত প্রথম মুহূর্তেই করিতেছিল সে অনুমান আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিল তাহার নিজের নিকটে এই উত্তরে। অমিত বলিল, তল্লাশীর পরেও কিছু আছে নাকি? কি ব্যাপার—বলুন না? 'কিন্তু' কি? তৈরী হয়ে নিই'।

একবার থানায় যেতে হবে আমাদের সংগে—

সাধারণ কথার মতই কথা কয়টি যুবক বলিল। ঠিক যেমন সাধারণ কণ্ঠে অমিতকে বলিয়াছিল আঠারো বৎসর পূর্বে এমনি এক প্রভাতে এমনি আর এক গোয়েন্দা কর্মচারী। বলিয়াছিল তাহারও পূর্বে আরও কতজনকে, তারপরে আবার কতজনকে কতবার কত গোয়েন্দা অফিসার। কতখানে তাহারা বলিয়াছে এই কথা কয়টি এত বৎসর;—বলিল আবার আজও—সেই নির্লিপ্ত মার্জিত মামুলী কণ্ঠে সেই অতি সাধারণ কথা কয়টি। সেদিনকার সেই গোয়েন্দা অফিসার ছিল প্রৌঢ়, সমুন্নত দেহ, গম্ভীরকণ্ঠ গম্ভীর প্রকৃতি; এদিনকার এই কর্মচারীটি যুবক, সুদর্শন, আলাপে উৎসুকও—তাহার স্ত্রী সোভিয়েট শর্ট ষ্টোরিজও পড়েন। দুই যুগের দুই বয়সের দুই জীবনের দুই চরিত্রের দুই মানুষ। কিন্তু দুই যুগের পারের সেই দুই বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন কণ্ঠস্বর এই গোয়েন্দা-বিভাগের একই সূত্র উচ্চারণ করিতে করিতে কেমন অভিন্ন হইয়া যায়!—

যেন তাহা দুইটি মানুষের স্বর নয়, উক্তি নয়—কোন একটা অ-মানবীয় যন্ত্রের অপরিবর্তনীয় ধ্বনিমাত্র। দুইটি সুদূর বিভিন্ন কালের কোনো বৈচিত্র্যের চিহ্নমাত্র তাহাতে নাই। মাঝখানে এতগুলি বৎসর যেন ইতিহাসে অস্তিত্বহীন; সমস্ত যুগটা অস্বীকৃত এই অপরিবর্তনীয় সূত্রাবৃত্তিতে—'একবার থানায় যেতে হবে আমাদের সংগে'—

আর-একদিন আজ?······থাকুক জাতীয় পতাকা আর মীরা সোম—আর 'পনেরই আগষ্টের' মিথ্যার কুয়াসা; অপরিবর্তিত আছে—সেই ব্রিটিশী গোয়েন্দার পাঠ, 'একবার থানায় যেতে হবে আমাদের সংগে!'

তাই বলুন—বলিয়া হাস্যমুখর কণ্ঠে উঠিয়া দাঁড়াইল অমিত। ডাকিল—সাধু, চা কর। রুটি-টুটি কি আছে ছাখ্। স্নানও সেরে নিই তা হলে—সারা দিনে আজ আর নাওয়া-খাওয়ার আশা ত নেই।

না, না;—ব্যস্তভাবে যুবক বলিল,—আধ ঘণ্টার মধ্যে চ'লে আসবেন।

হা, হা, হা,—অমিতের হাসি এবার চাপা রহিল না; উচ্ছৃত হইয়া উঠিল। সেই পরিচিত বুলি! এমনি শুনিয়াছিল ঠিক এই কথাও অমিত,—এমনি নিয়ম বাঁধা এই শব্দ কয়টি। এমনি নিয়ম-বাঁধা আগ্রহের আতিশয্য ছিল সেই প্রৌঢ়কণ্ঠে—আঠার বৎসর আগেকার সেই লর্ড সিংহ রোডের গোয়েন্দা সাব ইন্স্পেক্টারের মুখে;—'জাতীয় পতাকা' ছিল না সেদিন—ছিল না তখনো 'পনেরই আগষ্ট।' আচরণে সেই নিয়ম-বাঁধা ইতরতার মত এই নিয়ম-বাঁধা ভদ্রতা; নিয়ম-বাঁধা নিস্পৃহতার মত নিয়ম-বাঁধা আগ্রহ। এই আঠার বৎসরেও তাহা তেমনি আছে; নিয়ম-বাঁধা সেই নিষ্প্রয়োজনীয় তুচ্ছ মিথ্যা কথাটাও বদলায় নাই। ইতিহাস উল্টাইয়া গেল চোখের সম্মুখে, কত হিটলার মুসলিনী তোজো তলাইয়া গেল; ভাঙিয়া গেল ভারতবর্ষ আর বাঙলা দেশ—কিন্তু বদলায় নাই বাঙলা দেশের গোয়েন্দা ইতিহাস, বদলায় নাই, অমিত, তোমাদের ভাগ্য,—বদলায় নাই তাই সাম্রাজ্য-বাদের গোয়েন্দাদের এই অর্থহীন সামান্য মিথ্যাভাষণের অভ্যাসটুকু পর্যন্ত।

এই কথা কয়টাও ছাড়তে পারলেন না আপনারা—এত বৎসরে? এই মিথ্যা কথাটুকুও?

যুবক অপ্রতিভ হইল।—আমরা আর কতটুকু জানি বলুন? আমাদের যতটুকু ইনষ্ট্রাকশন থাকে ততটুকুই মাত্র বলতে পারি।

বেশ ত, ততটুকুই বলুন না? বলুন, গ্রেপ্তার করতে এসেছেন। কেমন, ঠিক ত?

হ্যাঁ। তবে আমাদের বলা হয় না ত কাকে কর্তৃপক্ষ ছাড়বে, কাকে ধরে রাখবে।

তা হলে না বল্‌লেই পারেন—'আধঘণ্টার মধ্যে চ'লে আসবেন'। আজ সমস্ত দিনে যে আর নাওয়া-খাওয়া হবে না, একথাটা অন্তত আমরা বুঝতে পারি।

না, না; ওসব ব্যবস্থা নিশ্চয়ই হবে।

হবে?—হাসিল অমিত—বেশ হোক্। কিন্তু গ্রেপ্তারের ওয়ারেণ্ট আছে, তা বলুন না।—না, তা নেই?

জানেনই ত, ওয়ারেণ্ট এখন আর লাগে না।

ওঃ! অমিত হাসিল। হাঁ, ছয় মাসও দেরী করিতে পারে নাই 'স্বাধীন রাষ্ট্র!' আমাকেই চাই, না অন্য কাহাকে চাই, সে প্রমাণেরও দরকার নাই। সত্যই ত পারিবে কি করিয়া দেরী করিতে? আজ ১৯৪৮ সাল। এশিয়ার দেশে দেশে বিপ্লবের পদধ্বনি!

আপনি জানতে চান, দেখাতে পারি—পকেট হইতে গোয়েন্দা যুবক কাগজ বাহির করিল। টাইপ করা কাগজে গ্রেপ্তারী নামের তালিকা। প্রসন্ন হাস্তে যুবককে প্রীত প্রফুল্ল করিয়া নিজের নামটা অমিত দেখিয়া লইল। দেখিয়া লইল চকিতে অন্য আরো দুই একটি নাম—সৈয়দ আলি, দিলীপ দত্ত, শ্যামল রায়......তবু কিন্তু দুইপাতা জোড়া নামের তালিকার প্রায় কোনো নামই দেখিতে পাইল না।

শ্যামলকে সংবাদটা কি করিয়া দিবে?—দ্রুত বিদ্যুৎগতিতে এই চিন্তা অমিতের মস্তিষ্কে খেলিতে লাগিল। অমিত বলিল,—কত নাম আছে তালিকায়? শ' খানেক হবে, না? 'না' বলছেন কেন, নইলে আমাকে পর্যন্ত আপনাদের খোঁজ পড়েছে।

অমিত সত্য কথাই বলিল। সে ভাবিতে পারে নাই—আজ, এই ১৯৫৮ সালে—পৃথিবীর কোনো বিরাট প্রয়াসের উদ্যোক্তা বলিয়া গণ্য হইবার মত তাহার কোনো শক্তি আছে, যোগ্যতা আছে, আছে দেহবল ও উদ্যম। বয়সের অনিবার্য নিয়মেই সে আজ বিচার-বিশ্লেষণ, চিন্তা ও ভাবনার রাজ্যের অধিবাসী হইয়া উঠিয়াছে। যৌবনের যে-দুর্বার প্রাণচঞ্চল অস্থিরতা পৃথিবীর পথে পথে শত কর্মের, শত উদ্যমের মধ্যে আপনাকে ঢালিয়া দিয়াও নিঃশেষ হইতে চাহিত না, বিশ বৎসর ধরিয়া যাহা গ্রামে নগরে সহস্র-মিছিলে সভায় আপনাকে পরম আনন্দে সমুৎসারিত করিয়া দিয়াছে—যুদ্ধান্তের জন-জাগরণের মধ্যে যে আপনার জীবনস্বপ্নকে মূর্ত করিতে চাহিয়াছিল, আর শেষে বিমূঢ় বেদনায় দেখিয়াছে ভ্রাতৃমেধ; দেখিয়াছে বিভক্ত দেশ, জাতীয় বিভ্রান্তি, জাতীয় ট্রাজিডি;—যৌবন-শেষে পরিণত জীবন-সাধনার পথে সেই অমিত একটু একটু করিয়া উদ্যমের সংগে চিন্তার, কার্যের সংগে কল্পনার, আবেগের সংগে আত্মবিচারের মিলন ঘটাইতে ঘটাইতে চলিয়াছে। তাই যৌবনান্তে আজ সে আপনারই অজ্ঞাতে আপনার জীবন-চাঞ্চল্যকেও যেন একটা ছন্দোনিয়মের মধ্যে গ্রথিত করিয়া লইয়াছে। যৌবনের প্রাণ-প্রাচুর্য স্থিরতর হইয়াছে এবার পরিণত জীবন-দৃষ্টিতে, নিশ্চিততর আস্থায়—ইতিহাসের মহালগ্ন আর দূরে নাই—পূর্বে পশ্চিমে কোথাও। এই যুগের রূপশালায় সে আর তাই শুধু কর্মোন্মাদ রূপকার নাই; সে আজ অনেকাংশে রূপমুগ্ধ জীবন-শিল্পীও, চোখে তাহার নিখিল মানুষের জন্য মমতার মায়াকাজল আর মনে কৌতুকবোধের সরসতা;—দেহে ক্রমস্ফুট ক্লান্তির সঙ্গে ক্রমস্পষ্ট তাহার আয়ুর ক্ষীয়মাণতা, মনে একটা বিদায়ের শান্ত অপেক্ষা—'এবার মোরে বিদায় দেহ ভাই—সবারে আমি প্রণাম করে যাই।'

…কিন্তু এ স্পেক্টার ইজ হন্টিং দি ওয়ার্লড্।—ভুলিয়া যাই কেন সেই কথা? ইতিহাসের এই উজান স্রোতে এই ছেঁড়াপাল, ভাঙাহাল আমার জীবনতরীকেও খুঁজিয়া পায় বুঝি ইহারা এখনো একালের যৌবনের অগ্রে অগ্রে, সকল ঝটিকার মুখে তেমনি অগ্রগামী?—অথচ ভাবিতেই পারি নাই একথা আমি, অমিত।……

'চাঞ্চল্য কোথায় আমার ডানায়?' নিজেকে যে এতদিন কেবলি জোর করিয়া সাহস দিয়াছি—সহস্র মানুষের জীবনে আজ জোয়ার নামিয়াছে—আকাশের তারায়-তারায় নব-জাতকের আশ্বাস বাণী—'ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর, এখনি অন্ধ, বন্ধ করো না পাখা।'—পাখা বন্ধ করিওনা ঝড়ের পাখী। চলো ঝড়ের মুখে।' সেই ভাঙা-হাল ছেঁড়া-পাল, যাত্রী অমিত, ধন্য আমি তবে, সহযাত্রী আমি এখনো দুঃসাহসী যৌবন-যাত্রীদের, অনু ও শ্যামলের, ক্ষেতের মানুষের আর কারখানার মানুষের। কে জানিত ইতিহাসের এ অভিযানে আজও অগ্রগামীদেরই সঙ্গে আমার স্থান? আমার পর্যন্ত খোঁজ প'ড়েছে আজ, খোঁজ পড়েছে—কারণ, এ স্পেকটার ইজ হণ্টিং দি ওয়ার্লড্। আর আমি অমিত, I have been ever a fighter……

নূতন করিয়া গর্বে অমিতের বুক ভরিয়া উঠিল।

গোয়েন্দা যুবক বলিল,—আপনার খোঁজ পড়বেনা, অমিত বাবু? আপনার কেন, কার যে না পড়ছে তা জানি না। রাত্রি ন' টা থেকে কাল আফিসে তৈরী হ'য়ে এসে বসেছি।—কিন্তু বলিতে বলিতে কি তাহার মনে পড়িল, দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল,—বসুন, শ্যামল বাবুর ঘরটা শেষ করি।—তারপর নিরাসক্ত অমায়িক কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—ওঁরা গিয়েছেন কোথায়?

অমিত নিঃসংশয় হইয়াছিল। বলিল,—অনু আর শ্যামল গিয়েছে শ্যামলের মায়ের কাছে পাকিস্তানে।

কথাটা মিথ্যা, কিন্তু এইরূপ সময়ে সত্য বলিবার মত মূঢ়তা অমিতের কোনো কালে ছিল না।

অনুর ঘরে এবার তল্লাশী আরম্ভ হইল। সতর্ক দৃষ্টিতে জিনিস-পত্র যাচাই চলিল।

ভোরের পাখী ডাকিতে শুরু করিয়াছে অনেকক্ষণ। আলো জাগিয়া উঠিতেছে বাহিরের সড়কে। পূর্ণিমা রাত্রির চন্দ্র নিষ্প্রভ হইয়াছিল, কখন অস্ত গিয়াছে। এ বাড়ির ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটেও জাগ্রত মানুষের গুঞ্জন শোনা যায়—'পুলিস আসিল কাহার ফ্ল্যাটে'?—ওপারের ফুটপাতে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসু নেত্রে

প্রতিবেশী ও পথচারীরা দেখিতেছে এপারের বাড়ির কটকে। রাইফেলধারী পুলিশের সজ্জা। সকৌতূহল, বিমূঢ় এক সশঙ্ক দৃষ্টি এদিকে-সেদিকে চারিদিককার মানুষের চোখে। তাহারা মনে করিতেছে—সেই পুলিশ-রাজ আর বন্দুক-রাজ আজও কি তাহা হইলে অব্যাহত?

কত ছোট টুকরা টুকরা চিঠি,—কি তার অর্থ, কি তার ইংগিত কে জানে; কত সামান্য তুচ্ছ কাগজপত্র—অনু ও শ্যামলের শতদিনের সহস্র কাজের নিদর্শন; দেশ-বিদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে কমিউনিষ্ট পার্টির নানা বিচার, নানা প্রশ্ন, নানা বিতর্ক ও বিশ্লেষণ;—এগুলির কি সার্থকতা আজ আছে? ভুলত্রুটির, সত্যমিথ্যার সাক্ষ্যমাত্র। অথচ ইহাদের লইয়াই কাল আপনারই অগোচরে নবজন্মের তোরণে গিয়া পৌঁছয়……

—পাকিস্তানে ওঁরা কতদিন থাকবেন?—নিরাসক্ত গোয়েন্দা কণ্ঠের প্রশ্নে অমিত আবার চমকিত হইল।

নিরাসক্ত কণ্ঠেই ফুটিল অমিতেরও উত্তর,—শ্যামল পাকিস্তানেই থাকছে। অনুও সেখানে চাকরী পাচ্ছে। তবে এখানকার স্কুলের চাকরীটা সে এখনো ছাড়েনি, ছুটি নিয়েছে।

অমিত লক্ষ্য করিল, শ্যামলের মায়ের ঠিকানা পুরানো চিঠি-পত্র হইতে পুলিস সাবধানে সংগ্রহ করিয়া লইতেছে। কে বলে সাধারণ আপ্যায়ন-অভিলাষী কালচার-অভিমানী যুবক সে—স্ত্রী যাহার আণ্ডার গ্রাজুয়েট্? সে সুচতুর গোয়েন্দা কর্মচারী।

আপনার ভাই মনুজবাবু দিল্লীতেই আছেন বুঝি? যাচ্ছিলেন তাঁর কাছে?

অমিত সতর্ক হইল। সহজসুরে বলিল,—হাঁ, আজই তুফান মেলে আমার যাবার কথা—কাল ষ্টেশনে এসে দাঁড়িয়ে থাকবে সে।

কথাটা মিথ্যা নয়। অমিত দেখিতেও পাইতেছে—অনেকের মত মনুর গর্বিত উৎসুক দৃষ্টি দাদার প্রতীক্ষায়। দিল্লীর সন্ধ্যালোকের বসন্ত বাতাসে মনুর সুন্দর কপালের চুল চোখেমুখে আসিয়া পড়িয়াছে। মনের উপরে আনন্দের প্রীতির স্ফুরণ। কিন্তু অমিত কোথায় গাড়ীতে? তারপর চিন্তিত নিরাশ দৃষ্টি লইয়া ফিরিয়া যাইবে মনু—তাহার দাদা আর তাহাকে আপনার বলিয়া

স্বীকার করে না ; স্বীকার করে না মন্নুকে পৃথিবীর দশজনের অপেক্ষা অমিতের নিকটতর বলিয়া, আপনার ভাই বলিয়া। সে স্বীকৃতি অনুই বরং আদায় করিতে পারিয়াছে ; অমিতের জীবনের ধারার সংগে নিজের জীবনের ধারাকে মিশাইয়া দিয়া অনু দাদাকে আপনার সহোদররূপে লাভ করিয়াছে—লাভ করিয়াছে শ্যামলকে। কিন্তু মন্নু দাদাকে লাভ করে নাই—মন্নু কাহাকেও লাভ করিতে পারিলনা। মন্নু নিজকে অভিযুক্ত করে সেই অপরাধে ; অমিতের অনুর জীবনের ধারা হইতে তাহার জীবনের ধারা পৃথক। সে ইতিহাস গড়িতে পারে না, সে ইতিহাস খুঁজিয়া পাইতে চায়। এ সত্য মনে করাইয়া দিবার জন্যই বুঝি এইবারও অমিত আসিলনা ; মন্নুকে কথা দিয়াও অমিত তাহা রাখিল না। এই বসন্ত পূর্ণিমার সাহিত্য-সভায় দিল্লীর এতগুলি ভদ্রলোকের আহ্বানেও দাদা আসিলেন না।—এইরূপই ম্লান-হাস্তে কাল ভাবিতে ভাবিতে মন্নু ফিরিয়া যাইবে দিল্লী স্টেশন হইতে ; সকলের সহস্র অনুযোগ ও প্রশ্নের মধ্যে সে ষ্টেশন হইতে বাহির হইবে অপরাধীর মত—কথা দিয়াও কথা রাখিল না অমিত—দুঃখিত ব্যথিত অপমানিত মনেও ফিরিয়া যাইবে কাল মন্নু।...কিন্তু ভুল, মন্নু, ভুল, আমার প্রাণের সঙ্গে তোমার প্রাণ গাঁথা ; কর্মের না হউক মর্মের বন্ধনে। তুমি না হইলে কে দিতে পারিত অমিতকে তাহার গ্রাসাচ্ছাদন ? সাথী আমরা জন্মাবধি আর মৃত্যু পর্য্যন্ত। —শুনিত পাইবে কি মন্নু কাল দিল্লী ষ্টেশনে তাহার দাদার এই মুহূর্তের এই অস্ফুট গুঞ্জন ?...

সাধু চা অনিল। সঙ্গে খান দুই টোষ্টও। অভ্যস্ত প্রথায় অমিত বলিয়া ফেলিল,—এক পেয়ালা ? আর করিস নি ?

কিন্তু সংগে সংগে নিজের ভিতরে যেন একটা অস্বস্তিকর প্রতিবাদও শুনিতে পাইল : সে কি অমিত ? এ তুমি কি করিতেছ ?—ভদ্রলোকের ভদ্রতা ? একটা জঘন্য শাসকবর্গের জঘন্যতর জীবগুলিকে আদর-আপ্যায়ন করিতে যাইতেছ তুমি, অমিত ?—তুমি, যে জানো ইতিহাসে এই বর্গের পরিচয় 'ট্রেটর ক্লাস', বিশ্বাস-ঘাতক বলিয়া ? যে দেখিয়াছ গভীরতম বিশ্বাসঘাতকতায়

এই শ্রেণী-নেতৃত্ব তোমার দেশের ইতিহাসকেও রক্তাক্ত করিয়া তুলিতেছে,—বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের স্বদেশী গদীয়ান হইয়া এতদিনকার স্বাধীনতা সংগ্রামকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিতেছে; আর যে জানো এই গুপ্তচর জীবগুলি নিজেদের নখদন্তকে আজ চল্লিশ বৎসর ধরিয়া নিশ্চিন্ত নিষ্ঠুরতায় দেশের প্রত্যেকটি মানুষের উপর ব্যবহার করিতে দ্বিধা করে নাই,—এখনও দ্বিধা করে না তোমাকে দংশন করিতে,—দংশন করিতে অনুকে, শ্যামলকে, এই মুহূর্তে আরও তোমার শত সহকর্মীকে, ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রত্যেকটি ছোটবড় সৈনিককে। আর তুমি চা টোষ্ট দিয়া আতিথেয়তা করিবে ইহাদেরই? এত আত্মবিচার ও কঠোর বর্গ-সংবর্ষের প্রতিজ্ঞার পরেও! কেন, অমিত, কেন? ইহারা ধোপ-দোরস্ত পরিচ্ছদ পরিয়া বেড়ায় বলিয়া? তোমারই মত ভদ্রলোক-শ্রেণীর বলিয়া? তাই বুঝি ভদ্রলোকের এই ভদ্রতা?…

সাধু বলিতেছিল,—আরও দু পেয়ালা আনছি।

হাতের কাগজের গুচ্ছ রাখিয়া দিয়া গোয়েন্দা যুবক বলিয়া উঠিল,—না, না, আমাদের দরকার নেই। আপনি খান, অমিতবাবু, খেয়ে নিন; জানেনই তো কখন ছাড়া পাবেন ঠিক নেই।

পশ্চাতে পশ্চাতে থানার পুলিশ কর্মচারীও সঙ্কুচিত কণ্ঠে বলিল,—আমি চা খাইনা। বুঝা গেল, কথাটা সত্য নয়, ভয়ের ও ভদ্রতার কথা মাত্র; এই পক্ষেও ভদ্রলোকের ভদ্রতা। দ্বন্দ্বখণ্ডিত চিত্তে শুষ্ককণ্ঠে অমিত বলিতে চাহিল, খান, করেছে যখন। কিন্তু আত্মদ্বন্দ্বে আরও খণ্ডিত হইয়া পড়িল সেই সংগে সংগে।… ইহারই নাম ভদ্রলোকের সংগে ভদ্রলোকের মত ব্যবহার। কিন্তু 'মানুষের সংগে মানুষের মত' ব্যবহার কি ইহা? কোথায়, ময়লা পোষাকের, ছোট উর্দির ওই ছোট মানুষের সংগে ত আপ্যায়ন করিনা? ঐ গুর্খা সিপাহীকে—সহজ, সাধারণ মানুষকে ঐ চা দিয়া আপ্যায়ন করিবার কথা ত ভাবিনা? কি মূল্য এই ভদ্রলোকের ভদ্রতার? ধোপ-দোরস্ত পোষাকের সংগে ধোপ-দোরস্ত পোষাকীদের আত্মীয়তা: তাহা কি সত্য বলিয়া গ্রাহ্য

ইতিহাসের নিকটে ? কিম্বা সত্য তোমার নিজের নিকটে তা আজ, অমিত ?...

সাধু চা লইয়া ঢুকিতেছে। অমিত বলিল,—সিপাহীজীকে দিয়েছিস ? আগে ওঁদের দে।

বলিতে বলিতে একবারের মত অমিত আপনার মনে সুস্থ বোধ করিল—মানুষকে সে অস্বীকার করে নাই। মানুষকে মানুষ বলিয়া স্বীকার করা, ইহাই ত সত্যকার ভদ্রতা। সে ভদ্রতায় মানুষকে, সাধারণ মানুষকে, অস্বীকার করিতে হয় না; বর্গ-বিভেদের নীতিতে তাহা প্রণীত নয়। অমিত যেন আপনার মধ্যে স্বস্তি পাইল। ..ক্ষমাহীন সংগ্রামের দিবস আজ, সকল ছলনার জাল ছিঁড়িয়া ফেলিতেছে বাস্তব জীবন; হিংস্র জটিল চক্রান্তে ঘেরা সমাজের ও সভ্যতার গতিপথ।—তবু ইহারও মধ্যে মানুষকে মানুষ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, হউক সে মানুষ এই গুর্খা সিপাহীর মত আপনার অজ্ঞানতায় আপন শত্রুর হাতিয়ার—আপনার অচেতনতায় আপনার শত্রু। তবু সে মানুষ—তবু সে মানুষ। আর 'সবার উপরে মানুষ সত্য।'...

হাম্ ?—বিস্মিত গুর্খা সিপাহীর কণ্ঠে অবিশ্বাসের প্রশ্ন, হাম্ পিয়েঙ্গে ?

অমিত বলিল, পিজিয়ে! গুর্খালোগ চায় পিয়েঙ্গে নেহি তব কৌন পিয়েঙ্গে চায় ?—তাহার মজুর-মহলের এই হিন্দীতে অমিত বন্ধুত্ব জমাইতে পারিবে না কি ইহার সঙ্গে ?

তবু গুর্খা সিপাহী বিশ্বাস করিতে পারে না। একবার অমিতের দিকে, একবার পুলিশের কর্তৃপক্ষের দিকে বিস্মিত জিজ্ঞাসায় তাকাইয়া বলিতেছে, হাম্ ? কাঁহে ? কাঁহে ?

পি লাও—একটুখানি চোখ তুলিয়া তাকাইয়া বলিল গোয়েন্দা অফিসর; অর্থাৎ অনুমতি দিল। অমিতের ভদ্রতার সম্মান রাখিল; কারণ, সেও নিজে ভদ্রলোক। 'পি লাও' লক্ষ্য করিল অমিত, 'পিজিয়ে' নয়।

আপলোগ পিয়েঙ্গে নেহি ?—গুর্খা হিন্দীতে সিপাহী প্রশ্ন করিল পুলিশ কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে।

উত্তর না দিয়া কাজে মন দিল তাহারা।

কেমন সন্দেহ ফুটিয়া উঠিল গুর্খার বিস্মিত দৃষ্টিতে। নিশ্চয়ই একটা চক্রান্ত আছে কোথাও ইহার মধ্যে। লেখাপড়া-জানা বাবুলোগদের মতলবই হইল—তাহার মত সরকারের গরীব সিপাহীদের বিপদে ফেলা।

নেহি।—গম্ভীর কঠিন ভাবলেশহীন মুখ।—হাম্ ডিউটিমে হ্যায়।—রাইফেলের উপরে গুর্খা হাতও যেন শক্ত কঠিন হইয়া উঠিল সংগে সংগে।

...এই হাত, এই মুখ, এমনি ভাবলেশহীন কঠোরতায় এখনি তুলিয়া ধরিবে ওই রাইফেল তোমার বুক লক্ষ্য করিয়া—যদি হুকুম করে উহার আপনার শ্রেণীশত্রু। মানুষের হাত—ওই সাধারণ মানুষের রক্তমাংসের হাত—কাঁপিবে না একবারও মানুষের বন্ধু—সাধারণ মানুষের কোনো মমতাময় বন্ধুকে নিহত করিতে,—তাহার বুকে জাগিবে না তোমার জন্য একটি মমতার দীর্ঘশ্বাসও।... এণ্ড হোয়াট্ ম্যান্ হ্যাজ মেড্ অফ্ ম্যান্।...

কিন্তু সাধু জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মুখের দিকে তাকাইয়া আছে যে। অমিত বলিল,—তুই খেয়েছিস, সাধু? নে, খেয়ে নে।

নিজের পেয়ালা হাতে তুলিয়া লইল অমিত।

...ভদ্রতা-অভদ্রতার দৈনন্দিন এইরূপ ছোট জিজ্ঞাসার তুচ্ছ দ্বন্দ্বের ধূলি ধোঁয়ার মধ্যে আমি শেষ পর্যন্ত হারাইয়া ফেলিব নাকি আসল সত্যের ঠিকানাও? চায়ের পেয়ালায় ঝড় তুলিবে—হইব উইণ্ড্ মিলের সংগে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ ও ব্যাপৃত?...

কৌতুকের হাসি উঁকি দিল এইবার অমিতের মনের কোণে: তোমরা হ্যামলেট, না, ডন কুইকসো, অমিত? সর্বদেশের সর্বকালের প্রিন্স অফ্ ডেনমার্ক, না, পৃথিবীর স্বকালচ্যুত শ্রেষ্ঠ নাইট-এরাণ্ট? হয়ত দুই-ই;—এ কালের পরিহাস—এবং আগামী দিনের আশ্বাসও।...

—না, না; আমাদের দরকার নেই, আমাদের দরকার নেই—চা সম্মুখে; পুলিশের অফিসার দুইজন তখনও আর-একবার ভদ্রতা করিতেছে।

—সে বুঝবেন আপনারা,—আপনাদের ডিউটিতে কি হারাম আর কি হালাল।

চায়ে চুমুক দিল অমিত। ঠোঁটে হাসির রেখা দেখা দিল। পৃথিবীর প্যারাডক্স তাহার কৌতুকবোধ এবার জাগাইয়া তুলিতেছে পরিহাস ও আশ্বাস।

তল্লাশী শেষ হইয়াছে। এখন তালিকা তৈরী হইবে। একজন হিন্দুস্থানী পানওয়ালা, একজন পাড়ার নিষ্কর্মা যুবক, আর অপরিচিত তেমনি একটি সাধারণ পথিক—তালিকায় স্বাক্ষর করিবার জন্য অগ্রসর হইয়া আসিল। হোলির আবিরে ও রঙে রঞ্জিত তাহারা, কতকটা হোলির নিশি-শেষের শ্রান্তিতেও তাহাদের দেহ অচল,—সকৌতুকে অমিত দেখিল।···আশ্চর্য এইসব তল্লাশীর সাক্ষী সংগ্রহ ইহাদের। ঠিক কোথা হইতে প্রত্যেক সময়েই তল্লাশীর জন্য জুটিয়া যায় এমনি পানওয়ালা, এমনি অকর্মণ্য মানুষ আর এমনি অপরিচিত পথিক। বিশ বৎসর পূর্বেও জুটিত, আজও জোটে। তখনো যেন সে পাড়ায় আর অন্য মানুষ বাস করিত না, আর আজও যেন এ বাড়ির অন্য ফ্লাটে আর কোনো মানুষ নাই।

সকৌতুকে অমিত দেখিতে দেখিতে উঠিয়া দাঁড়াইল, আমি তা হ'লে স্নান সেরে নিই। ছোট একটা স্যুটকেশে কিছু কিছু কাপড়-জামা সজ্জিতই রহিয়াছে, হোল্ডঅলেও মোটামুটি প্রয়োজনীয় বিছানাপত্র গোছানো আছে—আজ মধ্যাহ্নেই দিল্লী যাইবার কথা ছিল।

···খবরটা পাইবে কি করিয়া আজ শ্যামল? কি করিয়া পাইবে তাহা অনু? শ্যামল এখন দানাপুরে, না মোগলসরাইতে? রেলওয়ে শ্রমিকের কোন কেন্দ্রে সে এখন? ধরা পড়িবে কি সেখানে? সারা দেশ জুড়িয়া আজ হানা দিতেছে সরকার। কোথায়ই বা অনু? আসানসোলে না গিরিডিতে? শ্রমিক মেয়েদের জীবনের তথ্য সংগ্রহ করিবে তাহারা—কোথায় পৌঁছিয়াছে সে এখন? খনিতে, না, রেল কলোনিতে? হোলির সময় বলিয়া যদি না গিয়া থাকে অনুরা শ্রমিক পল্লীতে, খনিতে বা রেল কোয়ার্টার্সে, তাহা হইলে হয়ত অনু এখনও আছে বারানসীতে তাহার শাশুড়ীর কাছে। হয়ত শ্যামলও এখনো লাইনে বাহির হইয়া পড়ে নাই। আর তাহা হইলে সম্ভবতঃ আর তাহাদের এক জনারও খোঁজ পাইবেনা পুলিশ। তাহারা সময় পাইবে। আর সময়

পাইলে শ্যামল নিশ্চয় পালাইবে। সন্দেহ নাই সে আত্মগোপন করিয়া কাজে নিযুক্ত হইবে—যেমন অমিতরা করিয়াছিল যুদ্ধের প্রথমদিকে সেবায়। শ্যামল পালাইবে, কিন্তু অনু কি করিবে? সেও কি পালাইবে? কোথায় পালাইবে? পালাইয়া থাকিতে পারিবে অনু? বড় দুঃখের, বড় কষ্টের যে সেই পলাতক জীবন—অমিতের অভিজ্ঞতায়ও তাহা একটা কঠোর পর্ব। কঠিন পরিশ্রমের সে জীবন। অশনে বসনে বিষম সংকোচে ব্যাহত সে জীবন; খাঁচায়-পোরা মানুষের অবরুদ্ধ সীমাবদ্ধ সে জীবন। নিস্তব্ধ গতিবিধি, নিঃশব্দ হাসি, নিশ্চল প্রতীক্ষা; আর দিনরাত্রি সর্বক্ষণ সর্ব অবস্থায় একটা ক্লান্তিহীন সতর্ক পাহারা; সে জীবন 'স্নায়ুযুদ্ধের' একটা অন্তহীন একটানা অধ্যায়। অথচ তাহাতে স্নায়ু সংগ্রামের তীব্রতা নাই, তীক্ষ্ণতা নাই, আর নাই পৌরুষের পরীক্ষা। আছে শুধু আপনার অচপল স্থৈর্যের ও ধৈর্যের পরীক্ষা। পরীক্ষা বিশেষ করিয়া তাহাদের যাহাদের জীবন এখনও সরস গতিময়; যৌবনের অফুরন্ত আশা আর সাহসে যাঁহারা অস্থির গতিচঞ্চল; কর্মচঞ্চল দিনরাত্রির মধ্যে পৃথিবীকে যাহারা আকণ্ঠ পান করতে চায়—অনুর মত। সেই কঠিন পরীক্ষা অনুর সম্মুখে। সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে তোমাকে, অনু।—আর তাহার পূর্বে ধরা পড়া চলিবে না তোমাদের, অনু ও শ্যামল।...একই সঙ্গে মমতা ও কর্তব্য নির্দেশের গাম্ভীর্যে অমিতের মন ভরিয়া উঠিয়াছে পিতৃহীনা অনুর সে দাদা, বন্ধু।

সংবাদটা তাহাদের দেওয়া চাই। অনুকে শ্যামলকে কি ভাবে জানানো যায় এইকথা? কে পারিবে এ সংবাদ তাহাদের কাছে পৌঁছাইয়া দিতে? কে দিবে তাহাদের এসময় আশ্রয়? কে? কে?......

স্নানঘরের দ্বার খুলিতেই দণ্ডায়মান গুর্খা সিপাহী তাহার চোখে পড়িল। আর চোখে পড়িল সেই গুর্খার চোখের আশ্বস্ত দৃষ্টি—স্নানঘর হইতে অমিত তাহাকে ফাঁকি দিয়া পলায়ন করে নাই। অমিত হাসিয়া ফেলিল। বলিল,—চিড়িয়া নেহি ভাগা।

এক মুহূর্তের জন্য সেই গুর্খার মুখেও হাসি ফুটিল। সলজ্জ হাসিতে সেই গুর্খা মুখের সমস্ত সারল্য ও মানবীয়তা যেন আর একবার আত্ম-ঘোষণা করিল

অমিতের সম্মুখে। আর রাইফেল-উর্দি নোকরি-নিমক, বাস্তব ও ভাবলোকের সমস্ত বন্ধনের মধ্য হইতে যেন ফুটিয়া উঠিল সেই দার্জিলিং-কালিম্পং এর চা বাগানের কর্মক্লান্ত মানুষ: 'ছট-বাহারে'র গৃহহীন গুর্খা মেয়ে-পুরুষ। এই ত মানুষের অনির্বাণ আত্মার জয়পত্র—সহজ মানুষের সহজ হাসি। —সিপাহীজী হাসিতেই এই সহজ স্নান-স্নিগ্ধ দেহে অমিত এক মুহূর্তে যেন আবার পাঠ করিল সেই চিরদিনের ঘোষণা—'সবার উপরে মানুষ সত্য'।

চায় নেহি পেয়েঙ্গে আপ?—জিজ্ঞাসা করিল অমিত।

হাসি-ভরা মুখ এবার লজ্জারক্ত হইল।—বাবুলোগ পিলিয়া।

আপ নেই পিয়েঙ্গে?—এবার উত্তর নাই। কিন্তু মুখের হাসি-মিলাইয়া যায় নাই। অমিত গৃহে প্রবেশ করিতে করিতে বলিল,—সাধু আর দু পেয়ালা—এক পেয়ালা সিপাহীজীকে আর এক পেয়ালা আমাকে। হ্যাঁ, একটু ভালো ক'রে কর—কি জানি আবার তোর হাতে চা কবে খাব? আর খাব কিনা তারই বা নিশ্চয়তা কি?

ভদ্রতার রীতি-নিয়মে গোয়েন্দা কর্মচারী বলিল,—না, অমিত বাবু, কি আর হবে? হয়ত ক' ঘণ্টা ব'সে থাকতে হবে, বড় বড় সাহেবকর্তারা কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করবেন।

অমিত হাসিল, হয়ত ক' ঘণ্টা, হয়ত বা ক' বৎসর, বেশি হলে বড়জোর বাকী জীবনটুকু—

ভদ্রতার নিয়মে গোয়েন্দা কর্মচারী বুঝাইতে চাহিল—তাহা নয়।

অমিত স্যুটকেশ ভরিয়া লইয়া প্রস্তুত হইতে লাগিল।·· কয় ঘণ্টা না কয় বৎসর? ঠিক কি তাহার? ইতিহাস মুখর হইয়া উঠিয়াছে ইতিমধ্যেই। সংগ্রামের উদ্যোগপর্ব আজ আর অনিশ্চিত নাই। বিপ্লবের জোয়ার জাগিয়াছে সপ্তসাগরের সকল তীরে। দুঃসাহসের নেশায় তোমরাও তাহাতে ভাসাইয়াছ তোমাদের নতুন পালের নতুন তরী। পাড়ি দিতেছ এই তুফানের মুখে—মুক্তি-মহাতীর্থের উদ্দেশ্যে। আর নয়াদিল্লী আজ নিউ ইয়র্ক-লণ্ডনের সংগে গাঁটছড়া বাঁধিয়া বসিয়া গিয়াছে নানকিংয়-এর মত।

ভারতের মহামালিকেরা আজ তাঁবেদার সেই সাম্রাজ্যবাদীদের। তোমার জাতীয় নেতারা আজ জাতে উঠিতেছেন মাউণ্টব্যাটেনের সমাজে, আর তোমার জাতীয় সংগ্রামের সেনানীরা আজ দালাল সেই কমনওয়েলথী স্বাধীনতার—পারমিটে দালালিতে আজ তাহারা মারোয়াড়ীর বাড়া।...

দশ বৎসর পূর্বে জেলের অভ্যন্তরে বসিয়া সেদিন ভূজঙ্গ সেন বলিয়াছিল অমিতকে, 'অমিত বাবু, এ দেশটাকে আমরা রুশিয়া বানাতে দেব না। আপনাদের সর্বহারাদের না হয় হারাবার মত কিছু নেই—শৃঙ্খল ছাড়া। আমাদের 'স্বদেশীদের' কিন্তু হারাবার মত মহৎসম্পদ আছে : এই ভারতবর্ষ, তাহার সভ্যতা, আর আমাদের ত্রিশ বৎসরের এই তপস্যা।'

সেদিনও অমিত জানিত ভূজঙ্গ সেনের কথাটা মিথ্যা। ভূজঙ্গ সেন হারাইতে রাজী নয় তাহার ভদ্রশ্রেণীর স্বার্থ, উপদলীয় নেতৃত্ব, তাহার আপন ক্ষমতাপ্রিয়তা। তাই ভুজঙ্গ সেনেরা সেই ভারতবর্ষ ও তাহার সভ্যতা লইয়া আজ চোরাকারবার ফাঁদিতেছে দিল্লীর কন্‌ষ্টিটিউয়েণ্ট এ্যাসেম্‌ব্লির লবিতে।

'বার্সিলোনার পতন হয়েছে'—'বটে?' তর্ক চলিতেছিল। বন্দী অমিত সঙ্গী বন্ধুদের তর্ক শুনিতেছে। সাধারণতঃ ভূজঙ্গ সেন এইসব যুবকদের দিকে তাকান না। ভ্রমণ করেন নিজের নিয়মে—অবশ্য কোন কথা তাঁহার কান এড়ায় না। কিন্তু তাই বলিয়া—তিনি ভূজঙ্গ সেন—ইহাদের কথাবার্ত্তা তাঁহার কানে যায়, তাহা স্বীকার করিবেন নাকি? জাতীয় জীবনের বৃহত্তম সমস্যা তাঁহার ধ্যানের বিষয়, ছোকরাদের কথাবার্ত্তা নয়। কিন্তু কথাটা বলিতেছে কে? তাঁহারই দলের দক্ষিণা না? দাঁড়াইলেন ভূজঙ্গ সেন।

'পতনটা কাকে বলে দক্ষিণা? বার্সিলোনার পতন হয়েছে, না, উদ্ধার হয়েছে?'

দক্ষিণা ভীত ভাবে দাদাকে বলিল, 'ওঁরাই বলছিলেন শব্দটা—আমি অবশ্য জানিনা 'পতন'।'

দক্ষিণার প্রতিপক্ষীয় তার্কিক ছেলেটি বলিল, 'কেন রিপাব্‌লিকান্ গবর্ণমেন্টের হাতে ছিল বার্সিলোনা—জনমতের দ্বারা নির্বাচিত গবর্ণমেণ্ট তারা—'

অমিত শুনিবার জন্ত অপেক্ষা করিতেছিল। কিন্তু ভূজঙ্গ সেন উত্তর দিবার জন্ত দাঁড়াইলেন না। এইসব ছেলে-ছোকরার সঙ্গে কথা বলা তাঁহার পক্ষে অসম্মানজনক। যত বিড়ি-সিগারেটের দোকানদারদের গবর্ণমেণ্ট না হয় এখন ডেটিন্যু করিতেছে! তাই বলিয়া ভূজঙ্গ সেনও তাহাদের অস্তিত্ব স্বীকার করিবে নাকি!

'জনমত!'—দক্ষিণাকে ভূজঙ্গ সেন বলিলেন,—'যেন জনতার মন আছে! মত দিবার যোগ্যতা জন্মায় যেন দুটো হাত থাক্‌লেই।...'

অমিত মানিতে পারে ভূজঙ্গ সেন বুঝিতেন না ইতিহাস। ১৯১৫এর কোন একটি দিনে তথাপি যুবক ভূজঙ্গ কি পারিতেন না ফাঁসির মঞ্চে আরোহণ করিয়া গাহিয়া যাইতে জীবনের জয়গান? অমিতও জানে—তখন ভূজঙ্গ সেনের যৌবনের উন্মাদনা তাহাকে প্রধাবিত করিয়াছে দেশের এক কোন হতে অন্য কোনে,—শহরে, গ্রামে, বনে-বাদাড়ে। বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীর রূপে তখন ভূজঙ্গ আগুন লইয়া খেলিতে এক নিমেষের জন্যও দ্বিধা করেন নাই।

কিন্তু ভূজঙ্গ সেনের কোনো শ্রদ্ধা নাই প্রাণ-চঞ্চল যুবক শক্তির প্রতি, জনশক্তির প্রতি;—'ভেড়ার পালের তুলনায় মেষপালকের সংখ্যা কমই হয়।' আসলে ভূজঙ্গ সেন সাধারণ মানুষকে শ্রদ্ধা করিতে জানে না; মানুষকেই সে অস্বীকার করে।

অমিত মনে মনে বলে: ঘৃণা করিতে হইলে এই মানুষকেই ঘৃণা করিতে হয়—মানুষকে যে ঘৃণা করে। আর মানুষকে যে ঘৃণা করে সে কি ভালোবাসিতে পারে তাহার দেশকে? 'মানুষের অধিকারে' যাহার বিশ্বাস নাই—ফরাসী বিপ্লবের আদর্শ পর্যন্তও পৌঁছে নাই তাহার চিন্তা; সে কেমন করিয়া চাহিবে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র?...হতভাগ্য এ দেশের বুর্জোয়া! ক্ষমতার ছিটেফোঁটা এত অল্প পরিমাণে ও এত বিলম্বে তাহাদের ভাগ্যে মিলিতেছে যে, স্থিরভাবে একটা ভদ্রোচিত স্বদেশী ধনিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করিবার সাহসও তাহাদের নাই। ইতিহাসের পাতায় ইহারা কোনো ট্রাজিডির নায়কও নয়; কোনো হিটলার-গোয়েবল্‌ নয়; বড় জোর চিয়াং কাইশেক, কিংবা 'বাচ্চাই সাকো'।

অমিতের মনের কোনে ঘৃণা সঞ্চারিত হইবার পূর্বেই তাহার ঠোঁটের কোনে হাসি ফুটিয়া উঠিল—'বাচ্চাই সাক্‌কো।'

হাসি পাইল আবার অমিতের। আর পরক্ষণেই তাহা ক্লিষ্ট হাসিতে পরিণত হইতে চলিল।...'মীরা সোম জাতীয় পতাকা তুলেছেন আমাদের আফিসে পনরই আগষ্ট।' কেন, আই সি এস পত্নীরা ছিলেন, কংগ্রেস মন্ত্রীদের পত্নীরা বা উপপত্নীরা ছিল, ওই গোয়েন্দা-শালায় তাহারা কি পতাকা তুলিতে পারিত না? মীরা সোম, তুমি কেন? উহাই কি তোমার 'ভারতের অধ্যাত্ম সত্যে'র সাধন-পীঠ?

অমিত দুঃখে লজ্জায় হাসিল—মীরা সোম জাতীয় পতাকা তোলেন গোয়েন্দা দপ্তরে; ভুজঙ্গ সেন বিধান-পরিষদে নুন-তেলের পারমিট লইয়া কেনা-বেচা করেন; লাটপ্রাসাদে হয় কীর্তন গান;—আর বাহিরে চলে লাঠি ও গুলি।

সকৌতুক হাস্যে চোখ উজ্জল হইয়া উঠিল অমিতের,—স্বাধীন দেশকে সার্ভ করতে আর কতক্ষণ লাগাবেন?

যুবক একটু অপ্রতিভ হইল। পরে বলিল,—আপনার জন্যই ত দেরী করছিলাম। জিনিসপত্র নিয়েছেন সব?

আমার জিনিষপত্র গুছানো হ'য়ে গিয়েছে। এক আধখানা বই এবার নিয়ে নোব, যদি নিতান্ত পড়তে সাধ যায় কখনো।

অমিত বইএর শেলফের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল।

আর কতদিন হয়ত ইহাদের সংগে দেখাও হইবে না। দৃষ্টি বিনিময়ও হইবে না একটিবার দিনান্তে।—অমিতের মনের মধ্যে একটা বেদনা ও কৌতুক উঁকি দিল: এতদিন এতরাত্রি তোমরা আমারই প্রতীক্ষায় বুক বাড়াইয়া ছিলে—আমি ফিরিয়া তাকাইতেও পারি নাই। আর আজ? তোমরা কে দিবে অমিতকে তাহার কর্মহীন দিনরাত্রিতে বেলাশেষের সাহচর্য?

...সমুদ্র আর শেক্সপীয়র: নির্বাসিত আত্মার পক্ষে চিরন্তন এই দুই আত্মীয় বলিয়াছেন ভিক্তর হুগো। বন্দীশালার চতুর্দিকে নিশ্চল নিস্তব্ধ পাহাড় প্রহরীর মত দণ্ডায়মান; কিংবা মরুভূমির প্রসারিত প্রান্তর:—সমুদ্র নাই কোথাও; কিন্তু

ছিল শেক্সপীয়র। বন্দীশালায় বহু বহু মানুষের চিন্তা ও ভাবনায় শত আঁধি ও ঝড় উঠিত। বারে বারে অমিত তখন এই পুরাতন গ্রন্থখানির পাতা খুলিয়া বসিয়াছে; আর সাক্ষাৎ পাইয়াছে সমুদ্রের;—মানব সমুদ্রের, জীবনের অপার বিস্ময়ের; মানুষের অফুরন্ত বৈচিত্র্যের। জীবনের যে অর্থ দিনরজনীর ঘটনার সংঘাতে সে গুলাইয়া ফেলে, এক মুহূর্তে তাহা স্পষ্ট হইয়া ওঠে মহাকবির সৃষ্টিলোকে; ইতিহাসের বিরাটবাণী যেন নিটোল শব্দমালায় মূর্ত। আর ইতিহাসের সেই বাণী জীবন্ত, সমুদ্রের নয়, জনসমুদ্রের রচনা।

জনসমুদ্র আর সেক্সপীয়র—চিরন্তন আত্মীয় জাগ্রত মানবাত্মার।

জীবন-সংগ্রাম হইতে বিচ্ছিন্ন অবরুদ্ধ কারাজীবনেই বা ভয় কিসের—যদি শেক্সপীয়রের রসলোকে আমি মানুষের সাহচর্য লাভ করিতে পারি,—কিংবা বিংশ শতকের তরঙ্গাবর্তময় জটিল প্রবাহে দেখিতে পাই ইতিহাসের গতিরেখার রূপ ?···দশবৎসর পূর্বে ব্রজেন্দ্র রায়ের সঙ্গে আলোচনাকালে এই কথা অমিতের মনে হইয়াছিল! বৃদ্ধ ব্রজেন্দ্র রায় মহাভারত লইয়া তখন ভারতীয় সভ্যতার স্বরূপ-বিচারে অগ্রসর হইয়াছেন। একক নির্বাসিত নিঃসঙ্গ জীবন যদি তাঁহার ভাগ্যে জুটিত, আর একখানি গ্রন্থমাত্র গ্রহণ করিবার অধিকারই শুধু তাঁহার থাকিত, তাহা হইলে ব্রজেন্দ্র রায় গ্রহণ করিতেন মহাভারত—যে ব্রজেন্দ্র রায় উনবিংশ শতকের শিক্ষিত বাঙালী হিসাবে শেক্সপীয়র মিলটন লইয়া আজীবন মাতিয়া ছিলেন।—আর অমিত গ্রহণ করিত—গ্রহণ করিবে—শেক্সপীয়র,—যে অমিত বিংশ শতকের বাঙালী যুবকরূপে ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাঠ করিয়াছে মার্কস-এঙ্গেল্‌স্‌এর পাতায়, লেনিনের স্তালিনের বিচারে কর্মে। পিতৃ-বন্ধু ব্রজেন্দ্র রায় সেদিন সস্নেহে হাসিয়াছিলেন, দুইজনেরই চিন্তার ও কার্যের অসংগতি তাঁহাকে কৌতুকদান করিয়াছিল। ব্রজেন্দ্র রায় বলিয়াছিলেন, 'উপায় নেই অমিত। জীবন এমনি অসংগতিতেই ভরা। তোমরা তাতে অসহিষ্ণু হ'য়ে ওঠ। কিন্তু আমরা হই না, আমাদের চোখ অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে যে।' পিতার কথা শুনিয়া সবিতাও সলজ্জ চোখে হাসিয়াছিল।···

…সেই শেক্সপীয়রই তবে আজও হোক্ আমার সাথী জন-সমুদ্রের-দর্শন-বঞ্চিত গারদের অবরুদ্ধ নিঃসঙ্গতায়। অসংগতি আছে নাকি ইহাতে ?…

ছুয়ার জানালা বন্ধ হইল। ফ্ল্যাটের বাহিরে আসিতেই গোয়েন্দা যুবক বলিল,—দাঁড়ান। তালা চাবিটা জমাদারের কাছে রয়েছে, বন্ধ ক'রে ফ্ল্যাটটা শীল করতে হবে।

'শীল' করতে হবে ?—অমিত বিস্ময়ে শুদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল।—কেন ?

ওরূপই হুকুম। আপনার এ ফ্ল্যাটে আপনাদের কমিউনিস্ট পার্টির সভা হত।

কে বললে ?

আমাদের তা'ই রিপোর্ট। শ্যামলবাবু এ শাখার সেক্রেটারি। তাই ফ্ল্যাটটা তালাবদ্ধ ক'রে দিয়ে যাবার হুকুম আছে।

অমিত এবার ক্ষুব্ধ হইল,—হলই বা সভা কমিউনিস্ট পার্টির।—তারপর আবার বলিল,—কোন আইনে আপনারা বাড়ী তালাবদ্ধ করছেন ? শ্যামলই বা কি বেআইনী কাজ করেছে ? একটা আইন-সংগত পার্টির যদিবা কোনো বৈঠক বসত এখানে, তা অপরাধ হবে কি ক'রে ? আমার ফ্ল্যাট বন্ধ করবার কোন্ কারণ আছে তাতে ? পার্টি বন্ধ নয়, আর ফ্ল্যাটটা তালবন্ধ হবে ?

যুবক বলিয়া ফেলিল, পার্টিও বন্ধ হচ্ছে—

কে বললে ? কোথায় শুনলেন ?

কিন্তু অমিতের উদ্দেশ্য আর সফল হইল না। যুবক আর উত্তর দিল না, বলিল,—আমাদের ত এসব হাইপলিসির ব্যাপার জানবার কথা নয়। আদেশ মত কাজই করি মাত্র। আপনি বরং আফিসে ডিপুটি কমিশনারের কাছে জিজ্ঞাসা করবেন।

হোক সে কালচার-লোভী যুবক, স্ত্রী যাহার আণ্ডারগ্র্যাজুয়েট্, সে গোয়েন্দা কর্মচারীও ; প্রভাবিত হইবার মত মানুষ সে নয়।

শীলমোহর হইয়া গেল। সাধু তাহার জিনিসপত্র লইয়া বাহিরে দাঁড়াইল। সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া চলিল অমিত। সম্মুখে পশ্চাতে পুলিশ, ফটকে পুলিশ

দাঁড়াইয়া : পুলিশের খোলা বড় ট্রাক্ অমিতের অপেক্ষায় প্রস্তুত। প্রতিবেশীরা অনেকেই জাগিয়াছে। নিজ নিজ বাড়ি ও ফ্ল্যাটের চৌহদ্দী হইতে দূরে দাঁড়াইয়া দেখিতেছে অমিতবাবু আবার গ্রেপ্তার হইয়া চলিলেন। সকলের উদ্দেশে অমিত হাত তুলিয়া নমস্কার করিল।

সবারে আমি প্রণাম ক'রে যাই।

সাধু বলিল, আমি কোথায় যাব, দাদাবাবু?

কোথায় যাবি?—অমিত কি বলিবে সাধুকে? কোনরূপে খবরটা অনুও শ্যামলকে পৌঁছাইয়া দেওয়া চাই।—একটী খবর দেওয়া দরকার মনুকে, ছোট দাদাবাবুকে ছোট দিদিদের।

সাধুই বলিল, কালিঘাটের দিদিদের বাড়ী যাই না?

এক মুহূর্তে অমিতের মন সচকিত হইল। সাধু ঠিক স্থানই অনুমান করিয়াছে। অমিত তাহা জানিয়াও নিজের মনের কাছেই এতক্ষণ স্বীকার করিতে পারিতেছিল না—সবিতা ছাড়া এই সময় হয়ত আর কাহারও সাহায্য পাওয়া যাইবে না; অন্তত আর কাহারো কাছে সাহায্য চাওয়াও যাইবে না। বন্ধুবান্ধবের অভাব নাই অমিতের জীবনে; সে সৌভাগ্য সে অপ্রতুলভাবেই লাভ করিয়াছে। যাঁহারা সহযাত্রী বন্ধু তাঁহাদের কে আজ পুলিশের খর্পরে, কে বাহিরে ঠিক কি? তাহাদের নিকটে কাহাকেও পাঠানো নিরাপদ নয়। আর যাহারা অন্য পরিচয়ে সুহৃদ, বন্ধু হইলেও তাঁহাদের নিকটে এদিকে সাহায্য চাহিতে অমিত প্রস্তুত নয়। সত্য সত্যই কার্যকারী কোন সাহায্য দিতেও তাহারা জানেনা। তাহারা কি বুঝিবে অনুকে শ্যামলকে সাবধান করা এখনি দরকার?

পুলিশ লরী ষ্টার্ট দিতেছে। অমিত বলিল,—আচ্ছা, বলিস তাঁকে দাদাবাবুদের, দিদিমণিকেও যেন খবরটা দেয় যে ক'রে হয় আজই।

স্পষ্ট হল কি কথাটা?—অমিত নিজেকে জিজ্ঞাসা করিল, কথাটা বুঝিবে কি সবিতা? সম্ভবতঃ সে বুঝিবে—অবশ্য সবিতা ব্যবস্থা করিয়া উঠিতে পারিবে কিনা বলা যায় না। সবিতা বড় 'ভালো মানুষ'।

'বহু জন হিতায় চ বহুজন সুখায় চ'. তাহার জীবন—নিজের জন্ত ত তাহা নয়। শুধু ভালো মানুষ নয়, সবিতা আত্মপ্রকাশে কুণ্ঠিত, আর তাই সবিতা 'ভাল মানুষ'। অর্থাৎ মানুষ হইতে সে পারিল না। আন্তরিক ইচ্ছা থাকিলেও অনুকে শ্যামলকে তাই সে এখন সাহায্য করিতে পারবে কি না কে জানে? তবু সে-ই বুঝতে পারিবে অবস্থাটা। আর বুঝিতে পারিত নিঃসন্দেহে ইন্দ্রাণী।—কিন্তু অনেক দূর আজ ইন্দ্রাণী—অনেক দূরে রে—হাঁ, অনেক দূরে। অবশ্য তাহার নীল খাম এখনও অমিতের টেবিলের উপরে—আর সেই কয় ছত্রও অমিত কেন, নিশ্চয় পৃথিবীর যে কোন মানুষকে স্পষ্ট আত্মসচেতন ভাবে জানাইতে পারে—সে ইন্দ্রাণী, সে কোনো দিন দূরে নয়, বিশ বৎসরেও সে অবিস্মৃত স্মৃতি; জীবন-যাত্রার শত পরিবর্তনেও সে অপরিবর্তনীয়া। না; অনেক দূরে তবু সেই ইন্দ্রাণী, অনেক দূরে।...কাল সন্ধ্যায় এই অনুচ্চারিত সত্য স্বীকার করিয়াছি দুইজনাই আমরা,—সে ইন্দ্রাণী, তার একার; আর আমি অমিত কারও একার নই,—অনেকের, অনেকের—অনেক মানুষের—

পুলিশ বেষ্টিত হইয়া অমিত সমাসীন। মনে মনে বলিল: 'যাত্রা হল সুরু।' লর্ড সিংহ রোড? তারপর কোথায়? লালবাজার হাজতে? না, জেলে? না কোন বন্দীশালায় মোকদ্দমার আসামী? না, বিনা বিচারে বন্দী? কিছুই ঠিক নাই—জানি না। এই শুধু স্থির জানি, যাত্রা সুরু হইল। এই সকাল বেলাকার ধৌত মসৃণ রৌদ্রস্নাত কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটের উপর দিয়া যাত্রা সুরু হইল আবার; বীডন ষ্ট্রীট শেষ হইল। চিত্তরঞ্জন এভেন্যুর প্রশস্ত রাজপথ দিয়া যাত্রা সুরু হইল আর-একদিনের। নতুন এক দিনের যাত্রা সুরু হইল আমাদের —যখন এ স্পেকটর ইজ হন্টিং দি ওয়ার্ল্ড......চৈত্রের এমন সুন্দর প্রভাতে এই পথে আর ফিরিয়া আসিবে কি, অমিত? এই অমিত এমন করিয়া দেখিবে এই বাড়িঘর—এই যাত্রী মানুষের মুখ, নব জাগ্রত কলিকাতার সুন্দর স্বচ্ছন্দ ছবি? কলিকাতার পথ, কতদিনের সহচর, কত রাত্রির বন্ধু, আর আমার কত মিছিল জলুসের সাক্ষী সে, কত জনতার নব-জীবনের জন্মস্থল—শত পরিচয়েও যেন তাহার রূপ পুরাতন হয় না। শতবার দেখিয়াও যেন এ দেখার শেষ নাই।

…কলিকাতার পথ, কলিকাতার মানুষ,—এই পৃথিবীর আশ্চর্য যুগের আশ্চর্য মানুষ—তোমরা আমাকে পরমাশ্চর্যের পাথেয় জোগাইয়াছ—তোমাদের সকলকে আমার প্রণাম। আমি অমিত, তোমাদের সকলের উদ্দেশে এই পথ ও আকাশকে সাক্ষী করিয়া আমার অন্তরের প্রণাম রাখিতেছি: তোমরা আমাকে ধন্য করিয়া—আমাকে আজও গ্রহণ করিয়া এ দেশের মানব অভিযানের পুরোভাগে—করিয়াছ আমাকে আগামী কালের উদ্গাতা, করিয়াছ আহ্বায়ক 'of the singing to-morrows'। গীতময়, উৎসবময়, আনন্দময়, সেই আর-এক-দিনের সংগ্রাম-সংঘর্ষময় সূচনা আজ দেশে দেশে,—পৃথিবীর সর্বত্র।

অমিতের মনে হইল সে একা নয়—

সকল সংঘাত মাঝে করিতেছি আজ অনুভব
আমার আপন মাঝে এ বিশ্বের সত্তার উৎসব—
শুধু জানি সুরু তার যেথায় আমার এককের
শেষ হলো ওঠাপড়া, বারতা পেল সে সমগ্রের।…

চৌদ্দ নম্বরের ফটক খুলিয়া গেল। সেই পুরাতন বাড়িটা। এখন ঝিমন্ত যেন বাড়িটা। অযত্নের চিহ্ন উহার সর্বত্র পরিস্ফুট। সে জৌলুষ ও চমক নাই। অগ্রসর হইয়া যাইতে যাইতে অমিত দেখিল ঘরে আরও অনেকে আসিয়াছে—কে-কে? ঘরের অভ্যন্তরে প্রভাতের আলোক তত স্পষ্ট নয়। কিন্তু দিলীপ, অজয় ও আরও বহুকণ্ঠের অভিনন্দন সমুত্থিত হইতেছে অমিতের উদ্দেশ্যে।

অমিত দাঁড়াইয়া পড়িয়াছে দ্বার-প্রান্তে। বিস্মিত চমকিত মুখ হইতে ফুটিয়া উঠিল একটি শব্দ: 'মঞ্জু'!

দুই

সকাল বেলাকার এক ঝলক আলো আকাশ হইতে নামিয়া আসিয়াছে—মঞ্জু : গোয়েন্দা আপিসের প্রায়-অন্ধকার গৃহতলে একটি প্রাণ-চঞ্চল তরুণী।

পরিচিত অনেক কণ্ঠ সমস্বরে অমিতকে সংবর্ধনা জানাইতেছে—আসুন, আসুন, আসুন। প্রত্যেকটি মুখ ও কণ্ঠস্বরকে চিনিয়া লইবার মত অমিতের সময় হইল না। সমবেত আনন্দধ্বনির মধ্য হইতে একটি কণ্ঠ স্বতোচ্ছ্বসিত প্রাণ-ছন্দে অমিতের কানের উপরে ঝর্ণা-ধারার মত ছুটিয়া আসিয়া ছড়াইয়া পড়িতেছে; 'অমি' মামা! অমি' মামা!'···

আয়ত চক্ষু, উৎফুল্লাধর একটি স্বচ্ছন্দ সজীব কণ্ঠ বিশ বৎসরের পার হইতে ডাক দিল অমিতকে, 'অমিদা'!'

সুরকে অমিতের ভুলিবার সাধ্য নাই। কাহাকেই বা ভুলিতে পারে অমিত?

সেই শেষ দেখা হাসপাতালে··জীবনের এপারে দাঁড়াইয়া যেন জীবনের ওপারের মানুষ। সেই মুখ চোখ কণ্ঠ চক্ষু; তবু সে সুর নয়—চুপ করিয়া যে সুর' শুনিতে বসিত অমিতদের সেদিনের তর্ক গল্প, 'বলাকার' কবিতা পাঠ। হাসপাতালে যাহাকে শেষ দেখিল আমত সে যেন তখন সেই সুর নয়, সুর'র ভগ্নাংশ ;—অথবা ভগ্নস্তূপ। জীবন-ইতিহাসের ভগ্নস্তূপকে তবু পুনরাবিষ্কার করিতে পারে নাকি একটি নিমেষে অমিত, ইতিহাসের যে ছাত্র···আর জীবন-রসের যে রসিক?···

বহু আত্মীয় বন্ধুর মত সুরও প্রত্যাশা করিত অমিত বড় হইবে; গুণী মানী অমিত, সমাজের গুণী মানীদের আসরে আপনার বিধাতৃনির্দিষ্ট স্থান সগৌরবে গ্রহণ করিবে। তাহার বিদ্যার খ্যাতির সঙ্গে আসিবে যশঃ, আসিবে সম্পদ, আসিবে সৌভাগ্য। আর সেই সম্মান-সম্পদের বরমাল্য

গলায় লইয়া অমিত এতদিনে আপনার গৃহে সমাজে পরিণত জীবনের সমস্ত প্রতিষ্ঠায় শোভা পাইবে : আত্মীয়দের আশ্রয়, বন্ধুদের আনন্দ, অনুজদের আশা। কোথায় গেল সে অমিত আজ?

সুর'র সে অমি'দা যে হারাইয়া গিয়াছে,—জীবনের মহামহোৎসবে সে যে কোথায় ছিটকাইয়া পড়িয়া গিয়াছে,—দশ বৎসর পূর্বেই সুর'র সে বিষয়ে আর কোনো সংশয় ছিল না। দশ বৎসর কেন? বিশ বৎসর পূর্বেই কি সুর জানিত না—অমিত,—সুর'র 'অমিদা'—তাহার আত্মীয়-বর্গের এই পর্যায়ের অনেক আশাস্থল আপনার চিন্তা ও অধ্যয়নের শান্ত সমাহিত আশ্রয় ছাড়িয়া জীবনের নির্দয় কঠিন ঝঞ্ঝা-বিধূনিত ভয়ঙ্কর পথেই যাত্রা করিয়াছে। তাহার পিছনে পড়িয়া যাইতেছে পিতার স্বপ্ন, মাতার আশা—অমি' তাঁহাদের গৃহকে সমুজ্জ্বল করিবে; সুরর মত স্নেহমুগ্ধ আত্মীয়দের নিষ্ফল অনুযোগ,—'তুমি পি-আর-এস্ হবে হচ্ছ না কেন, দাদা?' অমিতের আপনার অফুরন্ত কৌতূহলের, উজ্জীবিত ঔৎসুক্যের যত প্রশ্ন, যত তথ্য, ও যত অজ্ঞাতপূর্ব উত্তর—সপ্তম হইতে নবম শতকের ভারতের ইতিহাস খুঁজিয়া দেখিবে না? উনবিংশ শতকের বাঙালী জাগৃতি কি শুধুই একটা প্রতিক্রিয়া, না, নবযুগের পূর্বাভাস? ভারতীয় ইতিহাসের প্রাগ্‌আর্য্য বনিয়াদ কোথায় আছে লুকায়িত—সিন্ধুর উপত্যকায়? না, নর্মদা তাপ্তির মর্মর-মণ্ডিত তীর-কন্দরে?—তখনি পিছনে পড়িয়া যাইতেছে, শুকাইয়া যাইতেছে, ঝরিয়া পড়িতেছে অমিতের আত্মীয়-বর্গের আশা, আপনার বিদ্যা-বিমুগ্ধ অন্তরের নিভৃত স্বপ্ন। আর সেই বিশ বৎসর পূর্বে সেই তথ্য কি বুঝিতে পারে নাই সুর'?

সেদিন এই নবজাত মঞ্জুর চোখের উপরে চোখ রাখিয়া সুর নিজের মনে-মনে বলিয়াছে, 'মণি আমার, তোমার নাম রাখবে অমি'দা'; অমি'দা ছাড়া কেউ রাখতে পারবে না তোমার নাম। কে বা আর রাখতে জানে নাম?' সঙ্গে সঙ্গে সুর বুঝিয়াছিল—অমিত আর সুর'র অমি'দা নাই, থাকিবে না। তাহার কন্যার নাম বাছিয়া দিতেও এখন অমিত ভুলিয়া যায়! সুর' বুঝিয়াছিল, তাই সুরর সমস্ত সহাস্য ঔৎসুক্য ও সমস্ত সনির্বন্ধ অনুযোগের মধ্যে অমিত

দেখিতে পাইত একটি ব্যথিত, ঈষৎ কুণ্ঠিত মনের স্পর্শও! অমিতের কর্মমুখর দিন রাত্রির মধ্যে কোনো স্থান নাই কি তাহার আত্মীয় বন্ধুর, তাহার এই আত্মীয়া ভগিনীর স্নেহ-সমৃদ্ধ আশা ও স্বপ্নের? স্বামি-সন্তান পরিবৃত সুর'র সাধারণ জীবনের সাধারণ কথার ও সহজ ঘটনার কি সেখানে প্রবেশ নাই—অমিতের জীবন-পরিধিতে?

না, সুর জানিত ইহাও সত্য নয়, অমি'দা সুরকে অবজ্ঞা করে নাই। কিন্তু সে অমিত, শুধু সুর'র অমি'দা নয়, আরো অনেকের সে; এমনি মানুষ যে সে।

বিশ বৎসর কেন, পঁচিশ বৎসর পূর্বেও ইহা সুর বুঝিয়াছিল। তখনো ত' সুর প্রায় বালিকাই। প্রথম কৈশোরের নূতন দীপ্তি আসিয়াছে তাহার চেতনায়, জীবনে; চলায়, বলায়, চোখে, মুখে, দেহে মনে সর্বত্র একটা সপ্রতিভ ঔৎসুক্য। চোখে উগ্রতা নাই, আছে কোমলতা, একটু লজ্জার সঙ্গে সচকিত কৌতূহলের মিশ্রণ। সেই নবার্জিত দৃষ্টি লইয়া অমিতের স্নেহ ও আদর-মিশ্রিত আশ্রয়ে সুর তখনি চিনিয়া ফেলিয়াছিল অমিতকে—যে-অমিত সকলের বন্ধন মানিয়াও বাধা মানিবে না, যে অমিত তাহার গৃহকে, পরিবারকে বন্ধুদের আড্ডাকে, সুখকে, শান্তিকে, বিদ্যাকে, বুদ্ধিকে,—সঙ্গীতের অনুরাগ ও শিল্পকলার অনুভূতিকে,—আপন কল্পনাকেও পরম গরিমা বলিয়া মানিবে না; মানিবে না সে আপনাকেও। আপনার স্বস্তি ও আরামের মধ্যেও সে চিরদিন অস্বচ্ছন্দ, চিরদিন অধীর চঞ্চল; উচ্চকিত-গতি।

কিশোরী সুর তখন তাহার বধূ-জীবনে প্রবেশ করিতেছে—আশা আনন্দ স্বপ্ন: সৌন্দর্যে তাহার মন থর'-থর'।

অমিতের নিকট হইতে সেদিন সে উপহার পাইয়াছিল তখনকার দিনের 'বলাকা'। 'বলাকা' বুঝিবার মত বয়স নয় তখন সুর'র, সে বিদ্যা নাই, সে বুদ্ধি নাই। কিন্তু তবু সেদিন অমিতের মুখে কবিতা পাঠ শুনিয়াছে তাহারা,—সে, তাহার ভাই মনু,—বোন শিশু অনু, ইন্দ্রাণী বৌদি, আর কী একটা রহস্য যেন সুর' বুঝিয়াছিল—অমিত যেন কোন্ শব্দময়ী অপ্সর রমণীর সঙ্গে

ছুটিয়াছে পরিচিত জগতের ওপারে ঝঞ্ঝা-মদমত্ত-পাখা হংস-বলাকার মত, আপনার ডানা ছড়াইয়া দিতেছে আকাশের পথে পথে :

জীবনেরে কে রোধিতে পারে ?

গর্জিয়া উঠে যেন ঘরের বাতাসও :

হে রুদ্র আমার,
মার্জনা তোমার
গর্জমান বজ্রাগ্নি শিখায়—
থর থর কাঁপিতে থাকে সুররও মন :
ঘরের মঙ্গল শঙ্খ নহে তোর তরে—
নহেরে সন্ধ্যার দীপালোক,
নহে প্রেয়সীর অশ্রু চোখ।
পথে পথে অপেক্ষিছে কাল-বৈশাখীর আশীর্বাদ
শ্রাবণ রাত্রির বজ্রনাদ।

স্বামিগৃহ হইতে প্রথম ফিরিয়া অমিদা'র সঙ্গে দেখা করিতে আসিল সুর'। প্রথম-প্রণয় অনুরাগ আনন্দের অভাব ছিলনা মনে—জীবনের প্রথম সেই বিস্ময়, তাহা আবিষ্কারের উত্তেজনায় তখনো সুর'র কিশোরী প্রাণ অনুরণিত। তবু হাসির মধ্য দিয়া সুর'র দুই চক্ষু ফাটিয়া জল আসিতে চায়,—চাহিবে না ? শুধু সুর' একা ত নয় আজ, স্বামীও সঙ্গে আসিয়াছেন। পশুপতি পরিচয়-আলাপ জমাইতে উৎসুক অমিতের সঙ্গে। কিন্তু কোথায় সুর'র অমি'দা? এই নবপরিণীতা চকিত-চক্ষু, চকিত-চিত্তা বধূর মুখে তাহার নাম ও খ্যাতি ইতিমধ্যেই বার বার সে শুনিয়াছে—নানা প্রসঙ্গে শুনিয়াছে, কুতূহলী হইয়াছে, আগ্রহান্বিত হইয়াছে ; সেই অতি-প্রশংসিত কুটুম্বটির বিরুদ্ধে একটু মৃদু প্রতিকূলতাও বোধ করিয়াছে। অমিতের পিতার সঙ্গে বসিয়া কত আর গল্প করিবে পশুপতি? কিংবা বালক মন্টুর সঙ্গেই বা গল্প করিবে কতক্ষণ? অমিত কি জানিত না তাহারা আসিবে? জানিত বৈ কি? তাহাদের আগমনের অপেক্ষায় সকাল হইতেই অমিত সাগ্রহে বসিয়াছিল। তারপর? মা বলিলেন, বন্ধুরা কে আসিল ডাকিতে। কে আসিল? না, না,

পড়াশুনার বন্ধুরা কেহ নয়—যদিও পরীক্ষা অমিতের নিকটেই। না, সুহৃদের গানের মজ্‌লিসের ব্যাপারও নয়। বিকাশের শিল্পী-বন্ধুরাও কেহ নয়। না, হয়ত কংগ্রেসের কেহ হইবে, কিংবা অমনিতর কোনো একটা দশ-জনার কাজ—কিছু একটা। হয়ত মিছিল আছে, কিংবা কোনো একটা কন্‌ফারেন্‌স্‌ বা সভার আয়োজন করিতে হইবে। অথবা বন্যা বা দুর্ভিক্ষের চাঁদা তোলা প্রয়োজন। কিন্তু কোথায় অমিত? অমিতের মা দুঃখিত হইলেন, বাবা বিরক্ত হইলেন—একটা দিনও কি অমিত তাহার 'খেয়াল' বাদ রাখিতে পারে না?

পশুপতি সানুকম্প হাস্যে তাঁহাদের সংশয় ও লজ্জাকে উড়াইয়া দেয়,—'হয়ত কোনো কাজে পড়ে গিয়েছেন অমিতবাবু; আসতে পারলেন না। দেখা হবে আর একবার আমরা কলকাতা এলে।' আর সুর'? তাহার সমস্ত গর্ব ও উল্লাস যেন মাটিতে মিশাইয়া যাইতেছে। সে বলিয়াই তখনো তাহার মুখে হাসি আর কথা লাগিয়া আছে। চোখ ফাটিয়া জল পড়িতে বাকী ছিল; সেটুকুও বুঝি টিঁকে না আর ফিরিবার পথে গাড়ীতে।

—খুব ত তোমার অমি'দা! তুমি ত অমি'দা বলতে পাগল, আর দেখাই নেই তার একটিবারও।—বলিল পশুপতি।

সুর' আপনাকে রক্ষা করিল, অমনি রক্ষা করিল অমিতের সম্মান। কিছু মাত্র অপ্রতিভ না হইয়া হাসিয়া গবের সহিত সে বলিল,—ওই ত অমিদা' অমনি। কোথায় কোন কাজ পড়ল কার; আর তখন তাঁর নিজের কাজ, বাড়ির কাজ, সব রইল পড়ে।

এইরূপই অমিতের স্বভাব; আর তাহা বলিয়াও যেন সুর'র গর্ব।

যাঁদের নিমন্ত্রণ করেছেন তাঁদের কথাও ভুলে গেলেন,—না?

মাথা নাড়িয়া সুর' বলিল,—ভুলে যাবেন কেন? ওর কি কাজের ঠিকানা আছে, না আছে ঝোঁকের শেষ?—হাঁ, সুর' সত্যই জানে অমিত ভুলিবে না। ভুলিবে না সে—কিছুই।

সুর' অশ্রান্তস্বরে বলিয়া চলিয়াছে কত কাজ অমিতের। আর সুর' পিতৃগৃহে ফিরিয়াই পত্র লিখিতে বসিয়াছে অমিতকে। পত্র ত নয়, অভিমানাহত সুর'র

দুই-চোখ-কাটা চোখের জল। অথচ চোখের জলের চিহ্নও নাই। আছে শুধু হাসির রেখা।—'কাজ ত তোমার যা তা খুব জানি। কোথাও বুঝি আড্ডায় বসে গিয়েছিলে? না, ভালো রেঁধেছিল কেউ?' কিন্তু হাসি ছাড়া অমিত কি আর কিছু পড়িতে পারে নাই সুর'র সেই চিঠিতে?

গাড়ী ছাড়িবার বেশ পূর্বেই ষ্টেশনে আসিয়া অমিত অপেক্ষা করিতেছিল—পশুপতিবাবুর সঙ্গে আলাপ করিবে। আর সেই কয় মিনিটেও মোটের উপর সুর'র হাসিতেই পরিচয় সুসাধিত হইয়া গেল। সুর'র অভিমানও বুঝি ঘুচিল। কারণ, সুর' জানে অমিতের নিকট এই সব 'বাজে কাজ' কত প্রলোভনের বস্তু। কিংবা, সুর' বিস্মিত হইল না—কাজই এখন বড় হইয়া উঠিতেছে অমিতের জীবনে। বিস্মিত সে হয় নাই, কিন্তু ব্যথিত হইয়াছিল, অনেকখানি ব্যথাতেই ব্যথিত হইয়াছিল। তাহার সহজ হাসিতেই সে ব্যথা, সে দুঃখকে সেদিন সে সহজ করিয়া দিল পৃথিবীর সম্মুখে। কিন্তু আগামী দিনের অনেক অজানিত ব্যথাও তাহার নিকট তখনি প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল।

দিনমাস বৎসরের স্রোতে সেই আগামী দিনও ছুটিয়া আসিল দেখিতে না দেখিতে। জীবন ভাসাইয়া লইয়া চলিল সুর'কে, তাহার ছোট সংসারের সংকীর্ণ খাতে। আর জোয়ার লাগিল অমিতের দুরন্ত জীবনে। তবু সুর' দাবি জানাইল—অমিদা' সুর'র প্রথম-জাত শিশুর একটা নাম ঠিক করিয়া দিক। 'ভালো নাম, সুন্দর নাম, মধুর নাম।' আর, 'সাত দিনের মধ্যে চাই উত্তর। না হয় একটু বন্ধই রইবে তোমার ইতিহাসের গবেষণা, কিন্তু আমার পত্রের উত্তর দিতে হবে দেরী না করে।'

সাতদিনের স্থলে তিন সপ্তাহ শেষ হইল। অভিমানী সুর'র দ্বিতীয় পত্রের পরে তৃতীয় পত্র আসিল;—না, প্রয়োজন নাই অমিতের সুর'কে আর পত্র লিখিয়া। শুধু অমিত সুর'কে জানাক কোন নামটা তাহার পছন্দ—'ক্ষেন্তি, পুঁটি, পদি, কোনটা মঞ্জুর?' হাসিতে ও অভিমানে মিশানো সে পত্রের পিছনে দুইটি ব্যথিত আয়ত-চক্ষু দেখা যায়। অমিত এবার তাড়াতাড়ি জানাইয়াছিল ফেরৎ ডাকে,—সব নামমঞ্জুর, মঞ্জুর কেবল মঞ্জু। কিংবা 'মঞ্জুশ্রী'—হোক তাহা বোধিসত্ত্বের নাম।

আজিকার মঞ্জু জানেও না হয়ত তাহার নামের ইতিহাস,—পৃথিবীতে আর কেহ তাহা জানেও না। অমিতেরও আজ মনে থাকিবার কথা নয়। একুশ বাইশ বৎসর কোথায় গিয়াছে ভাসিয়া। কোটালের বান ডাকিল এই দেশের জীবনেও,—অমিত সেই উজান বাহিয়াই ছুটিয়াছে। তবু অমিত দেখিতে পায়—আজও দেখিতে পায়···সেই বাঁধা-পড়া সংসারের বাঁধা-ধরা জীবনের মধ্য হইতে ভয়ে ভয়ে আশঙ্কায় উদ্বেগে এক-একবার গ্রীবা বাড়াইয়া সুর'র দুই চক্ষু সন্ধান করে অমিতের পথ। পত্র আসে অমিতের কোলাহল-মুখর দিনরাত্রির তীরে—'তুমি কি করছ, দাদা? পি-আর-এস্ আর দেবেনা তুমি?'—স্নেহার্থিনী গর্বিতা ভগ্নীর সহজ সনির্বন্ধ এ তাড়না। হাসিরও অভাব তাহাতে নাই। তবু একটী ব্যথা ও সংশয়ের সুর ইহার তলায় তলায় বহিতেছে, অমিতের চোখেও কি তাহা পড়ে না? কিন্তু পড়িলেও তাহা দেখিবার মত সময় কই তখন অমিতের?—অমিতের পৃথিবীতে সময় তখন গতি-উন্মাদ।

'বিনয় রায় এখানকার ইতিহাসের অধ্যাপক। বিশ্ববিদ্যালয়ে তার পি-আর-এস-এর থিসিস্ই নাকি এবার গ্রাহ্য হয়েছে। অমিত দিয়েছিল নাকি তার থিসিস্?'—পশুপতির এই জিজ্ঞাসার পিছনে যে বক্র খোঁচাটা রহিয়াছে তাহা অমিতকে কেহ বলে নাই। কিন্তু নীরবে নতমুখে অশ্রু গোপন করিয়াছে সুর। তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গিয়াছে চেঁচাইয়া,—'দ্যাখো, দ্যাখো, মঞ্জুটা কি মুখে দিলে! পাজি মেয়ে'—অকারণে তারপর সুর দিয়াছে বালিকাকে চড়।

ছোট ঠোঁট দুইখানি কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিল—আনন্দ উজ্জ্বল শিশু-চক্ষু ছাপাইয়া গেল অশ্রুতে।

অকারণ—অকারণ—অকারণ···

সমস্ত পৃথিবীর বেদনা-সমূহের যে কারণ নাই. শিশু মঞ্জু এই বুঝি তাহা প্রথম বুঝিল। আর কাঁদিয়া লুটাইয়া পড়িল ভূমিতে অভিমানে হতাশায়।

কিন্তু উপায় ছিল না সুর'র। আপন গৃহে বিনয় রায়কে আপ্যায়ন করিতে পশুপতি তাঁহাকে লইয়া আসিলেন। নতুন পি-আর-এস্ তিনি, বিদেশে বাঙালীর পক্ষে ইহা কি কম গর্বের কথা? সুর' লুচি ভাজে, নিখুঁত

হাতে থালা সাজাইয়া দেয়—নিখুঁত কাটিয়া যায় অপরাহ্ন। তারপর সন্ধ্যায় মেয়েকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া ঘুম পাড়ায় সুর'। অশ্রুমোচন করিয়া বিহ্বল জাগ্রত স্বপ্নে আপনার আহত অন্তরকে শান্ত, বিক্ষোভ-মুক্ত করিয়া লয়···যদি সুর' ফিরিয়া যায় এখন কলিকাতায়,—খোকা আসিতেছে এখানে—কাল খোকা ফিরিয়া যাইবে কলিকাতায়।···

কিছু না বলে একেবারে অমিদা'র সামনে গিয়ে যদি আমি দাঁড়াই—। দু'হস্তের ক্ষিপ্র তাড়না না মেনে মাথায় তুলে নোব তাঁর পদধূলি। তাঁর চমকিত চক্ষুর সামনে দাঁড়িয়ে বল্‌ব,—'এই আমি সুর'। আমি এসেছি, এসেছি আমার ঘর ছেড়ে, সংসার ছেড়ে······হাঁ, ঘর ছেড়ে, সংসার ছেড়ে,···না, না, কিছুই ছেড়ে আসিনি। এসেছি সব নিয়ে,—ঘর নিয়ে, সংসার নিয়ে, আমার এই দিন রাত্রির সমস্ত কাজ আর জঞ্জাল নিয়ে;—কিন্তু এসেছি, এসেছি তা জেনো। আর জানো কি— এসেছি যে তার কারণ কী? তার অর্থ বোঝ কি?' 'কী কারণ?' 'কারণ'?—না, না, কিছুতেই বল্‌ব না বিনয় রায়ের কথা। কিছুতেই বলব না ওঁর এই ব্যঙ্গ, এই স্থূল খোঁচা। বলব না তাই কারণ। বলব, 'এসেছি; কারণ তুমি—তুমি আমাদের অমিদা' —যে ইচ্ছা করলে কী না করতে পারে—কেন ইচ্ছা করো না তুমি?— কেন ইচ্ছা করো না তোমার বিদ্যাকে পৃথিবীর সামনে তুলে ধরতে? প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ কি? কী তুমি না করতে পার?'—হাসবে নিশ্চয় অমিদা'— হাসবে।······'হাসছ? বুঝছ না তুমি—কিছুই বুঝছ না আমাদের কথা। বুঝতে চাও না, বুঝতে পার না কি? নিশ্চয়ই বুঝতে পার, কিন্তু বুঝতে চাও না। আর আমি সুর, তোমাকে এই কথাই বুঝোতে এসেছি—হাঁ, বুঝোতে এসেছি তোমাকে—তোমার সাধ্য কি আমার কথা তুমি না বুঝে পারবে? পাঁচশ-মাইল দূর থেকে আমি এসেছি—অনেক জ্বালা আর জঞ্জাল সত্ত্বেও এসেছি, তোমাকে বুঝতে হবে—তুমি বুঝবে আমার কথা, অমিদা'। বুঝবে, বুঝবে'···

শান্ত হয় সেই অন্তরের ব্যথা—শেষ পর্যন্ত একখানা ছোট চিঠির মধ্যে।

সুর'র অশ্রুধৌত মন আপনার হাসি আর দাবি লইয়া আপনার কথা বুনিয়া তোলে একটি একান্ত প্রশ্নে, 'তুমি পি-আর-এস দিচ্ছ না কেন, দাদা ?'

সুর'র চারিদিকে জীবন নিস্তরঙ্গ। ইংরেজ বণিকের আফিসে পদ-মর্যাদা আর ভালো দক্ষিণা লাভ করিতেছে তখন পশুপতি, কেন অমিতের নামের সঙ্গে অকারণে নিজেকে বিজড়িত করিবে সে ? আপনার ঘরে স্বাচ্ছন্দ্য আর সৌন্দর্য কি ফুটাইয়া তুলিবে না সুর' ? তুলিবে বৈ কি ! তুলিতেছেও। কিন্তু সুর'র হাসি আর সহজ নাই। কোল আলো করিয়া আসিল পুত্র, আর কোল অন্ধকার করিয়া চলিয়া গেল সে শিশু একটু পরে। সুর'র চোখ অন্ধকার হইল। একটা গভীর কঠিন ব্যাধি তাহার দেহের মধ্যে অতি ধীরে, অতি অগোচরে বাসা বাঁধিল। কেহ জানিল না ; কাহাকে সে বলিবে আপনার কথা ? —অমিতও নাই নিকটে। তবু অমিতকেই লিখিতে হয়—আপনার লোক আর কোথায় সে ছাড়া ? পীড়া-বেদনার কোনো কথা না বলিয়াই সুর লিখিবে। অমিতকে ছাড়া কাহাকে আর লিখিতে পারে সুর ? কে তাহা বুঝিবে ?

কিন্তু কেমন যেন কলম কাঁদিতে চাহে। সংসারে সে ভাগ্যবতী ;—কাঁদিবে কেন তাহার কলম ?—ভাগ্যবতী সুর'। তাহার শ্বশুর, শাশুড়ী ও আত্মীয়দের অনেকের চক্ষে প্রায় অন্যায়রূপেই সে ভাগ্যবতী। কি আছে সুর'র যোগ্যতা যে, সে কানপুরের ব্রিটিশ ইনডাষ্ট্রিজ্ লিমিটেডের এ্যাসিস্টেণ্ট ইঞ্জিনীয়ার মিস্টার পি, পি, গাঙ্গুলীর স্ত্রী হয় ? লাভ করে এই গৃহের গৃহলক্ষ্মীর পদ— এত সম্মান, এত সম্পদ, এত সৌভাগ্য ? অযোগ্যই সুর' তাহার স্বামীর, অযোগ্যই সে এই সৌভাগ্যের।

শুধু অযোগ্য নয়, সে অপরাধিনীও। এই সম্পদ-সম্মানের মধ্যে কোথায় তাহার গম্ভীর মর্যাদাময় কর্ত্রীত্বপনা ও স্থিরগর্বিত পদবিক্ষেপ ? হাঁ, সুর' তাহার এক কালের মমতাভরা কণ্ঠ হারাইয়া ফেলিয়াছে ; উৎফুল্ল হাসি ভুলিয়া গিয়াছে ; সেই অকারণ ঔৎসুক্য, সকলের জন্য সহমর্মিতা সংহত করিয়াছে। না, আগেকার মত চঞ্চল নাই আর সেই সুর'। তাহার চোখের চঞ্চল দৃষ্টি ভারী

হইয়াছে, চরণের চঞ্চল গতি সংযত হইয়াছে, উৎফুল্ল ওষ্ঠের হাসি এখন ম্লান হইয়াছে। সে গৃহিণী হইয়াছে,—সংসারের স্বাভাবিক নিয়মকে সে অস্বীকার করিবে কি করিয়া? উহা অস্বীকার করিবার প্রশ্নও তাহার মনে উঠে নাই। কিন্তু তাই বলিয়া এই সংসারের বিশিষ্ট অভ্যুদয়ের পক্ষে যে সে আপনাকে উপযুক্ত করিয়া তুলিতে পারিয়াছে, তাহা নয়। সে যোগ্যতা কোথায় সুর'র? এ সংসারে লক্ষ্মী নূতন করিয়া আবির্ভূত হইতেছেন। সেখানে হাস্যমুখে আগু বাড়াইয়া তাঁহাকে সাদরে আপ্যায়ন করিবার মত গৃহিণী না থাকিলে কি চলে? সুর যেন সেই লক্ষ্মীকে স্বাগত করিতেও জানে না,—শুধু তাঁহাকে মানিয়া লয়। নিরুৎসাহ, নিরুদ্যম মনে তাঁহার আসন পাতিয়া তাঁহার প্রসাদ গ্রহণ করে। গৃহের ভৃত্যদিগকে সে হুকুম করিতে পারে না প্রভুত্বের সহিত। প্রতিবেশিনীর সঙ্গে আলাপ করিতে আগাইয়া যায় আপনা হইতে। আবার পিছাইয়া আসে সংশয়ে। একটা বড় অফিসারের পরিবারের মত আত্ম-সচেতন গর্ব কোথায় তাহার অন্যদের সঙ্গে মেলামেশায়? সে 'খেলো' করিয়া ফেলিবে নিজেকে পরের সঙ্গে মিশিতে গেলেই; নষ্ট করিয়া ফেলিবে 'গাঙ্গুলী সাহেবের' প্রেষ্টিজ।

নির্বাক প্রয়াসে নিজেকে সুর তাই সঁপিয়া দেয় গৃহ-প্রয়োজনে। ত্রুটী ঘটিতে দিবে না;—না, ত্রুটী ঘটিতে দিবে না সে এই সংসারে নিজের আয়োজনে, তাহার অভিপ্রেত-অনভিপ্রেত দিন-রজনীর এই কঠিন, নিরর্থক ব্রতে।

ত্রুটী তবু ঘটিয়া যায়। ঘটিবে না কেন? নিজেরই অগোচরে হঠাৎ মাথা তুলিয়া বিদ্রোহ করিবার স্বপ্নও দেখে সুর'।—পশুপতির সম্মুখে দাঁড়াইয়া সে স্থির চক্ষে স্থির কণ্ঠে আজ বলিবে—'তোমার এ সংসার, এ সম্পদ, এ তোমার 'নতুন কপাল।' এর থেকে আমাকে মুক্তি দাও, ছুটি দাও। আমাকে আমি হতে দাও, আমি হতে দাও।'......চমকিয়া উঠে সুর'—কাহার কথা সে আবৃত্তি করিতেছে? কাহার কথা? ইহাতো তাহার উক্তি নয়। বুঝি অমিতের নিকট শোনা কোনো গল্পের নায়িকার। বুঝি ইন্দ্রাণীর—যে ইন্দ্রাণীকে সুরও ভালোবাসে—জানে তাহার মন বড় সুন্দর, আর বড় প্রশস্ত। তবু

সুর' মানিতে পারে নাই এই ইন্দ্রাণীর বিদ্রোহ। মানিতে পারে নাই ইন্দ্রাণীর আস্ফালন, পুরুষের সমাজে অত কুণ্ঠাহীন দৃপ্ত আচরণ; মানিতে পারে না ইন্দ্রাবৌদি'র আত্ম-প্রকাশের নামে আত্মপীড়ন। 'প্রগল্‌ভা, অন্তঃসারশূন্যা, আত্ম সর্বস্বা ইন্দ্রাণী'—সুধীরা ইহাই বলিবে। 'আপনার জিদ, আপনার বাহাদুরি ছাড়া কি আছে তার বিদ্রোহের কারণ ?'

সুধীরা কি করিয়া জানিবে সংসারের দুর্ভোগ,—ও জীবনের দুর্যোগ ?—যে দুর্যোগে সুর আহত, ক্ষত-বিক্ষত হইয়া পড়িতেছে, তাহাই কি পৃথিবীতে কেহ জানে ?—জানে সুধীরা ? জানে ইন্দ্রাবৌদি ? সুর ক্ষত বিক্ষত হইতেছে; তাই বলিয়া তাহা জানিবে নাকি কেহ ? সুর' ক্ষত বিক্ষত হইতেছে; তাই বলিয়া সুর বিদ্রোহ করিবে নাকি ? না, আত্মসর্বস্ব নয় সুর'। এত স্বার্থপর দর্পিতা কেন হইতে যাইবে সুর' ? সুর' কি নিজেকে সঁপিয়া দিতে পারে নাই সংসারের কাছে ?

মঞ্জুকে সুর কাছে টানিয়া লয়। সুর জানে তাহার ভাগ্যলিপি; মানে তাহার গৃহ-কর্তব্যের পবিত্র ব্রত; বোঝে—নিজেকে বুঝাইতেও পারে—সংসারে সে অনেক পাইয়াছে,—অনেক পাইয়াছে। পাইয়াছে পশুপতির মত স্বামী—কর্মী মানুষ, সম্মানিত মানুষ সে, পুরুষের মত আপনার ভাগ্যকে সে আপনি আয়ত্ত করিতেছে—বুদ্ধি দিয়া, পরিশ্রম দিয়া, কৌশল দিয়া, আপনার উন্নতির পথ প্রশস্ত করিয়া লইতেছে। কিন্তু সুর তাঁহাকে সেইখানে সাহায্য করিতে পারে নাই। তাঁহার গতিপথকে মসৃণ করিয়া তুলিতে পারে নাই সে। না, পশুপতির এই প্রয়াস প্রচেষ্টাকে, সাহেবদের প্রতি আনুগত্যকে, যেন ঠিক-মত সুর বুঝিতেও পারে নাই। সে ভাবে—এতটা তোষামোদ উঁহাদের না করিলেই বা কি ? কিন্তু তোষামোদ কোথায় ? ইহা যে কৌশল; ইহা যে অফিসের ডিসিপ্লিন্‌ও। না হইলে কে দেখে না—কী রকম কড়া মেজাজ, কঠিন প্রেস্টিজ-বোধ গাঙ্গুলী সাহেবের ? সুর তাই এইদিকে পশুপতিকেও বুঝিতে পারে নাই। সুর মানে—মনে মনে মানে, বুঝিতে অক্ষম বলিয়াই সে স্বামীকে বুঝিতে পারে নাই। বুঝিতে পারে নাই স্বামীর ভালোবাসার প্রকৃত রূপও—যে ভালোবাসা তাহার তরুণী

জীবনে প্রথম বিস্ময় আর রোমাঞ্চ সঞ্চার করিয়াছিল, তাহার কাছে পৃথিবীর রূপ বদলাইয়া দিয়াছিল—সে ভালোবাসা যে কত অপরিমেয় তাহাও স্বুর এই অত্যন্ত দিন-রাত্রির মধ্যে বুঝি ভুলিয়া যায়। কাহার জন্য পশুপতির এই দুর্জয় সাধনা? পুরুষ মানুষ পশুপতি,—উচ্চাকাঙ্ক্ষী উন্নতিশীল পুরুষ। পার্টিতে, মাইফেলে তাহার ডাক পড়িবে বৈকি। ঠিকাদার ব্যাপারী বণিকদের খানাপিনা, নাচ গানের আসরে তাহার না গেলে চলিবে কেন? তাই বলিয়া পশুপতি কি আত্মবিস্মৃত হইয়াছে? না বিস্মৃত হইয়াছে তাহার স্ত্রী, কন্যা সংসারকে, আপনার লোকদের? স্বুর সংশয়ান্বিত হয়, কিন্তু তখনি আবার বুঝিতে চাহে,—এবং বুঝিতে পারেও—কি জন্য স্বামীর এই প্রয়াস প্রচেষ্টা; নানা বাজে লোকের সহিত এত খাতির আপ্যায়ন? স্বুর'র জন্যই ত, মঞ্জুর জন্যই ত, তাহার পরিবারের সুখ সম্মানের জন্যই ত। স্বুর'র মন কৃতজ্ঞতায় পরিপ্লুত হইতে চাহে।

আর সেই কৃতজ্ঞতার বশেই আবার স্বুর' লিখিতে চাহে—কাহাকে লিখিবে? অমিত বড় একা, বড় দূরে এখন, রাজ-বন্ধনে জর্জরিত। স্বুর'র এই সুখের দিনে অমিদা'কে সে ভুলিয়া থাকিলে বড় অন্যায় হইবে স্বুর'র। বন্ধন-ব্যথার মধ্যে একটুকু সুখের স্বাদ অমিত গ্রহণ করিতে পারিবে—স্বুর'র এই সুখ-সৌভাগ্য জানিলে।

স্বুর' চিঠি লিখিতে বসে,—আপন সৌভাগ্যের কথা লিখিতে বসে। কোথা দিয়া লিখিতে লিখিতে মনে পড়ে এই সৌভাগ্যের মধ্যে তাহার কোল-শূন্য-করা সেই শিশুকে।—আর কি সে আসিবেনা? কেন সে আসিল, কেন সে গেল? ··কোথা দিয়া আপনার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের কথায় যেন কি কঠিন ক্ষোভের ও আবেগের তীক্ষ্ণ ঝটিকাঘাত আসিয়া লাগে। স্বুর' আপনাকে সামলাইয়া লয়—আপনাকে ফিরাইয়া লয় অশ্রুসজল কথার ধারা হইতে। অমিতের কথা, তাহার কুশল-অকুশলের প্রশ্নে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া স্বুর নিজের ক্ষোভকে, তাহার উদ্বেগ-বেদনাকে চাপা দেয়।—আর উহারই ভারসাম্য রাখিতে গিয়া অমিতের জন্য, তাহার শুভাশুভের জন্য স্বুর'র ভ্রাতৃ-মমতা, উৎকণ্ঠা, আবেগ হয় বন্ধন-মুক্ত।

গোয়েন্দা অফিসারের বহু ছাপ খাইয়া সে চিঠি অমিতের হাতের

পরিবর্তে ফিরিয়া আসিয়া পৌঁছায় পশুপতির কাছে। হতাশ বিমূঢ় সুর'র উপরে সমস্ত শ্বাপদ-সমাকুল সংসার এবার ঝাঁপাইয়া পড়ে। শুধু সুর অযোগ্যা নয়, সুর অপরাধিনী; সংসারেই সে শুধু মর্যাদাহীন নয়, সুর তাহার পাতিব্রত্যেরও মর্যাদানাশিনী।

তারপর? ভগ্ন বিপর্যস্ত অবসন্ন হইয়া ভাঙিয়া যায় সুর আপনার দেহে-মনে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধটা তখন বাগ্‌যুদ্ধের পর্বে। মেডিকেল কলেজের ক্যাবিনে সুরকে দেখিতে গেল অমিত। যাইতে সে চাহে নাই। পূর্বেই সে জানিয়াছিল পশুপতির মায়ের অপমানকর ইঙ্গিত, বুঝিয়াছিল সুর'র অসহ্য গঞ্জনা। তবু গেল; বারে বারে সুর জানাইয়াছে,—একটা কঠিন অস্ত্রোপচার তাহার প্রয়োজনীয়, অমিত কি তৎপূর্বে একবার দেখা করিতে আসিবে?

কিন্তু কাহাকে দেখিল অমিত? সুর কোথায়? মন্দির ভাঙিয়া পড়িয়াছে, আর কোথায় বা সেই ভাঙা-মন্দিরের দেবতা? একদিন যাহার চক্ষু ছিল সরল বিশ্বাসে সুন্দর, প্রাণের স্বচ্ছতায় নির্মল অতল, সে চক্ষু তাহার কোটর-গত, ক্লান্ত বিবশ, হাসিতে গিয়া শংকায় ত্রস্ত। সে রঙ নাই, সে রূপ নাই। সেই উৎফুল্ল অধর হাস্যহীন, রঙহীন, রক্তহীন। সর্বোপরি সেই ঝর্ণা-স্রোতের মত কণ্ঠ কেমন যেন চিরিয়া দ্বিখণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। মন্দির ভাঙিয়া গিয়াছে; কোথায় বা সেই ভাঙা-মন্দিরের দেবতা?

সুর কিছুই বলিতে চাহিল না, তবু অমিত বুঝিল অনেক। অস্ত্র করিবার কি প্রয়োজন আর? অনেক ক্ষতই ত তাহার জীবনে জুটিয়াছে, এই দেহটাকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া আর লাভ কি তবে? মিঃ গাঙ্গুলী আসেন নাই, আসিবেন অস্ত্র যেদিন হইবে সেইদিন। তিন দিনের বেশি থাকিবার উপায় নাই তাঁহার। যুদ্ধের সময়, অনেক কাজ এখন কোম্পানির। সাহেবরা নাই, যুদ্ধে গিয়াছেন; তিনিই বড় ইঞ্জিনীয়ার। কারখানায় মজুরদের গোলমালও লাগিয়াই আছে। সুরকে একটু নিরাপদ দেখিলেই তিনি ফিরিয়া যাইবেন। 'মঞ্জু?' একটু হাসি ফুটিল সুর'র। মঞ্জু আসিতে চাহিয়াছিল, সুর'রও ইচ্ছা ছিল

লইয়া আসে। কিন্তু শ্বশুরের তাহা মত নয়—এই সব কাটা-ছেঁড়ার ব্যাপারে অতটুকু মেয়ের থাকা উচিত নয়। পশুপতিরও তাহাই মত। বিশেষত স্থরও বোঝে ক্লাশে মঞ্জুর পড়া-শুনার ক্ষতি হইবে। পড়িতেছে বৈকি। মঞ্জু বড় হয় নাই? পনের পার হইতেছে যে। মিশন স্কুলের উঁচু ক্লাশে উঠিতেছে সে, সিনিয়র ক্যাম্ব্রিজ দিবে এক বৎসর পরে।

—আমরা ত দেশের কোনো কাজেই লাগলাম না। ওরা যদি তবু তোমাদের কাজে লাগে।—ক্ষীণ ম্লান হাসি স্থর'র অধরের কোণে।

...একটা জীবনের ইতিহাস কি পড়িতে পারা যায় না? পড়িতে কি বাধা ছিল তোমার, অমিত?

ভাঙা-মন্দির দেখিয়াছ, অমিত। ইতিহাসের ছাত্র তুমি। নালন্দা, তক্ষশীলার ভগ্নস্তূপ হইতে পুনর্গঠিত করিতে পারা যায় সে দিনের মন্দির। মেডিকেল কলেজের মেয়ে-ওয়ার্ডের এই 'বেড্ নম্বর—১৩' হইতে পুনর্গঠিত করিতে পারিবে না তুমি অতীতের স্থর'কে?...

ডাক্তার অস্ত্র যথাযথ নিয়মে করিয়াছিলেন, শুধু স্থর'র স্বাস্থ্যই গোল ঘটাইল। তাই একটা বৎসর ঘুরিয়া না আসিতেই সে অতি সহজে সংসার হইতে বিদায় লইল, চুকাইয়া দিল গাঙ্গুলীদের সংসারের একটা দায়।

শ্বাশুড়ী তখন নাই, বৃদ্ধ শ্বশুর গৃহে রহিয়াছেন; আর আছেন কর্মব্যস্ত স্বামী, —এক মুহূর্তও তাহার নিঃশ্বাস ফেলিবার অবসর কোথায়? বিশেষত যুদ্ধ তখন ঘনাইয়া উঠিয়াছে। কোম্পানির চাকরি করিতেই যুদ্ধের দুই একটা ছোটখাটো বিজ্‌নেসে বেনামীতে পশুপতি টাকা ঢালিতেছে। গোপন হইলেও সেই দিকে দৃষ্টি রাখিতে হয়,—মারোয়াড়ী অংশীদারকে বিশ্বাস আছে না হইলে? কিন্তু কে পশুপতিকে দেখে, কে দেখে সংসার? কে তাহার বৃদ্ধ পিতাকে করে সেবা? মঞ্জু? সে পারিবে কেন? সেভাবে সে পালিতা হয় নাই। দুরন্ত, চপল, মেয়ে সে। তাহা ছাড়া পরীক্ষাও দিতে হইবে তাহাকে কিছুদিন পরে, পড়াশুনা না করিলে তাহার চলে?

বড় বিপদ হইল পশুপতির। কিন্তু বিজনেস্ ত বিজনেস্ই।

যুদ্ধের বাজার জমিতেছে। বোমা-পড়া কলিকাতায়ও আবার ভিড় বাড়িতেছে। চাকরি ছাড়িয়া পশুপতি আসিয়া উপস্থিত হয়, বিজনেসে সে নামিতেছে প্রকাশ্যে। বালিগঞ্জের বাড়িতে পশুপতি একা, মঞ্জু রহিল ঘাটশিলায় বোমার এলেকার বাহিরে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরই সে পরীক্ষা দিবে। তাই মঞ্জুকে বাঙলা ও অংক শিখাইবার জন্য টিউটর প্রয়োজন। 'অমিত মামার' কথা বাবাকে মঞ্জুই মনে করাইয়া দিল। অমিত? পশুপতির বিশেষ মনঃপূত হইল না। অমিত লোকটা লক্ষ্মীছাড়া, সন্দেহ-জনক চরিত্রের। পশুপতির সংসারে অবশ্য গোলযোগ সে ঘটায় নাই। সে দোষ স্বুর'রই। কেমন মস্তিষ্ক-বিকৃত ছিল স্বুর'র বরাবরই, মাত্রাজ্ঞান যেন কিছুতেই জন্মে নাই। শরীরও ছিল তেমনি তাহার অক্ষম—যেন ব্যাধিগ্রস্ত হইতেই জানিত। পশুপতির সংসারে সে না দিতে পারিয়াছে শান্তি, না দিতে পারিয়াছে মর্যাদা। 'শী মেণ্ট নো বিজ্‌নেস।' মাথা-ভর্তি ছিল ননসেন্‌স্‌। না, সে দোষ অমিতের নয়। তবে মন্দ না হউক, অমিত লোকটারও মাথা-ভরা নন্‌সেন্‌সে। কিন্তু মঞ্জুর জন্য একজন টিচার খুঁজিয়া দিতে সে পারিবে। না, পুরুষ টিচার নয়। একা বাড়িতে বৃদ্ধ পিতা মাত্র থাকেন, সেখানে মঞ্জুর জন্য পুরুষ টিচার পিতারও পছন্দ হইবে না। পশুপতিরও মতে মেয়ে-টিচারই চাই। পশুপতি পয়সা খরচ করিতে গররাজী নয়; কিন্তু ভালো ঘরের মেয়ে হওয়া প্রয়োজন। তাহার মেয়ের শিক্ষার ভার পশুপতি যে-সে মেয়ের হাতে দিতে পারে না। চাই ভালো টিচার—সেও কলিকাতার বোমার ভয় হইতে বাঁচিবে, অধিকন্তু পাইবে ঘাটশিলায় গবর্ণেসের মত খাদ্য ও বাসস্থান।

শোভাকে মঞ্জু নিজেই স্থির করিয়া ফেলিল, তাহাদের স্কুলও বোমার ভয়ে ঘাটশিলায় বসিয়াছে। আণ্ডার-গ্র্যাজুয়েট হইলেও অাঁক ও বাঙলায় মঞ্জুকে শোভা সাহায্য করিতে পারিবে, অনুমাসীও তাহা লিখিয়াছেন।

'আপনি অমিত মামা, না?' সভার শেষে একটি মেয়ে আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। এ কে? এমন সচকিত চক্ষু, এমন ওষ্ঠাধর, এমন স্বতোচ্ছ্বসিত সানন্দ কণ্ঠস্বর—বলে কি?

—আপনার কথা অনেক শুনেছি মায়ের মুখে—

অমিত বুঝিতে পারে না তথাপি কে এই তরুণী।

আমি মঞ্জু।

মঞ্জু! কিশোরী কোমল দৃষ্টি, বুদ্ধিমতী সুরকে মনে পড়িল অমিতের। বুঝিতে বাকী রহিল না—হাঁ, সে মঞ্জু! সুর'র সেই চোখ, সেই ওষ্ঠাধর, সেই কণ্ঠস্বর, সব—যাহা ভস্মশেষে মিলাইয়া গিয়াছিল যখন শেষবার অমিত সুরকে দেখে হাসপাতালের ক্যাবিনে,—অনেক দিনে তিলে তিলে উহার সব কিছু তখন লুপ্ত হইয়াছে। সুর কিছুই না বলিলেও তাহার সেই শ্মশান-শেষ রূপ দেখিয়াই অমিত বুঝিয়া ফেলিয়াছিল একটি অকথিত জীবনের কাহিনী; বুঝিয়া ফেলিয়াছিল সেই ভগ্ন মন্দিরের কথা। দেখিতে পাইয়াছিল এদেশের সমস্ত বন্দিনী নারী-জীবনের বহু বহু শতাব্দী-জোড়া ইতিহাসের একটি ছত্র। কত পরিচিত সে ইতিহাস অমিতের! কত গৃহে না সে দেখিয়াছে—কত চকিতে-দেখা বেদনাতুর নারী-মুখে, কত অবসন্ন, ক্লান্ত নারী-দেহে আবার কত সালঙ্কারা শৃংখল-গর্বিতা ফ্যাসন-সর্বস্বার দম্ভে।

সেই সুর' যেন সম্মুখে।—কিন্তু বিশ-পঁচিশ বৎসরের কালস্রোতের এই পারে সে আর সে নাই। ইস্কুলে কলেজে বাহিরে বিদেশে স্বচ্ছন্দ বিচরণের মধ্য দিয়া সেই এখনকার সুর'—বা সুরর তনয়া মঞ্জু—আর সেই হাস্যময়ী বাঙালী মেয়েটি নাই।—সেই চক্ষু আছে, কিন্তু সে কোমল দৃষ্টি নাই। সেই উৎফুল্ল অধর আছে, কিন্তু হাসিতে সেই স্নিগ্ধ ছটা নাই; সেই কণ্ঠ আছে, কিন্তু নাই তাহাতে মমতার আন্তরিকতা; সেই মুখ, সেই দেহ,—কিন্তু নাই সেই লজ্জানম্র সরলতা, জীবনের সেই গভীরতা। এই মঞ্জু!—চঞ্চলা, প্রখরা, চকিত দৃষ্টি, চকিতগামিনী, তরুণী নয়—বালিকা মঞ্জু!

এই মঞ্জু! আরও ষোল বছর পরে এদেশের নারী-নিয়তির বিধানে অমিত হয়ত আবার তাহাকেও দেখিবে ভাঙা-মন্দির। হয়ত বা এমন মন্দির যেখানে দেবতার প্রতিষ্ঠাও হয় নাই কোনদিন—যেখানে পূজা হয় নাই, দেবতার আহ্বান ধ্বনিত হয় নাই—উঠিয়াছে শুধু ফ্যাসানের স্তব। শুধুই পলে

পলে নব-নব বিলাসে ফ্যাসানে ভাসিয়া যাইবে চঞ্চলা এই অগভীর-অন্তরা বালিকা।···

মঞ্জুকে সেই প্রথম দেখিল অমিত ঘাটশিলায় সভাশেষে। খুশী হইল, দুঃখিতও হইল। তারপর মনে মনে একটা দ্বিধাও বোধ করিল—পশুপতি লোকটা 'ভাল্‌গার'। না, তাহার গৃহে অমিত যাইতে চাহে না। অতএব মঞ্জু শুনিল—অমিতের গাড়ীর সময় হইয়াছে। এখন যাওয়া সম্ভব নয় কাহারও বাড়ি।

দিন তিনেক পরে মঞ্জুই উপস্থিত অমিতের গৃহে কলিকাতায়: 'আমি মঞ্জু!'

শোভাদি'ক নিয়ে চলে এলাম—আপনার সঙ্গে দেখা করতে। অনু-মাসী নেই বুঝি? বালিগঞ্জের বাড়িতে যাইনি? হাঁ, গেছলাম। দেখলাম বাবা নেই। তিনি নাকি গিয়েছেন দু'দিনের জন্য যশোরে,—সেখানে কি এরোড্রোম তৈরী করছেন। বেয়ারা আর ঠাকুরকে বললাম,—লোকজন আরও কে-কে ছিল চিনি না,—বলো ' 'মঞ্জুদি' এসেছিলেন। রাত্রিতে ফিরে যাবেন আবার ঘাটশিলা।' দিনের বেলা আজ খাবো যেখানে হয়। বেশ, আপনাদের এখানেই খাবো—কলকাতায় ঘুরব। আপনি ত আর গেলেন না। আমিই এলাম আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে, অনু মাসী আসবেন কখন? শ্যামলবাবু?

তাহার পরে অনুর সঙ্গে মঞ্জুর ও শোভার কথা আর শেষ হয় না।

সেই মঞ্জু পাশ করিল, কলিকাতার বোর্ডিংএ থাকিয়া কলেজে পড়িতে লাগিল। পশুপতি তখন যুদ্ধ কণ্ট্রাক্টের এভারেস্ট-অভিযানে অগ্রসর হইতেছে। বাড়িতে নানা লোক, বিজ্‌নেস্‌এর নানা ধরণের মানুষ সেখানে সর্বদা আসে যায়; কেহ কেহ থাকেও। মঞ্জু একা থাকিবে কি করিয়া? মঞ্জুও বাঁচিল। বোর্ডিংএর বহু ছাত্রীর মধ্যে সে আপনার স্বচ্ছন্দ স্থান করিয়া লইয়া মহোৎসাহে কলিকাতা শহরে ঘুরিয়া বেড়াইতে পায়।

কয়মাস পরে অনু একদিন জানাইল, মঞ্জুর বাবা আবার বিবাহ করিতেছেন; —সেই শোভা রায়কেই বিবাহ করিতেছেন। কি করিবেন পশুপতিবাবু? তাঁহার বৃদ্ধ পিতাকে দেখিবার লোক নাই। তাঁহাকেই বা কে দেখে? তাহা ছাড়া পিতা ও আত্মীয়-স্বজনও চাহেন বংশে একটি পুত্রসন্তান থাকুক।

নিশ্চয়ই—হাসিয়া বলিল অমিত।

হাসিল অনুও। বলিল,—আমরা যখন ইস্কুলে, শোভাদি' তখন নতুন টিচার। তারপরে কলকাতার ইস্কুলে ছাত্রী আন্দোলন গড়তে নেমেছি। শোভাদি'কে বলেছি—কাজে আসুন। শোভাদি' কান দিতেন সব কিছুতে,—কিন্তু মন দেবেন না। দেবেন কি করে? ওঁর জীবনের আদর্শ আরও অনেক বড়—মহত্তের সংসর্গে তিনি জীবনকে বাঁধবেন। আদর্শ এত উচ্চ বলেই তিনি বিয়ে করতেও চান না। না, বিয়ে করতে তাঁর আপত্তি নেই, মা হতেও আগ্রহান্বিতা। কিন্তু বিয়ে করলে বিয়ে করতেন তিনি হিট্‌লারকে কিংবা আইনষ্টাইনকে; গান্ধীজীকে কিংবা রবীন্দ্রনাথকে;—তিনি তখনো বেঁচে ছিলেন।

অমিত হাসিল, সুভাষ বোস্ জওহরলাল পর্যন্ত নামতে রাজী ছিলেন না বোধ হয়?

না—অনু হাসিতে লাগিল।

আগা খাঁ?

বলা যায় না,—হাসিতে লাগিল অনু।

সো, এখন পশুপতি গাঙ্গুলী—সকলের সমাহার দ্বিগু—না গান্ধীজী, না রবীন্দ্রনাথ, না হিট্‌লার না আইনষ্টাইন্—কিন্তু ওয়ার কন্ট্রাক্টের এ্যাডভানচারার। কিন্তু মঞ্জু করছে কি?

কি করবে? খবরটা তোমাকে দিতে এসেছিল। একটু বিশ্রী লাগছে হয়ত তারও; কিন্তু ভাবে তা বুঝলাম না। কোষ্ঠীতেও নাকি মিলে গিয়েছে পশুপতি বাবুর ও শোভাদি'র। মঞ্জুই বললে, বিজনেস্ এখন খুব ভালো চলছে পশুপতি বাবুর। 'বিয়েতেও দু'দিনের বেশি সময় দিতে পারবেন না, বাবা।'

অমিত হাসিল: মঞ্জুও দেখছি বিজনেস-লাইক্।

...সুর'র মত তাহার চোখ, মুখ, গলা; কিন্তু সে ত সুর নয়! বরং মঞ্জুও পশুপতিই, সে বিজনেস্-লাইক্। বাপের বিবাহও 'বিজনেস্-লাইক্' রীতিতে সে গ্রহণ করিতেছে—যেন ইউরোপ-আমেরিকার মেয়ে। আশ্চর্য দেশ!

যার পিণ্ডদানের জন্ত বংশরক্ষার দাবীও শেষ হয় নাই; কোষ্ঠী মিলাইয়া প্রাগ্‌দাম্পত্য পূর্বরাগকেও পাকা করিতে হয়; আবার দুইদিনের বেশি সময়ও আর বিবাহে দেওয়া সম্ভব নয়—বিজনেসএর তাড়া যে বড় প্রবল।—একই সঙ্গে, খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতক, খ্রীষ্টীয় একাদশ শতক আর একবারে বিংশশতকও,—সব তালগোল পাকানো। মঞ্জু ও একই সঙ্গে সুর আর পশুপতি; আর সব তালগোল পাকিয়ে—শেষ পর্যন্ত কি সে? দিনে দিনে তুষানলে ভস্মীভূত সুর, কিংবা—ললিতা?··· সংসারের দাহে, দগ্ধ, তিক্ত, বিরক্ত সদা-খেঁকানো শিল্পী বিকাশের একদা-তন্বী, অধুনা শাঁখচুন্নী প্রেয়সী—পূর্ণিমা? হাকিম স্বামীর ঐশ্বর্যবাহিনী, শৈলেশের পদ-গর্বিতা, মেদবর্ধিতা স্ত্রী পুঁটু—এখন যে প্রতিভা? কিংবা, খুব বেশি হইলে বুর্জোয়া প্রতিষ্ঠা-শিকারিণী প্রচার-কামিনী মিসেস সেনরায়? ··অথবা সব ছাড়াইয়া সব হারাইয়া পেটি-বুর্জোয়ার বিদ্রোহের উন্মাদনায় উন্মত্তা, বিক্ষুব্ধ-চিত্তা, বিক্ষিপ্ত-চেতনা ইন্দ্রাণী?···

কিন্তু আপাতত শুধু scatter-brain বিক্ষিপ্ত-বুদ্ধি! কথা বলিতে গেলে চেঁচাইয়া উঠে, চলিতে গেলে ছুটিয়া চলে, হাসিতে গেলে ঢেউএর মত লুটাইয়া পড়ে।···

বলিতে গেলে চেঁচাইয়া ওঠা, চলিতে গেলে ছুটিয়া চলা, আর হাসিতে গেলে ঢেউ-এর মত লুটিয়া পড়া এই মঞ্জু আমিতের চোখে তবু প্রশ্রয়ই পাইয়া গিয়াছে,—সুর'র মেয়ে সে। বালিকা, নিতান্ত বালিকা। হাসির, কথার, চলার-বলার তুফানে চড়িয়া সে যে অমিতের-অন্তর কর্মক্ষেত্রের কাছাকাছিই ফিরিতেছিল, অমিতের তাহা লক্ষ্য করিবার অবসর হয় নাই। কিন্তু একদিন পশুপতি আসিয়া উপস্থিত হইল অমিতের নিকট—মঞ্জুকে একি প্রশ্রয় দিতেছে—অমিতেরা?

কি ব্যাপার?

কেন জানা নাই নাকি তাও তোমার?

লোকটা এমনি পাকা বদমায়েস। ঠিক সুর'র সঙ্গে সম্পর্কেও' সে এমনি একটা সরলতার ভাণ করিত। পশুপতি মনে মনে জলিয়া গেল, কিন্তু সে কাজ

পণ্ড করিতে আসে নাই। 'আই নো মাই বিজনেস'! এত লোককে ম্যানেজ করি, আর তুমি অমিত?

পশুপতি একবারে আত্মীয় হইয়া গেল: 'ফাইব্ ফাইব্ ফাইব্' সিগারেটের কৌটা খুলিতে খুলিতে বলিয়া চলিল: জানোইত ওর মাথায় কিছু নেই; ওর মায়েরও ছিলনা। মানে, ভালোমানুষ ছিলেন আমার ফার্স্ট ওয়াইফ্। সতীলক্ষ্মী সিম্পল্,—এড্ভান্টেজ নিত সকলে। তারই মেয়ে ত মঞ্জু। ন্যাচারলি, তাকে দশজনে যাতে নাচিয়ে না দেয় তা দেখা—এজ্ মাচ্ আমার ডিউটি, এজ্ ইওর্স।

অমিত সে বিষয়ে একমত। কিন্তু কাণ্ডটা কি?

ওসব ফুলিশ্নেস থেকে মঞ্জুকে দূরে রাখো ত—এই ছাত্রীদল, ছাত্রদল, পুত্রদল, কন্যাদল,—কত কি যে সব তোমাদের দল হয়েছে! তুমি পলিটিকস্ করো, সে এক কথা—লেখা পড়া শিখেছ, নামটামও করেছ, এ্যাসেম্ব্লিতে যাবে, কর্পোরেশনে ঢুকবে;—হাঁ, তুমি একটা লাইন ধরেছ। ছোকরারা যে হৈ-চৈ করে, বুঝি তাও। কিন্তু মেয়েদের কেন ও হুল্লোর?—আর ইয়ংগার্লস্দের? একটা বিপদ ঘটলে?

ঘটবে—অমিত এবার অবলীলাক্রমে বলিল।

ঘটবে!—বিস্ময়ে প্রায় হতবাক হইতেছিলেন পশুপতি গাঙুলী। তারপর আবার সামলাইয়া লইলেন। হাসিয়া ফেলিলেন, বলিলেন: যাক, একবার একটু সীরিয়াস হও ত। সীরিয়াসলি—বলো ত কি করি? তুমি তোমার বোন—কি নাম তার? অনু? অনুজা?—সে বিয়ে করেছে বুঝি তার ক্লাশ মেটকে? ক্লাশ মেট্ নয়, সহকর্মী? এনি ওয়ে, ভিন্ন জাতের ছেলে সে, তা যাক।—তোমরা কলকাতা আছ, তাই আমি একরকম নিশ্চিন্ত। নইলে কলকাতায় কে কাকে চেনে? সাংঘাতিক জায়গা। তোমাদের থেকে মঞ্জুর আপনার আর কে আছে? আমি তাকে দেখি কখন? বিজ্নেসই দেখে উঠতে পারি না। আমার ওয়াইফ্, মানে মঞ্জুর নতুন মা, কি শোনেন কার কাছে, তিনি চিন্তিত হয়ে পড়েন। বলেন, 'বোর্ডিংএ থেকে কি করে না-করে মঞ্জু

জানিনা। এখন নানা রকমের দল আর পলিটিক্স্। মঞ্জু নাকি জুটেছে কমিউনিষ্টদের দলে।' আমিই বা এ-সব কি জানি? তবে জানি—ঠিকই হচ্ছে। যুদ্ধে তোমরা কো-অপারেট করছ, গবর্ণমেণ্টও তোমাদের ব্যাক্ করছে। এণ্ড ইউ আর ডুয়িং গুড্ বিজ্নেস। তা ছাড়া তুমি যখন আছ কমিউনিষ্ট—তখন মঞ্জুর জন্য আমি কেন ভেবে মরি? কিন্তু ছাখো, এ শহরে যখন তখন যেখানে সেখানে মেয়েদের ঘুরে বেড়ানো আমি ভালো মনে করি না। এ কথাই বলেছি কি সেদিন অমনি চটে উঠে মঞ্জু বাড়ি থেকে চলে গেল। কিন্তু আমরা হিন্দু; সমাজ, সংসার আছে, তুদিন পরে ওর বিয়ে হবে, বাজে মেয়ের মত পথে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়ালে ভালো ঘরে বিয়ে হবে আর ওর? কেমন, ঠিক্ না?

অমিত জানাইল যে, ঠিকই।

তাহলে—নাউ কম টু বিজনেস। কি করবে তুমি?

অমিত বুঝিতে পারিল না বিজ্নেস্টা কি।

হাসিয়া পশুপতি বলিলেন আই লিভ্ হার টু ইউ। তুমি আর তোমার বোন—কি নাম যেন তার? অনু, না?—বেশ তোমাদের উপর ভার রইল মঞ্জুর।

অমিত আপত্তি করিল, এ অন্যায় কথা, মিষ্টার গাঙ্গুলী। মঞ্জু আপনার মেয়ে, তার দায়িত্ব অন্যের উপর চাপাতে চাইলে হবে কেন? কিন্তু পশুপতি তাহার আপত্তি কানেই তুলিল না। হাসিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল: ওসব আমি ভাবতেই টাইম্ পাব না। বেশি কথা বলেই বা কি হবে?

অমিত আর অনুকেই মিঃ গাঙ্গুলী মঞ্জুর 'ভার' দিবেন।

নিজের পরিচয়-পরিধি হইতে মঞ্জুকে আরও দূরে রাখিয়া দিল অমিত। তাহাতে অসুবিধা ছিল না। কলিকাতার কোন কলেজের এক ছাত্রী মঞ্জু; আর কোথায় নানা কাজে, গ্রন্থপ্রচার ও সম্পাদনায়, নানা আড্ডায়, গল্পে, সভায় সমিতিতে সদা ব্যস্ত অমিত। তবু মাঝে মাঝে সেই ত্বরিত-চরণা বালিকা অমিতের কার্যক্ষেত্রের সীমায় আসিয়া পড়িত, জানাইয়া দিত—মঞ্জু বেশি দূরে

নাই। অনুর কার্য ও কার্যক্ষেত্রের মধ্যে ত তাহার স্থান আছেই, অমিতের কার্যক্ষেত্রের মধ্যেও সে আপন অধিকারেই আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে॥ কিন্তু অমিত তাহার সম্বন্ধে খোঁজ রাখিত অল্পই। ছাত্র ও ছাত্রী সমিতিতে বরং উগ্র সম্বর্ধনার দিন আসিয়াছে 'বিয়াল্লিশী বিপ্লবীদের'। যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে। দেশ 'স্বাধীন' হইতেছে। আন্দোলনের ধাপে ধাপে পা ফেলিয়া ফেলিয়া মঞ্জু কোথায় দাঁড়াইয়াছে হয়ত অনুর মুখে অমিত তাহা শুনিতে পারিত, কিন্তু সেদিকে তখন তাহার দৃষ্টি নাই। ইতিহাস যে এই দেশে জোর কদমে পা বাড়াইতেছে! হঠাৎ পথে অমিত দেখিল ২৯শে জুলাই মিছিলের মধ্যে এম, এ ক্লাশের ছাত্রীদের নেত্রী মঞ্জু। চুল উড়িতেছে, মুখে চোখে অক্লান্ত উদ্দীপনার সঙ্গে শ্রান্তির কালো দাগ; অজস্র হাসির মধ্যে তাহা এখনো মিলাইয়া যাইতেছে তবু একেবারে তাহা অদৃশ্য থাকিবে না,—যেমন অদৃশ্য নাই আজ তাহা অনুর চোখে, অনুর মুখে—এই ২৯শে জুলাই'র বিরাট-জনস্রোতের মধ্যে। পৃথিবীর কাছে অনু পরাজয় না মানিয়া অনমনীয় তেজে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে,—কে চিনিবে তাহাদের সেই শ্রী, তাহাদের তেজোদ্দীপ্ত মনের মহিমা, তাহাদের ক্রমক্ষয়িত রূপস্বাস্থ্যের ইতিহাস? ইতিহাসের কি ঐশ্বর্য কিনিতে গিয়া কি মূল্য দিতে হইবে জানে কি তাহা তাহারা—এই চঞ্চলা, অগভীর-চিত্তা এ-কালের মঞ্জুরা?

…ইতিহাসের কোন মূল্য কি ভাবে আদায় হয়, তাহা কি তুমিই জানিতে সেদিন, অমিত?—আপনাকে চকিতের মত জিজ্ঞাসা করিল অমিত।—পনের দিন শেষ হইতে না হইতে ভ্রাতৃরক্তের স্রোতে ডুবিয়া গেল কলিকাতার সেই বৈপ্লবিক ভ্রাতৃত্ব। তারপর নোয়াখালি, বিহার, পাঞ্জাব; আর ইতিহাসের সমস্ত সত্যকে খণ্ড খণ্ড করিয়া খণ্ডিত হইয়া গেল তোমার ভারতবর্ষ, খণ্ডিত হইয়া গেল তোমার বাঙালা, অমিত!—আর তুমি—তোমরা? বলিতে পারিলে না তোমরা 'মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা! তোমাদের এই ম্যাউণ্টব্যাটনী স্বাধীনতা মিথ্যা—মিথ্যা তোমাদের জওহরলাল-গান্ধী, মিথ্যা তোমাদের জিন্নাহ্!'—কংগ্রেস-লীগের এই জয় আসলে বিশ্বাসঘাতকতা ভারতবর্ষের বিপ্লব-মুখী গণ-অভ্যুত্থানের সঙ্গে। কলকাতা, নোয়াখালি, বিহার—এ শুধু এক নতুন রাইষ্টাগী বহ্ন্যুৎসব

ধ্বযুগের সাম্রাজ্যবাদের।—অথচ তাহাতে পুড়িয়া গেলে তোমরাই—এদেশের গণ-জাগরণের কর্মীরা।... অমিতের বুক জ্বলিতে লাগিল সেই দাঙ্গাতে দেশ-বিভাগের ক্ষতে—কোথায় তখন মঞ্জু, কোথায় তখন পশুপতি ?

মাস দুই পরে আবার পশুপতি আসিলেন। এবার কথাটা পরিষ্কার করিয়া না লইয়া তিনি যাইবেন না। গেলেনও না। অমিতের কাছে কথাটা তিনি পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে চান—মঞ্জু কি তাহার পিতার কথা শুনিবে, না, শুনিবে অমিতদের কথা ? না, না ; অমিত কথাটা এড়াইয়া যাইতে পারিবে না। এই প্রশ্নের উত্তর দিক সে, স্পষ্ট করিয়া উত্তর দিক। মঞ্জুর বয়স হয় নাই নাকি ? তাহার বিবাহ হইবে না ? সে বিষয়ে কি ভাবে না কিছু মঞ্জু ?—এখনো যে যত নাম-না-জানা ছোকরাদের সঙ্গে সে নাচিয়া বেড়ায় ? অমিত ইহার কিছুই জানে না, পশুপতি এই কথা বিশ্বাস করিবেন কি করিয়া ? চিরজীবনই অমিতের নীতি 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি', 'ডুবিয়া ডুবিয়া জল খাওয়া'। কিন্তু পশুপতি সমাজ সংসার মানেন, বিবাহ মানেন, সতীত্ব মানেন, মেয়েদের লজ্জা-সরমের প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া মনে করেন।—আজ ইহার সঙ্গে, কাল উহার সঙ্গে প্রেম করিয়া বেড়ানো এই দেশের মেয়েদের আদর্শ নয় ;—রুশিয়ায় চলিতে পারে, ভারতবর্ষে চলিতে পারিবে না। অন্তত পশুপতি ইহা চলিতে দিবেন না। মঞ্জুকে হয় তাহার কথা শুনিতে হইবে, না হয় পিতার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করিতে হইবে।

অমিত বিরক্ত হইতেছিল, তথাপি বুঝিতে চাহিল ব্যাপারটা কি ?

কেন, অমিত জানে না নাকি ? ন্যাকা সাজিতেছে যে ! অবশ্য ন্যাকা সাজা তাহার পক্ষে নূতন নয়। পশুপতি আপনার উষ্মা গোপন করিল না। কিন্তু থামিল, অমিতকে বলিল—মঞ্জুর জন্য তিনি পাত্র স্থির করিয়াছেন। কথা এখনি পাকা হইতে পারিত।—চা বাগানে অগাধ সম্পত্তির মালিক তাহারা। কৌলিন্যেও পাল্টা ঘর, কোষ্ঠীতেও মিলে। বি, এ পাশ করিয়া ছেলেটী বিজনেস দেখে—না হয় বিলাত ঘুরিয়া আসিবে। কিন্তু মঞ্জুকে বিবাহের বিষয়ে বলিতেই সে ক্ষেপিয়া গেল—সে বিবাহ করিবে না। যেন বিবাহ না করিয়া কেহ থাকিতে

পারে? পশুপতি তবু ভাবিয়াছিলেন মেয়েকে একটু সময় দিবেন—মাথা ঠাণ্ডা হউক মঞ্জুর। কিন্তু ইতিমধ্যে কি কনফারেন্‌স হইতেছে অমিতদের—বিদেশের মেয়ে-পুরুষ আসিতেছে। তাহাতে মঞ্জু কয়েকটা ছোকরার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া পশুপতির বাড়িতেই একটা আপিস খুলিয়া বসিতেছে। পশুপতি আসামে ছিলেন—বৎসর দুই পূর্বে যুদ্ধ থামিতেই একটা ভারী লস্‌ দিতে হইয়াছে বিজনেসে। এখন যুদ্ধ নাই; নানা দিকে তাল সামলাইতে ব্যস্ত। তাঁহার ওয়াইফ থাকেন বালিগঞ্জের বাড়িতে, তাঁহার মাদার ইন্‌ল'ও এখন আছেন সেখানে। তাঁহাদের কাহাকেও বলা-কওয়া নাই; আপনার খুশী মত মঞ্জু বাড়িতে সভার ব্যবস্থা করিতেছে! বলে, "তোমাদের মহলে হাত দিচ্ছি না। ভেতরের দিকের এ দুটো ঘরেই আমাদের হবে,—আমাদের আলোচনার কথাবার্তার জন্য একটা গোপন জায়গা চাই।" পশুপতি শুনিয়া সন্ত্রস্ত-রুষ্ট হইয়াছেন,—এই বাজারে গবর্ণমেণ্ট কণ্ট্রাক্টগুলিও যাইবে পুলিশের খাতায় নাম উঠিলে। না, গোপন জায়গা যেখানে খুশী হোক্‌, কিন্তু পশুপতির বাড়িতে নয়? ওয়াইফের নিকট হইতে খবর পাইয়া পশুপতি তাই আসিয়াছিলেন। ওই দুই-তিনটা ছোকরার সঙ্গে মঞ্জুর কি সম্পর্ক, তাহা জানিতে পারেন কি পশুপতি? অমিত কিছু জানে না? মানে, বলিবে না? সে না বলুক খুব বিশ্বাসী লোকের নিকটেই পশুপতি সব কথা জানিতে পারিয়াছেন। কিন্তু একটা নয়, দুটা নয়, গুচ্ছের ছোকরার সঙ্গে যে মেয়ে ইয়ার্কি-ফক্কুরি করিয়া বেড়ায়, কোন ছেলে জানিয়া শুনিয়া তাহাকে বিবাহ করিবে? তাহা ছাড়াও অনেক কথাই ভাবিতে হয় পশুপতির,—তিনি ত সমাজে থাকেন। কাল যদি মঞ্জুর একটা ভাই হয়—সে সম্ভাবনা যখন হইয়াছে—

অকস্মাৎ অমিত কৌতুক বোধ করিল: তাই নাকি? তা হলে খাওয়াবার ব্যবস্থা করুন আমাদের।

কিন্তু পশুপতি পথভ্রষ্ট হইলেন না: বিধাতার হাত। যখন মঙ্গলমত সব হইবে, তখন সবই তাঁহাকে করিতে হইবে,—তিনি সমাজে থাকেন। পরিবারে অন্য দশজন আছে। এই সব কথাও মঞ্জুকে তিনি বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু

পারিলেন না। অমিতকেই তাই পশুপতি জানাইতেছেন—পারিলে অমিত বুঝাক মঞ্জুকে। না হইলে আর পশুপতি কি করিবেন? মঞ্জু যদি ইহার পরেও বাড়ি ছাড়িয়া যায় যাইবে। সেজন্য বাড়িটাকে ত কমিউনিষ্টদের কেলিকুঞ্জ করিয়া ফেলিতে পারিবেন না পশুপতি। বিশেষত তাঁহার স্ত্রীর অবস্থাও এখন ডেলিকেট—একবার গোলমাল হইয়া গিয়াছে। এইবারও এখন বাড়িতে ছোঁড়াছুঁড়িদের হুল্লোড়। এসব এক্সাইটমেণ্ট, নার্ভাস ষ্ট্রেন্ তিনি ষ্ট্যাণ্ড করিতে পারিবেন কেন?

অমিত বুঝিল, জিজ্ঞাসা করিল, মঞ্জুকে তাহলে কোথায় দিচ্ছেন?—বোর্ডিংএ?

আমি দিব কেন? বাড়িতেই সে থাক না। তবে দশটা মেয়ের মত থাকবে। বৈশাখেই বিয়ে হয়ে যাবে তার। কিন্তু কথাটা বুঝে রাখুন আপনি—'আই মিন বিজনেস'।

আবার পশুপতি বুঝাইলেন—তিনি মেয়েকে গৃহত্যাগ করিতে বলেন নাই—আর অমিতেরা মঞ্জুকে সেই প্ররোচনা দিয়াও ভালো করে নাই। কত মঞ্জুর বয়স? প্রয়োজন হইলে পশুপতি পুলিশের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারেন অমিতদের বিরুদ্ধে ফর এনটাইসিং এওয়ে এ মাইনর্ গার্ল্।

এবার অমিত হাসিয়া কথা শেষ করিয়া দিল: তা হলে নেবেন তা। কিন্তু তার চেয়ে আপনার এম-এ পরীক্ষার্থিনী মাইনর গার্লটিকে সসম্মানে বাড়িতে রাখ্‌তে চেষ্টা করুন্। অবশ্য মেয়ের যদি সত্যই সম্মান বোধ থাকে তাহলে আপনার বাড়িতে সে থাকতে পারবে কিনা সন্দেহ।

কেন?—পশুপতি অমিতের স্পর্ধায় বিমূঢ় হইল।

সে উত্তর তাকেই জিজ্ঞাসা করবেন। স্ত্রীকে সম্মান করতে জানেন নি; কিন্তু মেয়েকে সম্মান করতে এখনো শিখুন।

ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন পশুপতি। ইতরের মত চীৎকার করিতে গেলেন, এত বড় স্পর্ধা তোমার, অমিত! ভেবেছ তোমাদের বজ্জাতি আমি জানি না—

অমিত উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, বাস্! থামুন মিষ্টার গাঙুলী। জানেন—আমি নামকাটা সেপাই—পুলিশকেও ভয় করি না। আমাকে সম্মান করতে

না চাইলে আমি তা আপনাকে শেখাতে পারব।—আর একটি কথা বলেছেন ত তা বুঝবেন।

আশ্চর্য সুফল ফলিল এই স্থূল রূঢ়তায়।

অমিতের মনে দ্বিধা ছিল—এই ত তাহার দেহ, এই ত তাহার বয়স,—কড়া কথা বলিতেও সে জানে না। এইরূপ একটা হুম্‌কিতে এই স্থূল স্বভাব লোকটা থামিবে ত! কিন্তু আশ্চর্য রকমের কাজ দিল তবু তাহার এক কালের জেল-খাটা খ্যাতি। মনে মনে একবার কৃতজ্ঞ হইয়া উঠিল অমিত তাহার সেই জেল-জীবনের দীর্ঘ বৎসর গুলির জন্য, নিতান্ত অর্থহীন 'স্বদেশী' নামটার জন্যও।

ক্রুদ্ধ পশুপতি এবার নিঃশব্দে চলিয়া গেলেন। অমিত বাঁচিল। এতদিনে তাহার চক্ষে সুর'র স্মৃতি যেন ক্লেদমুক্ত হইল।

তারপর সেই মঞ্জু অমিতের চোখের সামনে এখন ফুটিয়া উঠিল একেবারে গোয়েন্দা আপিসের এই প্রায়ান্ধকার ঘরে—'অমি' মামা।' আর বহু বৎসরের ওপারের সেই কিশোরী হাস্যমুখী স্নেহার্দ্র-হৃদয়া সুর'কে যেন অমিত দেখিতে পাইল। শুনিতে পাইল তাহার আত্মীয়তা-ভরা কণ্ঠস্বর 'অমি' দা'।···দেখিতে পাইল পঁচিশ বৎসরের একটা দ্রুত চলচ্চিত্র।···ঝড় বহিতেছে চারিদিকে তখন অমিতের—চিন্তার, আলোচনার, তর্কের,—আর নতুন সংকল্পের। মঞ্জুকে দেখিতেই পায় নাই অমিত। পাইলে হয়ত মঞ্জুর অপরিণত উৎসাহের বিরুদ্ধে অমিত তাহাকে সাবধান করিত। অন্তত যাচাই করিয়া দেখিত—চঞ্চলা উচ্ছ্বাস-প্রবণা বালিকা জানে কি কোথায় চলিয়াছে সে? কমিউনিজম আর এখন জওহর-জ্যাকেট ও জওহর-লালী বাক্য-বিলাস নয়। কিন্তু সে সময় হইল না। একেবারে এখানে দেখিতে হইল মঞ্জুকে অমিতের।

'মঞ্জু!' আর কথা সরিল না অমিতের মুখে। হাত ধরিয়া মঞ্জুর চোখের দিকে সে তাকাইয়া রহিল।—সে চোখ ছাপাইয়া আনন্দের কৌতুকের হাসি উপছাইয়া পড়িতেছে।···কিন্তু সে চোখের মধ্যে কি নাই সুর'র গভীর সুন্দর বেদনা-ভরা মিনতি—সেই ট্র্যাজেডিরও পুনরাভাস?

মঞ্জু, তুমিও এখানে!—বিস্ময় যেন শেষ হয় না। সত্য আছে কি এই বালিকার এই দুর্বার পথযাত্রায়? না, ইহা তাহার চাপল্য? তাহার মস্তিষ্কহীন উদ্দামতা?

আর আপনার আগেই—হাসিতে মাথা দোলাইয়া বলিল সেই বালিকা মঞ্জু। বালিকা?—'এম-এ পরীক্ষার্থিনী মাইনর গার্ল!'…

আমার আগে? কিন্তু তুমি এলে কেন?

ওরা ট্যাক্‌সি নিয়ে এসেছিল;—সকাল বেলার একটু হাওয়া খেতে এলাম।—হাসিতেছে দুষ্টু মেয়ে। মস্তিষ্কহীনা বালিকা।

চারিদিকে ঘিরিয়া ধরিতেছে সকলে অমিতকে। অমিত যে একেবারে জিনিসপত্র লইয়া আসিয়াছে। হাসিয়া অমিত বলিল, কিছুদিন শান্তিতে বসবাস করবার আশা রাখি। তোমরা কি খালি হাত পায়ে এসেছ নাকি? যাও তাহলে, বিদায় হও। আমি হাত পা ছড়িয়ে বসি একবার।

জন বিশেক ইতিমধ্যেই আসিয়া গিয়াছে। প্রত্যেককে দেখিয়াই অমিত বিস্মিত হইল। মেয়েরাও যে—মঞ্জু, সুজাতা, টুনু, আরও কে। ইহাদেরও এখানে দেখিবে, এই কথাটা যেন অমিতের মনে ইতিপূর্বে উদিত হয় নাই। মেয়েদেরও এখনি গ্রেপ্তার করা আরম্ভ করিল—এ স্পেক্টার ইজ্ হন্টিং ইণ্ডিয়া।

তুমিও যে, সুজাতা?

কি করব, অমি'দা'?

তোমাদের মেয়েদের ধরলে? মনে মনে ভাবিল অমিত—অনু—ও নিস্তার পাইবে না তাহা হইলে।

ওটাও আর আপনাদের একচেটিয়া রইল না, না?—বলিল কিন্তু সেই মঞ্জু।

অমিত তখনো আসন গ্রহণ করে নাই। মঞ্জুকে হাত দিয়া দূরে সরাইয়া দিয়া অমিত বলিল, না, আর বসা হল না। বলো মঞ্জু, তোমরা থাকবে, না, আমরা? এখনি চলে যাচ্ছি নইলে,—আর বসব না।

কোথায় যাচ্ছেন?

বাড়ি ফিরে।

হাসিয়া উঠিল সকলে।

মঞ্জু বলিল, জিনিসপত্র নিয়ে এসেছেন দুচার দিন থাকবেন বলে—

তখন কি জানি তোমাকেও ধরেছে ওরা ? না, এখনি এদের ডি-সিকে গিয়ে বলছি, 'এবার আমাদের পেন্‌শন দিয়ে দিন, আর কেন ?'

বলে দেখুন না।

অমিতও হাসিতেছে।—তোমাকেই যদি ধরে তাহলে আমি বণ্ড লিখে দিয়ে যাব। এই চ্যাংড়া ছেলে মেয়েদের পাল্লায় থাকব নাকি আমি ?—হাসিয়া উঠিল সকলে—কথার অপেক্ষাও কথা বলিবার ধরনে।

নিছক পরিহাস নয় তবু। অমিত যেন মঞ্জুকে এখানে,—এই ঘর, এই আবেষ্টন, মঞ্জুর সম্ভাব্য ভবিষ্যতের সঙ্গে মানাইয়া লইতে পারে নাই।—মঞ্জু নিতান্ত বালিকা। ছেলেমানুষ। সুর'র মেয়ে।

…হাঁ এম, এ পড়ে সে। বয়সও একুশ-বাইশ হইবে ? হইলই বা,—বালিকা সে এখনো—চোখে মুখে, কথায়, হাসিতে, অকারণ আনন্দে। এত ছেলেমানুষ সুরও ছিল না এই বয়সে।—এ বয়সে কেন, ইহারও পূর্বে। যখন সে সত্যই কিশোরী বালিকা হিসাবে আমাদের নিকটে কারণে অকারণে গল্প শুনিতে বসিত। তর্ক শুনিত আমাদের বন্ধুদের, নানা কথা শুনিত তখনকার দিনের,—বাবার সঙ্গে আমাদের, বাবার বন্ধুদের সঙ্গে আমাদের বন্ধুদের। শুনিত আমাদের কলেজের গল্প, অধ্যাপকদের গল্প, বন্ধুদের গল্প, শুনিত খেলার গল্প, পড়ার গল্প সাহিত্যের গল্প…তখনকার দিনের সেই সুর তথাপি এতটা বালিকা ছিল না। আরও অনেক কম ছিল তখন তাহার বয়স—এমনি ছিল তাহার চোখ, এমনি মুখ, এমনি কণ্ঠ।—কিন্তু তবু তাহার চোখে অমনি ছিল আরও একটু সংকোচ নম্রতা ; তাহার মুখে ছিল আরও একটু সরল ধীরতা, আরও একটু স্বচ্ছ সুস্থিরতা ছিল তাহার গতিতে, তাহার কণ্ঠস্বরে। না, সুর তখনো এত ছেলেমানুষ ছিল না—অথচ সত্যই সে তখনো বালিকা। কত ছিল তাহার বয়স ? হয়ত পনের বৎসর। পনের বৎসরের বেশি নয় নিশ্চয়ই। সকলেই তখন জানিত তাহার বিবাহের দেরী নাই। সুরও জানিত তাহার পিতৃগৃহের দায়িত্বমুক্ত জীবন আর

বেশি দিন নাই। তাহার পনের বৎসরের কণ্ঠে আর শোভা পায় না বালিকার উচ্চহাস্য, ব্যবহারে অকারণ চাঞ্চল্য, চোখে মুখে অমন ঔজ্জ্বল্য আর উচ্ছ্বাস। ছিঃ, সে যে বড় হইয়াছে। অশোভন তাহার বয়সে—পনের বৎসর বয়সে—বাঙলা দেশের মেয়ের পক্ষে অমন অকুণ্ঠিত উচ্চকিত হাসি, অবাধ মুক্তগতি, আচরণ—ইন্দ্রাণী বৌদির মত। তখনি সুর নিজের বয়সের ও স্বভাবের অপেক্ষাও নিজের সমাজের ও সংসারের প্রচলিত মতামত, বিধি-বিধানকে বেশি মানিয়া লইয়াছিল। মানিয়া লইয়াছিল চিরাগত সংস্কারের বশে তাহার ধরা-বাঁধা জীবনকে, ভাগ্যকে—আর তাই এদেশের সমস্ত নারী-জীবনের ট্রাজিডিকেও।··· তাই বিবাহের পরে সেও তেমনি গতানুগতিক নিয়মে জীবনানন্দের প্রথম আস্বাদনে, প্রণয়-শিহরিত প্রাণে পৃথিবীকে দুই চক্ষু ভরিয়া দেখিয়া খুশী হইয়া উঠিয়াছিল। মনে পড়ে সেই হাওড়া ষ্টেশনে দেখা সুর ও পশুপতিকে···ট্রেন ছাড়ার দেরী নাই, মালপত্রও কম নয়, চারিদিকে লোকজনের ছুটাছুটি। পিতৃগৃহ হইতে বিদায়ের ব্যথায় চোখ সজ'ল, তবু নতুন জীবনের স্বাদ, নতুন সৌভাগ্য সুরর চোখে মুখে উপচীয়মান। মিথ্যার মোহজাল ছেদ করিয়া ট্রাজিডি প্রকশিত হইয়া পড়িল বলিয়া, তবু তখনো তাহার কোনো চিহ্ন নাই সেই নববিবাহিতার চোখে-মুখে। অথচ ট্রাজিডি আসিল বলিয়া। সহজ ট্রাজিডিও নয়।

সংসারের দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ তুচ্ছতায় সে সুর' আহত হইত না। সুর' মধ্যবিত্ত সংসারের মেয়ে, সে জানে এমনি তুচ্ছতা লইয়াই চলে মেয়েদের সংসার। শ্বশুর গৃহের শাসন কঠিনতায়ও সে সুর' চমকিত হইত না। কোন বাঙালী মেয়ে আশৈশব এই গঞ্জনার জন্য প্রস্তুত না থাকে? প্রতিদিনের অজস্র ঝঞ্ঝাট, স্বামী পুত্র পরিজনের নির্ভুল নিরন্তর পরিচর্যায়ও সে-সুর' ক্লান্ত, কাতর হইত না। ইহা লইয়াইত তাহাদের নারী জীবনের গর্ব গৌরব, আনন্দ-উৎসব। ইহা দিয়াইত তাহাদের পরিচয়। সংসারের সাধারণ ট্রাজিডির ঘটনাজালে কোনোখানে তাই সুর ছটফট করবার কথা নয়। —তবু ছটফট করিল। আশ্চর্য যে, তবু ছটফট করিয়া মরিল সুর'।···

অনেক-অনেক দিন হইতে নিজেরই মধ্যে কি, আমি অমিত, জানিতাম না

এই হইবে, এই হইতেছে, এই পৃথিবীর সুর'দের জীবন বহু-বহু শতাব্দীর নিয়মেই এখানেই আসিয়া ঠেকিবে, মধ্য-যুগের এই সংসার-বিন্যাসের ইহাই অনিবার্য্য ফল···ইহাই অনিবার্য প:রণাম?

অমিত নিজেকেই আবার বলিল···হাঁ, ইহাই অনিবার্য ফল, এই ব্যবস্থা স্বীকার করিলেও—এ দেশের মেয়ের জীবন ট্রাজিডি। এ ব্যবস্থা অস্বীকার করিলেও তাহা ট্রাজিডি। সুর'র ট্রাজিডি বহুকালের বহুযুগের ট্রাজিডি; তাহা স্বীকৃতির ট্রাজিডি। আর বিদ্রোহের ট্রাজিডি—মধ্যযুগের দাসপ্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ট্রাজিডি—তাহাও কাল দেখিলাম,—বিদ্রোহের সে ট্রাজিডিই ইন্দ্রাণীর ট্রাজিডি!···অথচ মানবতীর্থের মহা-মাঙ্গলিকের বাণী আজ পৃথিবীর ধূলিতে-ধূলিতে অনুরণিত!—কিন্তু মঞ্জু? স্বীকৃতির, না, বিদ্রোহের ট্রাজিডি,—কোন্ জালে তোমাকে জড়াইয়া ধরিতেছে মঞ্জু?···চঞ্চলা বালিকা, তুমি কি যাইতে পারিবে আরও সম্মুখে—আরও দূরে—নবজীবনের তীর্থপথে? স্বীকৃতির শীর্ণপথে নয়, বিদ্রোহের অন্ধমার্গেও নয়, মানবতীর্থের সম্মিলিত অভিযানে?···

নূতন একদল বন্দী আসিয়া গেল। ডকের মজতুর এলেকা হইতে তাহাদের ধরিয়া আনিয়াছে। সকলে সে কাহিনী সাগ্রহে শুনিতে লাগিল। মঞ্জুও তাহার গ্রেপ্তারের বিবরণ বলিতে লাগিল অমিতকে সোল্লাসে।

পুলিশ শেষ রাত্রিতে আসিয়া হানা দেয়। 'ছাত্রী সমিতি'র আপিস ছিল সেই বাড়িতে। বাড়িটাতে কন্‌ফারেনসের সময় বিদেশী প্রতিনিধিরাও ছিলেন দুই একজন—নিজেদের বৈঠক আলোচনাও হইত। মঞ্জু খুশী মনে বলিতেছে: আপিসের কাগজপত্র নিয়ে পুলিশ অস্থির। এ-কাগজ নিয়ে ওরা দেখতে বসে ত, আমরা তখনি ও-কাগজ ফেলি জানালা দিয়ে বাইরে—যেন কত গোপনীয় কাগজ তা। পুলিশও ছুট্, ছুট্ বাইরে। ততক্ষণে ও-কাগজটাকে ফেলি ছিঁড়ে—যেন কত ভয়ংকর কথাই তাতে ছিল। 'হাঁ, হাঁ,' করে ছুটে আসে ওরা—'রাখুন, রাখুন, রাখুন।' তারপর শুনি, 'ছিঃ, ছিঃ, কি লজ্জার কথা! আপনারা লেডিজ্—একটা ভদ্রতা সম্ভ্রম আছে।

আপনারা এ রকম করলে চলে ?' সত্যই চলে না।—কিন্তু চলে না কার ? ওদের, না আমাদের ?

হাসিতে কৌতুকে মঞ্জু বারে বারে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে—পুলিশকে সে ভারি নাকাল করিয়াছে। অমিত হাস্যমুখে শুনিয়া যাইতেছে, দেখিতেছে তাহার চোখ মুখ অকুণ্ঠিত দেহের স্বচ্ছন্দ উচ্ছ্বাস।···কিন্তু কোন জালে তোমাকে জড়াইয়া ধরিয়াছে মঞ্জু ? বুদ্ধিহীন চপলতা ? না, দৃষ্টিহীন বিদ্রোহ ?—কোন্ জালে ?···কোন্ জালে ?···

অমিত বলিল: এই ভাবে পুলিশের জালে জড়িয়ে পড়লে, মঞ্জু ? কিন্তু তুমি রাত্রিতে নিজেদের বাড়িতে ছিলে না কেন ?

মঞ্জু এইবার বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাইল,—সরল, শান্ত সেই দৃষ্টি।

···পনের বছরের সুর'র দৃষ্টিই যেন···সুর'র দৃষ্টিও কি তবে এমনি চকিত চঞ্চল হইয়া উঠিত, যদি সে পাইত এখনি মুক্তালোকে বিচরণের স্বাধীনতা ?···

মঞ্জু তখন বলিয়া চলিয়াছে,—তুমিও জানো না নাকি, অমি' মামা ? ওঃ ! আমি ত ভাবতাম—তুমি জানো সব। কিন্তু তুমি দাঙ্গা আর দেশবিভাগ নিয়েই ক্ষেপে গিয়েছ। তোমাকে কি বলতে গিয়ে বাবা একেবারে গুম হয়ে বাড়ি ফিরে আসেন। কংগ্রেসের লোকদেরই উপর তখন বাবার ভরসা। তাঁর ভয় হয়েছে—কমিউনিষ্টরা তাঁকে মারবে। তুমি নাকি শাসিয়েছও মারবে বলে। তাই বাবা কংগ্রেসে নাম লিখিয়েছেন; চাঁদা দিচ্ছেন; ভুজঙ্গ সেনের সঙ্গে গিয়ে পরামর্শ করছেন;—কমিউনিষ্টদের শায়েস্তা করতে হলে তাদের ছাড়া আর কে আছে ? ও' পাড়ায় একটা 'জাতীয় রক্ষিদল' গঠিত হবে। বাবা তাতে টাকা দিতেও রাজী হয়েছেন।—আবার হাঁসিতে ফাটিয়া পড়ে মঞ্জু।

অমিত বুঝিল পশুপতি কাণ্ডজ্ঞান হারাইয়া ফেলিয়াছে।···

এরূপই কাণ্ডজ্ঞান হারাইয়া ফেলে ইহারা—কাণ্ডজ্ঞান থাকিবে কি করিয়া ইহাদের ? একটা স্বার্থবুদ্ধি ইহাদের আছে, তাহাকেই ইহারা বলে কাণ্ডজ্ঞান। আর আছে ভীতি। এ অভাগা দেশে আছে ভীতি,

রাষ্ট্রভয়, লোকভয়, শাস্ত্রভয়, 'ভূতের ভয়'…আর এখন ত এ স্পেক্‌টার ইজ্‌ হন্টিং দি ওয়ার্লড্‌। পশুপতির আর দোষ কি ?

সেদিনে পুলিশের নামে, গোয়েন্দার নামে, 'স্বদেশীর' নামেও এমনি কাণ্ডজ্ঞান সে হারাইত—সুর'র গঞ্জনার তাহাই ত কারণ। তাহাই কারণ ? না, তাহা উপলক্ষ ?—ইহাদের সমস্ত জীবনযাত্রাই মধ্যযুগের। আছে সেই সামন্ততন্ত্রী সংসার, মানুষ সেই জাঁতাকলে গুঁড়াইয়া যায়। তাহার সঙ্গে জুটিল সাম্রাজ্যতন্ত্রী যুগের এই কাঙালী বিদায়। আস্তাকুঁড়ের আগাছার মত তাই মাথা তুলিয়া উঠিতেছে এদেশে 'বড়বাবু', আর 'ছোট সাহেবে'র প্রেষ্টিজ্‌। ইহাই কলোনির কেরানী জীবন। সহজ সাধারণ বুদ্ধি, সহজ সাধারণ জীবনযাত্রা এখানে আসিবে কি করিয়া ? পশুপতির দোষ কি ? পুলিশ, 'কংগ্রেসী' ও 'স্বদেশী', এই তিনে আজ এক হইয়া গিয়াছে। পশুপতি বুদ্ধিমান্‌ লোক ; কে তাহাকে কাণ্ডজ্ঞানহীন বলে ? আমরা ? যাহাদের কাণ্ডজ্ঞানের প্রমাণ ত এই যে কিছু না করিয়াই লর্ড সিংহ রোডের এই ঘরে আসিয়া পৌছিলাম—আগামী দিনের মানব-মহাভিযানের প্রথম পাদেই—দেখিতে না-দেখিতে, অভিযানের পথে পা বাড়াইতে না-বাড়াইতে।

অমিত বলিল, কিন্তু মঞ্জু ? কেন তোমাকে নিয়ে এল ?—

অমিতের কানে গেল : আপিসে তল্লাসী যখন শেষ হল, আপিস তালাবন্ধ করবে, তখন বললে 'আপনাকেও একবার যেতে হবে। গাড়ী রয়েছে।'

তাই চলে এলে ?

হাঁ, ওরা বললে, 'আধঘণ্টার মধ্যে চলে আসবেন আবার।'

এবার হাসিয়া উঠিল অমিত। সেই অনাবশ্যক অভ্যস্ত মিথ্যা। বিশ বৎসর পূর্বেও যাহা, এখনও তাহা। অমিতের নিকটেও, মঞ্জুর নিকটেও—সমান প্রয়োজন।

আধঘণ্টার আর কতক্ষণ বাকী এখন, মঞ্জু ?

আধঘণ্টা কি ? একঘণ্টা হয়ে গিয়েছে।

তাহ'লে ফিরে যাওনি যে ?

কেন? থাকিই না—দেখে যাই আপনারা কে-কে এলেন। ততক্ষণ গল্প করি।

তা বেশ। চা-টা খেয়ে এসেছ? আর শাড়ী জামা নিয়ে এসেছ?

বাঃ! তা আনব কেন?

এসেছ যখন, গল্প করো—দু'চার দিন, দু'চার মাস, কিংবা দু'চার বৎসর থেকেই যাবে,—বিশেষত যখন নিরাপত্তা আইনটা সবে চালু হয়েছে।

সূর্যনাথ নিকটে আসিয়া বসিল। নিরাপত্তা আইন সম্বন্ধে সে বিশেষজ্ঞ। আইন পড়িয়াছে, প্র্যাকটিসও করিবে, কিংবা হইবে এটর্নি। সূর্য বলিল, তা ত কথা নয়। এ আইন চোরাবাজারীর জন্য, ডাক্তার ঘোষ নিজে বলেছেন। অবশ্য জানি চোরাবাজারীদের কখনো ধরা হবে না। চোরাবাজার যদি বন্ধ হয় তাহলে বড়বাজারও বিদ্রোহ করবে, লালবাজারও চটে লাল হবে, লালদীঘিও শুকিয়ে যাবে। তবু ওটা কংগ্রেস গবর্নমেণ্ট আমাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করবে না—এত শীগ্‌গির।

অমিত হাসিল, বিশ্বাসের জোর আছে দেখছি খুব। এখানে এনেছে কেন আপনাকে-আমাকে? ডাক্তার ঘোষের নির্বাচনে আমাদের না হলে চলত না এখন তাই বুঝি আমাদের নিমন্ত্রণ লর্ড সিংহ রোডে? ওঁরা মিষ্টিমুখ করাবেন?—কিন্তু খেয়ে এসেছেন কিছু? সঙ্গে এনেছেন কিছু কাপড়-চোপড়?

আই. বি. অফিসার জিনিষপত্র নিতে নিষেধ করলে, বললে, 'দু'ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসবেন।'

দু' ঘণ্টা? তাহলে আপনার ত টাইম এখনো হয়নি। মঞ্জুর অবশ্য টাইম হয়ে গিয়েছে, তার টাইম ছিল আধঘণ্টা। তবে সে একটু গল্প সল্প করবে, শীগ্‌গির ফিরে যায় কি করে? কতদিন গল্প করবে, মঞ্জু? কত বছর?

'বছর!'—বিস্ময়ের পরেই মুখে কঠিন হাসি!

সূর্যনাথ হাসিল, বলিল, আইনই ত মাত্র এক বৎসরের, অমিদা'।

কিন্তু কমিউনিজমের আয়ুও কি এদেশে এক বৎসর? তা যদি না হয় তাহলে আইনের আয়ু বাড়াতে বাধবে কেন?

কৌতূহল সত্ত্বেও সকলেরই মুখ একটু গম্ভীর হইল।—আপনার কি মনে হয়, অমি'দা', আমাদের আটকে রাখবে ওরকম?

নইলে এতগুলো লোককে এ সময়ে কি উদ্দেশ্যে মহামান্য পুলিস-মন্ত্রী নিমন্ত্রণ করেছেন এখানে—এই দোলপূর্ণিমার শেষ-রাত্রিতে? চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী পুরনো বন্ধুদের নিয়ে লাট প্রাসাদে বাঙালী কীর্তন শুনবেন বলে?

আলোচনাটা আগাইয়া চলিল। জমিয়াও উঠিল। অনেকে কাছাকাছি বসিয়া গেল। মঞ্জু ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে—শুনিতেছে সূর্যনাথের যুক্তি, বিজয়ের তর্ক, দিলীপের অর্থনৈতিক ভাষ্য। অমিত বসিয়া বসিয়া দেখিতে লাগিল মঞ্জুর একান্ত নিবিষ্ট মূর্তি, আগ্রহে ঝুঁকিয়া পড়া দেহের সেই সাবলীল ভঙ্গি, বিজয়ের চক্ষুর দিকে তাকাইয়া-থাকা তাহার চোখের সপ্রশংস চাহনি;—হাতের উপরে রাখা সেই সুশ্রী চিবুক, তরুণ সুন্দর মুখের কোমলতা, তাহার উপর চিন্তা ও কল্পনার আলোছায়ার খেলা, ক্ষণে ক্ষণে বুদ্ধি ও কৌতুকের বিদ্যুৎস্ফুরণ ··

সংসারের আঁচ লাগে নাই তাহার গায়ে, মুখে চোখে, মনেও। ও জানেও না তাহা, জানেও না কেমন করিয়া ওর মা সেই আঁচে জ্বলিয়া গিয়াছেন।··· মঞ্জু এখনো কেমন সুখী, এখনো বালিকা। পৃথিবীর কোনো কণ্টক-রেখা এখনো মঞ্জুর গায়ে লাগে নাই। এই দুঃসহ কালের কোনো তাপ এখনো ওর দেহে মনে ছাপ আঁকিতে পারে নাই—অথচ আঁকিবে নিশ্চয়, যেমন আঁকিয়াছে তাহা ইতিমধ্যে অনুর মুখে। ··

অনু বুদ্ধিমতী, আত্মসচেতনা বোন অমিতের। মাতৃহীন সংসারে সে কৈশোরে লইয়াছিল জরাগ্রস্ত পিতার দায়িত্ব,—দায়িত্ব গ্রহণে সে অভ্যস্তা। পিতৃহীন জীবনে সে-ই আবার অমিতের আশ্রয়, তাহাকে ঘিরিয়াই অমিতের নিজ জীবন। জীবন-সংগ্রামে অনু মূল্য দিতে জানে—দ্বন্দ্বলেশহীন চিত্তে। সে মূল্য দিবে বলিয়াই যে এই বিপ্লবের যুগে অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে বিপ্লবের পথে। বিদ্রোহিনীর মত আত্ম-দর্পে নয়, ব্যর্থতার তাড়নায় নয়, আসিয়াছে জীবনকে জানিয়া, বুঝিয়া। সেই অনুরও

কর্মব্যস্ত মুখে আসিয়াছে শীর্ণতা, চোখে তীব্রতা, কণ্ঠে ক্লান্তি-জনিত দুর্বলতা। শোধ গ্রহণ করিবেই ত দেহ,—এত পরিশ্রম, এত অবিশ্রান্ত ছুটাছুটি, এত রৌদ্রবৃষ্টির অতি-প্রাচুর্য —ইহার মূল্য দিতে হইবে না অমুকে? নিয়মিত কর্মের, নিয়মিত পরিশ্রমের, নিয়মিত জীবন-পদ্ধতির মধ্যে যে-দেহ যে-মন আপনার লালিত্যে, লাবণ্যে আপনাকে পোষণ করিতে পারিত, এই পথে—এই দুঃসাধ্য কর্মে, বিপ্লবের নানা মুখী স্রোতে—তাহার স্বস্তি, মনের দেহের স্বাস্থ্য দেখিতে না দেখিতে নিঃশেষ হইয়া যায়। অমুরও তাহা শেষ হইতেছে—মঞ্জুরও শেষ হইবে। মঞ্জুর এই স্বচ্ছন্দপালিত দেহের সৌকুমার্য কোথায় মিশাইয়া যাইবে! কর্ম-ব্যস্ততা—রৌদ্র, জল, বৃষ্টি, ছুটাছুটি, চেঁচামেচি এই কোমল মুখশ্রী হরণ করিবে; এই উজ্জ্বল ললাটে ক্রমে শ্রান্তি-ছায়া আঁকিয়া দিবে; তারপর উৎফুল্ল অধরের কোণে, চোখের তলে, মুখের উপরে অকালে কালো রেখা ফুটিয়া উঠিবে; আর এই ঝর্ণার মত উচ্ছল কলকণ্ঠ—পথে, সভায়, মিছিলে চেঁচাইয়া চেঁচাইয়া হইয়া উঠিবে তীব্র, কর্কশ, কঠিন।…এই পথে এই তোমার নিয়তি, মঞ্জু,—জানো কি তাহা? তোমার শীর্ণ মুখচ্ছবি, কর্ম ক্লান্ত দেহ, তোমার বিমলিন লাবণ্য তখন আর মানুষের দৃষ্টিকে এমন করিয়া বিমুগ্ধ করিবে না। নারী হইয়া, তরুণী হইয়া, কে সহ্য করিতে পারে পুরুষের দৃষ্টির সেই অবজ্ঞা? পারিবে তুমি মঞ্জু?…তন্বী তরুণী এখনো মঞ্জু। সে চলিয়া গেলে পৃথিবীর মানুষ তাহাকে আজ মুগ্ধ দৃষ্টি তুলিয়া দেখে; তাহার সমস্ত অঙ্গ দিয়া মঞ্জু তাহা জানে; অচেতন মন দিয়াও সে অনুভব করে সেই বিমুগ্ধ দৃষ্টির অভিষেক। অনুভব করে, এবং তৃপ্তি পায়। বিরক্তও হয় কখনো কখনো। কিন্তু পুলকিত হয়, তৃপ্তি পায়, তাহাতে ভুল নাই। তাহার এই দেহ-মন প্রাণ-লীলায় চঞ্চল, যৌবনের নতুন ঐশ্বর্যে উচ্ছ্বসিত, হিল্লোলিত।…সহ্য করিতে পারিবে কি তুমি, মঞ্জু, পুরুষ-চক্ষের অবজ্ঞা, বক্র হাস্য, তোমার রূপ-যৌবনের প্রতি উপহাস? না মঞ্জু, এই নিয়তি তুমি কল্পনাও করিতে পার না। তোমার অসহ্য তাহা। সুন্দর স্বপ্নময় দিনগুলি সবে তোমার জীবনে আসিতেছে—নতুন যৌবনের মাদকতাময়

এই দিনগুলি, তাহাতে ভাসিয়া চলিতেছিলে তুমি। স্নুর'র মত সংসারের কারাগারে তুমি ত নিষ্পিষ্ট হও নাই—দুর্যোগের দিনে হও নাই তেমনি স্থৈর্যে বুদ্ধিতে সংহত। অনেক সহজ, অনেক স্বচ্ছন্দ দিনরাত জুটিয়াছে তোমার জীবনে। ইস্কুলে, কলেজে, বন্ধুগোষ্ঠীতে, জনাকীর্ণ সভায়, পথের ভিড়ে তোমার স্বতোচ্ছুসিত জীবন পূর্বাপর আনন্দে অব্যাহত। দায়িত্বের কোনো ভার তোমার মনে ঠাঁই পাই নাই। না জানিয়া, না বুঝিয়া পথ চলিয়াছ; আর না জানিয়া, না বুঝিয়া পথের মিছিল হইতে এবার চলিয়া আসিয়াছ জেলখানার অন্ধগলিতে। কী সে অবরুদ্ধ বন্দিনী-জীবন—জানোই না, ভাবিতেও পার না।···প্রাচীরের মধ্যেও প্রাচীর, ফটকের ভিতরেও ফটক, জেনানা ফটকের অপ্রশস্ত আঙিনার অপরিচ্ছন্ন প্রকোষ্ঠ। দিনের পর দিন যায়, রাত্রি আসে, অন্ধ ঘরে অন্ধকার ঘনাইয়া উঠে। আবার দিন, আবার রাত্রি। আর কী সেই দিন, কী সেই রাত্রি। অথচ প্রতি দিনে বাড়িয়া যাইবে তোমার বয়স। বসিয়া বসিয়া সময় কাটে না, অথচ জীবন ফুরায়। যৌবন ম্লান হয়, প্রাণ মাথা ঠোকে। অবরুদ্ধ নিশ্চল দিনরাত্রি পাষাণের মত নিথর হইয়া ওঠে। ক্লান্তি পুঞ্জিত হইয়া ওঠে কখন চক্ষে, আর তার পরে বক্ষের তলায়। যৌবনের কামনা ও কল্পনা দেয়ালে দেয়ালে মাথা ঠুকিয়া ঠুকিয়া শেষে মেঝেয় লুটাইয়া পড়িবে ··তোমার কৌতুক চঞ্চল ঋজু দৃষ্টি ততক্ষণে খরধার হইয়া উঠিতেছে। তির্যক হইতেছে, বক্র হইতেছে, শাণিত ছুরিকার মত তাহা তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিতেছে; পৃথিবীকে টুকরা টুকরা করিতে চাহিবে তাহা ব্যর্থতার আক্রোশে। আর-কাহাকেও আঘাত করিতে না পারিলে, নিজেকেই শতবার শত স্থলে বিদ্ধ করিবে—রক্তাক্ত করিবে, ছিন্নভিন্ন করিবে।·· না মঞ্জু, এই নিয়তি তুমি ভাবিতেও পার না, কল্পনাও করো নাই।

মঞ্জু!—অমিত ডাকিল।

গল্পের মধ্যে চমক ভাঙিল মঞ্জুর। গল্প ছাড়িয়া সাগ্রহে অমিতের নিকটে আসিয়া সে বসিল।

কি, অমি' মামা?

তুমি এ পথে আসতে গেলে কেন, মঞ্জু?

হতবুদ্ধি হইয়া গেল মঞ্জু। সে কি এতই অযোগ্য অমিত মামার চক্ষে, অমিত মামার বিচারে?

বড় জড়িয়ে পড়লে যে .—অমিত বুঝাইয়া বলিতে গেল।

মঞ্জু প্রথম অবাক হইয়া তাকাইয়া রহিল, পরে হাসিয়া ফেলিয়া বলিল: ওঃ! তাই।

না, না, সত্যই ভাবা উচিত ছিল তোমার।

ভাবিনি, কি করে বুঝলে?—কিন্তু ভাববারই বা কি অত?

ভাববার নয়?—অমিত বুঝিল, সত্যই মঞ্জু এখনো গুরুত্ব বোঝে না তাহার কাজের।

মঞ্জু কিন্তু স্বচ্ছন্দে বলিল, না। তবে কেন এলাম এ-সবে শুন্‌বে?—তোমার জন্য।

আমার জন্য?—এরূপ আক্রমণের জন্য অমিতও প্রস্তুত ছিল না।

হাঁ। মা বরাবর বল্‌তেন দুটি কথা—'আমাদের মেয়েদের দিয়ে কিছু হবে না।' আর শুনতাম—তোমরা নাকি মস্ত বড় কাজ করছ। ঠিক করেছিলাম—মাকে দেখাব সে কাজ মেয়েরাও করতে পারে।...

অমিত যেন আবার শুনিতে পাইতেছে বিশ বৎসর পূর্বেকার খেদ 'আমরা ত দেশের কোনো কাজেই লাগলাম না।'—আর শুনিতে পাইতেছে কি বিশ বৎসর পরে উহার উত্তরও—'সে কাজ মেয়েরাও করতে পারে'?

মঞ্জু হাসিয়া বলিল, কি ভাব্‌ছ, আমি মামা? মায়ের দ্বিতীয় কথাটা শুন্‌বে না? শুন্‌বে? শোনো তবে। মা বল্‌তেন, 'বিয়ে যখন করবে, করবে তুমি। কিন্তু আমি তোমাকে কখনো বিয়ে করতে বলব না, মঞ্জু।'

চমকিয়া উঠিল এবার অমিত।

...না, না। সংসার ছলনা করিতে পারে না—সহজ মানুষকে, প্রাণবান মানুষকে ঠকাইতে পারে না পৃথিবী। এই ত একটা জীবনের অভিজ্ঞতা দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে সুর'র এক অতি-সহজ উক্তিতে। মাত্র এই একটি

কথার মধ্য দিয়া সুর' তাঁহার একমাত্র সন্তানের কাছে উৎসারিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছে তাহার প্রবঞ্চিত জীবনের সমস্ত বেদনা। সমস্ত মধ্যযুগের আদর্শের প্রতি,—পরিবারের প্রতি, পাতিব্রত্য ও গৃহধর্মের প্রতি—এই ত জীবন্ত ধিক্কার সুর'র,—এবং সুরর মত আরও অনেক জীবনের। ব্যর্থতায়-ভরা যুগে ব্যর্থতায়-ভরা ইহাদের পারিবারিক বন্ধন ও জীবন-যাত্রা।···

কথা বল্‌ছ না যে, অমিত মামা?

অমিত বলিল; আমি যে ও কথা মানি না, মঞ্জু।

সত্যি? তবে বিয়েটাকে অমন তোমরা বাঘের মত মনে করেছ কেন?

কে বল্‌লে আমি তা মনে করি?

করো না? ও! তা হলে পলিটিক্‌স্ করলে বিয়ে করতে নেই, বুঝি?

অমিত হাসিয়া ফেলিল। বলিল, একদিন তা'ই ছিল, মঞ্জু। কিন্তু আজ আর-এক দিন। লোকে বলে, আজ আমরা পলিটিক্‌সই করি বিয়ে করার জন্য।

কিন্তু, তোমার মত বিয়ে না পেলে?

মনের দুঃখে বনে চলে যাই—অর্থাৎ আসি জেলে। তাই ত এত বল্‌ছি—তুমি এখানে এলে কেন, মঞ্জু?

বিয়ে পাই নি বলে,—বলিয়া হাসিতে অমিতের সাম্‌নে প্রায় লুটাইয়া পড়ে মঞ্জু।

না, বড় ফাজিল, বেয়াড়া হইয়াছে সুর'র মেয়েটা! অমিত তথাপি রাগ করিতে পারিল না, হাসিল।

কিন্তু কোলাহল আবার বাড়িয়া গেল—কাহারা আসিল? সাংবাদিক বন্ধুরা বুঝি।

তিন

এই শেষ সংখ্যা সংবাদ পত্র :—সকলে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে তাহার উপর। কাগজের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী হইয়াছে। প্রেস-শুদ্ধ আপিস তালাবন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।—আর এই কাগজ বাহির হইবে না—জনতার প্রতিবাদ বন্ধ হইল।

তপনকে পাশে বসাইল অমিত। সে ইহাদের মধ্যে আসিল কোথা হইতে?

ফিলজফিতে এম, এ পড়িতে গিয়াছিল তপন। অধ্যাপকদের প্রিয় ছাত্র সে। নিজেও পণ্ডিত বংশের ছেলে—অধ্যাপক ব্রাহ্মণের বংশ। সেদিনও বাড়িতে ছিল চতুষ্পাঠী, পিতা পরিচালনা করিতেন। ছাত্র ছিল; অথচ ব্রহ্মোত্র সামান্য, বৃত্তি ও সাহায্য সামান্যতর, কি করিয়া চলিবে চতুষ্পাঠী? কিন্তু মহাপ্রভু নিকটের শ্রীপাট হইতে গঙ্গা পার হইয়াছিলেন। তখনকার দিনে এখানে তাঁহার কৃপালাভ করিয়াছিলেন এই বংশের পূর্বপুরুষ পণ্ডিত ও ভক্ত। তাহার পর হইতে অবিচ্ছিন্ন ধারায় সে ঐতিহ্য তাঁহারা বহিয়া চলিয়াছেন। দারিদ্র্যে অভাবে চতুষ্পাঠী এদিনে চলে না; তবু একেবারে তুলিয়া দিতে পারেন নাই গোলোক ভট্টাচার্য। আঁকড়াইয়া পড়িয়া ছিলেন। কিন্তু মনে মনে পরাজয়ও স্বীকার করিতেছিলেন—বাহিরে না হউক, গৃহে। তাই তপনকে ইংরাজি পড়িতে দেন—গৃহিণী যে কিছুতেই আর ছেলেকেও এই দারিদ্র্যভার গ্রহণ করিতে দিবেন না। তারপর ক্লাশে ক্লাশে পারিতোষিক ও বৃত্তিলাভ করিয়া চলিল তপন। খরধার বুদ্ধির সঙ্গে দীপ্ত অভিমান :—ইংরেজি বিদ্যা, পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান কোনো কিছুরই নিকট আত্মবিক্রয় করিবে না তপন। বিচার করিয়া বুঝিবে কোথায় কাহার শ্রেষ্ঠতা। পড়িতে গেল সায়েন্‌স্। ফিজিক্‌সে ফার্স্ট ক্লাস পাইয়া সে গবেষণায় লাগিল। জীন্‌স্, এডিংটনের বাক্-বৈদগ্ধ্যে তখন লেবরেটরির অধ্যাপকেরাও বিমুগ্ধ। তপনও পরিতৃপ্ত চিত্তে অগ্রসর হইয়া গেল গণিতের পথে। বিশ্ব ত একট

আঁকের সুবৃহৎ সমীকরণ। নিয়ম-নীতি, বিজ্ঞানের বিধি-বিধান সবই অনিশ্চিত, সবই রহস্য; চরাচর তাবৎ বস্তু শুধুই আপেক্ষিক। জানিয়া পরিতৃপ্ত হইলেও কিন্তু কেমন বাধা পাইল তপন এই সবে। এত ঘটা করিয়া এই কথাটা বলিবার মত কি আছে জীন্‌স্ ও এডিংটনের? যাহা তাঁহাদের বিবেচনায় গভীর চিন্তার ফল তাহা ত দর্শনের প্রায় প্রাথমিক পাঠের বিদ্যা। দর্শন পড়াই তবে প্রয়োজন। ভারতীয় দর্শন নয়, ইউরোপীয় দর্শনই পড়িতে হইবে তপনকে। পর বৎসরে বি, এ'র ছাড়পত্র লইয়া ফিলজফির ক্লাশে গিয়া উদিত হইল তপন।

বন্ধুরা বলিল, কি পাগলামোতে পেয়েছে তোমাকে? অমিতও তপনকে বুঝাইতে গেল। তপন উত্তরে বলিয়াছে, শীঘ্র গিয়েছেন কোনো দিন বিশ্ববিদ্যালয়ে? শত দুই সম্ভবত প্রোফেসর আমাদের। দেখেই বুঝা যায় দেশের অধ্যাপক সমাজের তাঁরা ইম্পীরিয়াল সার্ভিস। অন্য কলেজের অধ্যাপকদের তুলনায় খান ভালো, পরেন ভালো; এবং আরো বেশি ভালো কি করে খাবেন, কি করে আরো বেশি পরবেন তা ছাড়া অন্য চিন্তা নেই;—ইকোনোমিক ইণ্টার প্রিটাশেন অব্ ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি প্রোফেসারশিপ্ শুনবেন? পরীক্ষার দক্ষিণা ও পাঠ্য-পুস্তকের মুনাফা, এই দুই প্রকাণ্ড ইন্‌টেলেকচুয়াল প্রয়াসের ভিতর দিয়ে ক্লাশের পড়ানো কাজটা কোনো রকমে পার করে দিয়ে তাঁরা বসেন—কোষ্ঠীবিচারে, জমির দর হিসাবে; শেষে হিটলার-হিন্দু মহাসভার মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনে। দর্শনের অধ্যাপকদের কথা বলছেন? বিদ্যার অভাব নেই কারও। যাঁর বিদ্যার অভাব, তাঁরও অন্তত বুদ্ধির অভাব নেই। আর কী চমৎকার ইংরেজিতে অধিকার স্যর শর্বপল্লীর! ফার্ষ্ট ক্লাশ বক্তা, সেকেণ্ড ক্লাশ লেখক, থার্ড ক্লাশ অধ্যাপক, আর ফোর্থ ক্লাশ দার্শনিক। তাঁর প্রাঞ্জল ইংরেজি শুনবার জন্য নিশ্চয় টিকেট কিনেও তাঁর ক্লাশে বসা চলে। কিন্তু এক বৎসরের বেশি কত দিন তা শুনতে ভালো লাগবে? বিশেষ করে আমরা টোলে চতুষ্পাঠীতে মানুষ হয়েছি। চার শ বৎসর ধরে ভাগবত আর ষড়দর্শনের চর্চায় পুরুষানুক্রমে

আমাদের মগজ গঠিত হয়ে উঠেছে। বেশ বুঝতাম, ভারতীয় দর্শনের এ ব্যাখ্যা বিলাতে চলতে পারে, কিন্তু আমাদের কাছে তা ফাঁকা। গভীরও নয়, সত্যও নয়। আসলে এর উদ্দেশ্যও হচ্ছে—বিলাতের মনের মত করে আমাদের মনের কথাকে তুলে ধরা। তাতে অন্যায় কি, বল্‌ছেন ? অন্যায় এই যে—যাঁরা লিখেছিলেন, তাঁদের কথা এ ব্যাখ্যায় নেই; আমাদের মনের কথাও তাতে নেই। অন্যায় তাই এই যে, তা সত্যই গঙ্গার জল নয়, টালা ট্যাঙ্কের জল।

এ যুগের উপযোগী গঙ্গার জল ত তা'ই।

'এ যুগের উপযোগী' করে যদি সে যুগের দর্শনকে না নিলেই নয়, তা হলে সে যুগের দর্শনকে নিয়ে টানাটানি করা কেন ? এ যুগের দর্শনকেই বরং সরাসরি গ্রহণ করব ! আর আগামী যুগ আসতেই তা হলে এ যুগের দর্শনকেও বিদায় দোব। কারণ যুগটাই তা হলে বড় কথা।

কিন্তু কী এই যুগ ?—তপন যে তাহাই বুঝিতে পারে না।

পাণ্ডিত্যের ধূম্রজালে দশদিক সমাচ্ছন্ন করিয়া অধ্যাপক গুপ্তশাস্ত্রী ক্লাশের অধ্যাপনা শেষ করিয়া উঠিয়া যান। ছাত্ররা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে—কি শুনিল, কি বুঝিল তাহারা ? সত্য, অনেক কথা শুনিয়াছে। এবং আরও সত্য কথা প্রত্যেকে স্বীকার করে নিজেদের মধ্যে—কিছুই বোঝে নাই। বুঝাইয়া বলিতে জানেন না যে অধ্যাপক; তাঁহার বাক-বৈদগ্ধ নাই। পাণ্ডিত্যের মেঘ-মণ্ডিত শিখর হইতে তিনি নিচে নামিতে জানেন না। কিন্তু তপন বলে, শুধু শিখর কেন, ভিত্তিটাও মেঘ-মণ্ডিত—পাণ্ডিত্যের ধোঁয়ায়। পৃথিবীর মাটি-জলের কোনো বালাই নাই তাতে। একবার সেই কুয়াশার প্রাসাদ থেকে যেই পা দেন এযুগের কোনো তত্ত্ববিচারে, এ যুগের দর্শন বিশ্লেষণে, বিদ্যার বেলুন অমনি একেবারে ফাটিয়া যায়।

একজন অজ্ঞাত-পরিচয় সমাজবিজ্ঞানের ছাত্র গুপ্ত-শাস্ত্রীর 'আধুনিক জড়বাদের' প্রবন্ধটাকে তীক্ষ্ণ শরাঘাতে ফুটা করিয়া দিয়াছে সেবারকার শারদীয় সংখ্যার 'দেবালয়ে'। প'ড়িয়া গুপ্তশাস্ত্রী রাগিয়া খুন হইতেছেন। তপনও

ভাবে কেন এমন হয়? একটা সাধারণ বাস্তব সত্যের আলোচনায় কেন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের এত বড় অধ্যাপকেরা এমন হাস্যকর কাণ্ডজ্ঞানহীনতার পরিচয় দেন?

তপন দেখিতেছিল—এদেশের দর্শনের অর্থ আত্মতত্ত্বের অনুসন্ধান। সেই আত্মতত্ত্ব আশ্চর্য সরলতার সহিত জগৎকে বাতিল করিয়া লইত। আর জগৎ বাতিল হইল বলিয়া ধরিয়া লইয়া অতি নিষ্ঠার সহিত তারপর যুক্তি, বিচার, পাণ্ডিত্য ও মহদভিপ্রায়ের জাল রচনা করিত।—উহার সহিত জগতের কোন সম্পর্ক আছে কিনা, জীবনের অভিজ্ঞতায় সেই তত্ত্ব টিকল কিনা, এই প্রশ্ন তোলাও তাঁহাদের নিষ্প্রয়োজন। তাঁহাদের গৃহীত প্রতিজ্ঞার সূত্র ধরিয়া তাঁহারা যুক্তির পথে অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহাদের সীমাবদ্ধ জগৎ-দৃষ্টির মধ্যে প্রমাণ অনুমান আপ্তবচনের চকমকি ঠুকিয়া তাঁহারা চমৎকৃত হইয়াছিলেন। মধ্যযুগের পাশ্চাত্য দর্শনের মতই এই ভারতীয় দর্শনও ধর্মের দোহাই ও স্কোলাষ্টিসিজম্। কিন্তু জগৎ তাহাতে এই দেশেও মিথ্যা হয় নাই, ইয়ুরোপেও প্রতারিত হয় নাই। আজ বরং এই চার-পাঁচ শতাব্দীর বিজ্ঞান আসিয়া জগৎ ও জীবনের জটিলতর সত্যরূপ এই দেশের মানুষের চক্ষের সম্মুখেও তুলিয়া ধরিয়াছে। সেই শূন্যচারী ভারতীয় দর্শনের ভিত্তিই আর তাই টিঁকিয়া নাই। যে যুগ, যে জগৎ-বোধ অবলম্বন করিয়া এই সৌধ-নির্মাণ চলিয়াছিল, সে জগৎ-বোধই এই বিজ্ঞানের যুগে অচল। তাই যতক্ষণ এই প্রাচীনবাদী দার্শনিকেরা আপনাদের পুরাতন বনিয়াদ আশ্রয় করিয়া পুরাতন পরিধির মধ্যে বিচরণ করিতে পারেন, ততক্ষণই তাঁহারা পাণ্ডিত্যে পরিতৃপ্ত। যতক্ষণ বিজ্ঞানের তথ্য মানিয়া দর্শনের তত্ত্ব স্থির করিতে না হয়, ততক্ষণই ভারতীয় দর্শন অপরাজেয়। কিন্তু বিজ্ঞানকে না মানিয়া এ যুগে ভূত বা ভগবান কিছুই তৈয়ারী করা যায় না। তাহাই বুঝিতেছেন এডিংটন, জীনস্ ও অলিভার লজ।—আর তাই যখন বিজ্ঞান-নিষ্ঠ এযুগে দার্শনিক বিচারের ক্ষেত্রে ভারতীয় এই দার্শনিক-অধ্যাপকদের ডাক পড়ে তখন মহা-মহা-অধ্যাপকেরা একেবারে হতবুদ্ধি

দিশাহারা। 'আধুনিক জড়বাদের' কথা তুলিলেই এখন গুপ্তশাস্ত্রী মনে করেন, ছাত্ররা তাঁহাকে উপহাস করিতেছে। কিন্তু তপন তর্ক করে—যুগকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই, দর্শন শুধু আত্মচিন্তা নয়। দর্শন আজ বিজ্ঞানের ভিত্তিতে জগৎ-বিচার,—জীবন-দর্শন, জীবন-রচনা।

কোথায় এই যুগের সেই দর্শন ?—তপন খুঁজিতে থাকে।

টোলের অধ্যাপক পণ্ডিতদের কথা তপন বুঝিতে পারে। সে আপন পরিবারে তাহার পিতাকে দেখিয়াছে। অবশ্য উপায় নাই, তাঁহাকেও মানিতে হইতেছে নৈহাটি-ভাটপাড়ার কলকে, উহার মজুর ও সাহেবদের। তাঁহাদের অধ্যাপক-পাড়ার সীমানাতেই আজ জুয়ার আর মদের আড্ডা। ন্যায়ের তর্ক অপেক্ষা মাতাল মজুরের হল্লায় তাহা এখন মুখরিত।

ভাঙিয়া গিয়াছে তাঁহাদেরও অন্তরের বিশ্বাস। যাইবেই ত ? ভাসিয়া গিয়াছে কবে তাঁহাদের সেই যুগ, সেই জীবন-বিন্যাস, গৃহদেবতাকে কেন্দ্র করিয়া সেই গৃহ রচনা,—শান্ত সদাচার পূজা নিয়ম, সম্মানিত অনুগত লইয়া সেই সমাজ-পালন। রেল বসিল, তার আসিল, ডাক চলিল ; কল-কারখানার চাপে পল্লী-শ্রী পরিণত হইয়াছে ইন্‌ডষ্ট্রিয়াল এরিয়ার কুশ্রীতায়। মজুর, মালিক, মাড়োয়ারী, কাবুলী, আর সর্বোপরি ইংরেজ ছাঁকিয়া ধরিয়াছে শ্রীপাট খড়দহের নিকটস্থ এই পল্লিপ্রান্তকে। ইংরেজের চাকরি, ইংরেজের শিক্ষা, তাহার শাসন, তাহার আদর্শ—ইহার মধ্যে তাঁহাদের ভাটপাড়া-নবদ্বীপের সেই সমাজ আর কতটা টিঁকিয়া থাকিবে ? সেই গৃহ আর কি করিয়া রহিবে দৈন্যের মধ্যেও শ্রীময়, সম্মানিত ? গোলোক ভট্টাচার্য তপনকে ইংরেজি পড়িতে দিয়াছিলেন পত্নীর তাড়নায়। ভাস্করও পাশ করিয়া বিজ্ঞান পড়িতে চলিল। অংশুমানই বা কেন সংস্কৃত পড়িতে চাহিবে ? গোলোক ভট্টাচার্যই বা আর কি করিতে পারেন ? আত্মরক্ষায় যে সমাজ আপনাকে সাতশত বৎসর ধরিয়া গুটাইয়া লইতে শিক্ষা দিয়াছে, সে সমাজেরই অভ্যস্ত শিক্ষায় আরও আপনাকে সীমাবদ্ধ করিয়া লইতেছেন এবার তপনের পিতা। জীর্ণ গৃহের দৈন্যের মধ্যে তাঁহার শেষ আশ্রয় নিজের ব্যক্তিগত জীবনযাত্রা, আচরণ, কর্তব্যনিষ্ঠা,

আত্মমর্যাদাবোধ। লোভকে অস্বীকার করিবার সদাজাগ্রত চেষ্টা—তবু অস্বীকার করিতে পারেন কই ? তপনের আয়, তপনের উন্নতির দিকে তাঁহার সংসারের সকলে চাহিয়া আছে।—তিনিই কি নাই ? কিন্তু তবু তিনি অস্বীকারও করিতে চাহেন আবার।—না, বিলাতী বণিকের বেতন লইয়া না করিল তপন দাসত্ব। বেতন যদি লইতেই হয় অধ্যাপনাই তপন করুক। গোলোক ভট্টাচার্য বাঁচিয়া থাকিতে অন্তত তাঁহার পুত্রেরা যেন এইটুকু ঐতিহ্যও অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যাইতে পারে। তপন বোঝে তাহার পিতার আপনার সহিত আপনার এই আপোশ-রফা। বোঝে ইহার ভিতরকার দুর্বলতা; বোঝে ইহার ভিতরকার সত্যপ্রিয়তা; আর বোঝে ইহার পিছনকার করুণ বেদনাটুকুও। কিন্তু সে বুঝিতে পারে না,—ইংরেজি-জানা "ভারতীয় বিদ্যার" অধ্যাপকদের এই বাগাড়ম্বর, এই দম্ভ, আর এই প্রতারণা। জীবনে কোনো স্বার্থকেই, কোনো সুবিধাকেই ইহাঁরা ত্যাগ করিতে রাজী নন। ভারতের প্রাচীন আচার নিয়ম, কোনো কিছুতেই ইঁহাদের আস্থাও নাই। জগতকে তাঁহারা দশ জনের মতই মানেন, বেশ স্থূলভাবেই মানেন,—হয়ত বা দশ জনের অপেক্ষাও একটু বেশি করিয়াই স্থূলভাবে ভোগ করেন। কোনো উদ্বেগ আগ্রহও নাই জীবনে এই 'জড়বাদগ্রস্ত' সভ্যতার বিরুদ্ধে মুখামুখি দাঁড়াইয়া সংগ্রাম করিবার—কোন সত্যেরই সহিত মুখামুখি দাঁড়াইবার মত নাই সাহস বা সংকল্প। সত্য ইহাঁদের নিকট স্বার্থ। তথাপি ইহাঁরা অতি গম্ভীর কথায় ভারতীয় ত্যাগাদর্শের, তাহার দর্শনের পশরা সাজাইয়া বসেন। প্যারিস হইতে হনুলুলু পর্যন্ত অধ্যাত্মবাদের মুষ্টিযোগ ফেরি করিয়া ফিরেন; উদ্দেশ্য—সাহেবদের প্রশংসায় ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধার পথটিকে মসৃণ প্রশস্ত করিয়া তুলিতে হইবে।—'হাক্ষ্টারস্।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকমণ্ডলের সীমারেখায় ঘুরিতে ঘুরিতে তপন ক্ষেপিয়া উঠে। এমন স্থূলচরিত্র, বিনয়-বিবেক বর্জিত আত্মসন্তুষ্ট মানুষ বুঝি এ দেশের আই-সি-এস্‌রাও নয়। তাহাদেরও স্থূলতা এমনিতর; কিন্তু এমনিতর ঈর্ষা ওর লোভ বোধ হয় তাহাদের মধ্যেও নাই। 'হাক্ষ্টারস'!

অমিত শুনিয়া হাসিয়াছে।—অত রাগ করো কেন? অধ্যাপক বলেই কি তাঁদের অপরাধ? তাঁরা অন্যদের থেকে কেন স্বতন্ত্র হবেন? তাঁদের সহপাঠী, স্বজন, বন্ধু, স্বশ্রেণীর লোকদের জীবন, আদর্শ কেন, এই অধ্যাপক ব্যাচারীদের গ্রহণ করা চলবে না, বলো? তাঁরা অন্য কিছু না-পেয়ে ছাত্র-পড়ানোর ব্যবসা নিয়েছেন বলে?

ব্যবসা?

হ্যাঁ, অধ্যাপনাও ব্যবসাই। যুগটাই ব্যবসায়ীর। সাহিত্য, শিল্প, ধর্ম পর্যন্ত মার্কেট-নিয়মে চলে।

তপন অত না জানিলেও বোঝে, যুগকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই; তাহার পিতার মতই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি অধ্যাপক উহারই প্রমাণ।

কিন্তু কী এই যুগ যাহাকে অস্বীকার করা যায় না? কী সেই যুগ যাহা আবার আপনা হইতেই এইরূপে অস্বীকৃত হইয়া যাইতেছে? বিজ্ঞানের ছাত্র তপন স্থির করে—বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের আবিষ্কার, বৈজ্ঞানিক চেতনার প্রসারই উহার কারণ। হাঁ, এই যুগ বিজ্ঞানের যুগ,—ইহাই এই যুগের পরিচয়। কিন্তু তাহা হইলে এই যুগেই বা কেন এই পাশ্চাত্য জাতির বৈজ্ঞানিকদের মনে এমন সংশয় জাগিল? তাঁহারাই ত আজ চীৎকার করিতেছেন—'তফাৎ যাও, তফাৎ রহ, সব ঝুটা হ্যায়?' বৈজ্ঞানিকদল কেন রহস্যবাদী হইলেন? বস্তুবাদীরা অ-বাস্তবের সন্ধানী হইলেন?—বের্গস্ঁ প্রাণ-বিজ্ঞানকে প্রাণ-রহস্যের নামে যুক্তি-প্রবণতার বিরুদ্ধে দাঁড় করাইয়াছেন, তাহাতে তপন বিস্মিত হয় না। কারণ, বের্গস্ঁ আসলে বৈজ্ঞানিক নন। কিন্তু বার্ট্রাণ্ড র‍্যাসেলের সংশয়বাদ কেন হইয়া উঠিল বিজ্ঞানের প্রতি সংশয়বাদ? কেন হোয়াইটহেডের গাণিতিক মনীষা ক্রিয়া-চঞ্চল বহির্জগৎকে গ্রহণ করিতে গিয়াও ফিরিয়া আসিয়া আন্তরিন্দ্রিয়ের আশ্রয় লয়? এই বৈজ্ঞানিক যুগের মধ্যখানে কেন এত দ্বন্দ্ব, কেন এই সংশয়? 'যুগ-সন্ধিক্ষণ' আজ, এই কারণে কি? কিন্তু কোন্ যুগের সন্ধিক্ষণ তবে ইহা? বিজ্ঞানের যুগ ত সমুদিত হইয়াছে অনেকদিন, আজ চার শতাব্দী ধরিয়াই; আজ আবার কোন যুগের সন্ধিক্ষণ তবে?

অস্পষ্টভাবে এই সব চিন্তা যখন তপনকে অস্থির করিতেছে তখন অমিতের সঙ্গে পরিচয়টা তপনের ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিতে লাগিল। আলাপটা এখন জমিল বইএর দোকানে। ইতিহাসের ছাত্র অমিত। সে জানাইল, ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতেই তপনকে বুঝিতে হইবে ভারতীয় দর্শনের মূল্য ও বিজ্ঞানের কথা।

বিজ্ঞানই ত বাতিল করিয়া দিয়াছে, মধ্যযুগ আর প্রাচীনযুগকে—তপন বলে।

অমিত বলিল, 'বিজ্ঞান বাতিল করেছে' এ কথা অনেকটা সত্য। কিন্তু এই বিজ্ঞানই বা এল কোথা থেকে, তপন?

সেই উত্তর জানা আছে তপনের। সে বিজ্ঞানের ইতিহাস পড়িয়াছে। হাঁ, ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের গ্রন্থ না পড়ুক, অন্তত বিনয় সরকারের গ্রন্থ দেখিয়াছে। তাই জানে, ভারতবর্ষেও বস্তু বিজ্ঞানের একটা গোড়াপত্তন হইয়াছিল। জানে—মিশরে, ব্যাবিলনে, গ্রীসে, আরবে একদিন বিজ্ঞানের অনুশীলন হইয়াছিল। আরও জানে বিজ্ঞানের নব-অভ্যুদয় ব্রুনো-গ্যালিলিও বেকনের সঙ্গে, নিউটন হইতে। আসলে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্রিটেনেই বিজ্ঞানের প্রারম্ভ।

অমিত প্রশ্ন তুলিয়া দেয়—কিন্তু কেন অন্যসব দেশে, অন্য সব যুগে বিজ্ঞান জন্ম লইতে-লইতেই বারে বারে মরিল? আর কেন এই অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে ইংলণ্ডে তাহার মৃত্যুভয় কাটিয়া গেল? কেন তাহা ইংলণ্ড ছাড়াইয়া দেশে দেশে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে পারিল?

ইহার উত্তরে তপন জানিত পূর্ব পূর্ব যুগে মানুষ জন্মায় নাই,—অর্থাৎ প্রতিভাবান মানুষ জন্মায় নাই। তপনের ধারণা—জ্ঞান-বিজ্ঞান যেন আকাশের বিদ্যুৎ। প্রতিভার মত কনডাকটার না পাইলে পৃথিবীর মাটিতে নামিয়া আসিতে পারে না। নিউটনের মাথার মধ্য দিয়া অকস্মাৎ ঝিকিমিকি খাইয়া উঠিল সেই বিজ্ঞানের বিদ্যুৎ।

তপন এবার নূতন করিয়া শুনিল কথাগুলি: সমাজ-ব্যবস্থা বিজ্ঞানের জন্য তারস্বরে কেন দাবী করিতেছিল তখন, তাহা কি সে খুঁজিয়া দেখিবে? তপন কি দেখিবে—বিজ্ঞানের সাধনা কি? সোবিয়েত বিজ্ঞানের জয়যাত্রাই বা সুসম্ভব কেন?

অমিতের বইএর দোকান হইতে বের্নল-ক্রোথারের বই লইয়া সেদিন বাড়ি ফিরিল তপন। তখন যুদ্ধের প্রথম যুগ। বিজ্ঞান কলেজের চারিদিকে ধর্না দিতেছে যুদ্ধরত শাসকেরা: 'ধনং দেহি, খাদ্যং দেহি, অস্ত্রং দেহি, দ্বিষো জহি।' মানুষের মুখে মুখে বিজ্ঞানের আসুরিক বিভীষিকার কথা। একই লোকের মুখে জড়বিদ্যামূলক বিজ্ঞানের ব্যর্থতার প্রচার, আবার বৈজ্ঞানিকের সামাজিক কর্তব্যেরও অঙ্গীকার। কথার ও কাজের এই ধোঁয়ার জালের প্রতি তপনের যে উপেক্ষা ছিল উহার উর্ধ্বে উঠিতে-উঠিতেই এই সবের অর্থও যেন সে বুঝিতে পারিল।

দ্বন্দ্ব-বিক্ষুব্ধ এই যুগে বিজ্ঞান আজও সাবালকত্ব লাভ করে নাই। মুনাফার দাস আজও বিজ্ঞান।—চাই এই মুনাফার দ্বন্দ্বের পরিসমাপ্তি। ইহাই তবে 'যুগ-সন্ধি'—মুনাফার নাগপাশ হইতে বিজ্ঞানের মুক্তি?—আর মুক্তি সঙ্গে-সঙ্গে সংশয়মুক্ত চেতনার, ও দ্বিধা-সংকুচিত চিন্তার। মুক্তি মানুষের মনবুদ্ধিচেতনার, মানব আত্মার।

অমিত বলিল, তা'ই—তোমার চক্ষে আর বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে। কিন্তু শিল্পীরা সাহিত্যিকরা তাঁরা বলবেন কি?

তাঁদের বলবার কি আছে? দু'হাজার বছর ধরে চাঁদের সুধা, কোকিলের ডাক কিংবা প্রেমের কথা ইনিয়ে-বিনিয়ে তাঁরা বলছেন। বিজ্ঞান ত অনেকদিন ধরেই তাঁদের কাব্যের সে বনিয়াদ উপড়ে ফেলে দিয়েছে। আর কেন?

আমরা শুনতে চাই বলে, শুনতে চাইব বলে—

অর্থাৎ আপনারা বিজ্ঞানকে মানবেন না?—বিদ্রোহীর স্বরে জিজ্ঞাসা করে অমনি তপন।

ঠিক উল্টো। বিজ্ঞানই হবে তখন কাব্যেরও বনিয়াদ, যেমন দর্শনের আশ্রয় হচ্ছে তা এখনই।

তপন নীরব রহিল। কথাটা ভাল বুঝিল না। কিন্তু আপত্তি করিবার কিছু পাইল না ইহাতে। দ্বন্দ্বটাই এখন প্রশ্ন; এই দ্বন্দ্বের স্বরূপ কি?

শাণিত-বুদ্ধি তপনের সেই জিজ্ঞাসা-উন্মুখ মুখ চোখ অমিত ভুলিতে পারে নাই। অকুতোভয়ে তপন অগ্রসর হইয়া গেল যুক্তির বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়া। দ্বন্দ্বের মূলের যখন সন্ধান পাইল তখন একটা স্থির সীমানায় সে পৌছিয়াছে। এবার আরও আগাইয়া চলিল। যুক্তি দিয়া খণ্ডন করিতে লাগিল সংস্কারকে; ভাবনা দিয়া কাটিতে লাগিল ভাববাদকে; বুদ্ধি—নিছক বুদ্ধি দিয়া—মার্জিত করিতে লাগিল চেতনাকে। মনে মনে সে সুনিশ্চিত—বিজ্ঞানের দিক হইতে সে জগৎকে দেখিয়াছে হলডেনের, লেভির যুক্তি আর বিজ্ঞানের সাহায্যে; সে খুলিয়া ফেলিয়াছে আপনার অ-বৈজ্ঞানিক গ্রন্থিকে; তাহাকে আবার আটকাইবে কে? দর্শনের দিক হইতেও আর তাহাকে কেহ বিভ্রান্ত করিতে পারিবে না; এঙ্গেলসের লেনিনের বিচার বিশ্লেষণে সে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের তত্ত্বকে আয়ত্ত করিতে পারিয়াছে। আর তাহাকে কে বাধা দেয়? অমিত তাহার দৃপ্ত আত্মবিশ্বাসে আশ্বস্ত হইয়াছে, কৌতুকও বোধ করিয়াছে। সস্নেহে ভাবিয়াছে —ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বংশের ছেলেটা সত্যই ক্ষ্যাপাও। কিছু করানো যায় না তপনকে দিয়া—লেখাপড়া কিছু? জীবনে অমিত যাহা করে নাই তাহা অপরকে দিয়া করাইবার চেষ্টায় অমিত তখন অনেককেই লিখিবার উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়া বেড়ায়। বৈঠকে, আসরে, তর্কে তপনেরও এখন কুলাইল না। তপন কলম তুলিয়া লইল। সে কলমে যেমন ধার, তেমনি ক্ষিপ্রতা। আরও আগাইয়া চলিল তপন। দুর্ভিক্ষ মন্বন্তরের মানুষ বাঁচানোর চেষ্টায়ও আগাইয়া গেল অমিতের মত, তাহাদের সঙ্গে। আর আগাইয়া গেল অমিতদের পার্শ্বেই মজুতদারীর বিরুদ্ধে অভিযানে। মুনাফা-শিকার তাহার চোখের সম্মুখেই পরিণত হইয়াছে যে মানুষ শিকারে!

কলেজের চাকরিটা তখন একবার যাইতে যাইতে টিঁকিয়া গেল। টিঁকিল, কারণ যুদ্ধের দিন, বিজ্ঞানের অধ্যাপক পাওয়া দুর্ঘট। তাহা ছাড়া কর্তৃপক্ষের ধারণা কমিউনিজম্-এর স্বপক্ষে লেখা তখন সম্ভবত ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টেরই মনঃপুত। সরকারের সাহায্যও হয়ত পায় তপন। প্রিন্সিপাল নিজে ইহা বিশ্বাস না করিলেও কলেজের অন্যান্য অধ্যাপকদের, এমন কি ছাত্রদেরও, তাহা বিশ্বাস করিতে

বাধা হইল না। এদিকে এক-আধখানা ছোট বইও তপনের বাহির হইল অমিতের প্রকাশন আগ্রহে—ভারতীয় দর্শন, বিজ্ঞানের তথ্য ও প্রবন্ধ। ধারাল, তীক্ষ্ণ লিপিকুশলতার জন্য নাম হইল, যুদ্ধের বাজারে বিক্রয়ও হইল বেশ। আরও দুই একখানা বইএর পরিকল্পনা করিতেছিল তপন, এমন সময় তপন লেখা ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িল। আবার ক্ষেপিয়া গেল নাকি তপন?

অমিতকে সে বলিল: কোথায় আটকে যাচ্ছিল বার বার। মনে পড়ল শেষে আপনারই কথা প্রথম আলাপের দিনে—'In the beginning there was deed, চিন্তায় নয় কর্মেই জীবন।'

...'চিন্তায় নয়, কর্মেই জীবন'—অনেক দিন অমিতেরও মনে পড়ে নাই এই আবিষ্কার। অমিত চমকিত হইল। শুনিয়া মনে পড়িল অনেক কথা ...'চিন্তা নয় কর্মেই আমাদের জীবন।' জীবন-জিজ্ঞাসা যেদিন তাহাকে আকুলিত করিয়াছিল সেদিন জীবন-জিজ্ঞাসায় সেও উন্মাদ হইয়া উঠিয়াছিল। আপনাকে কিছুতেই শান্তি দেয় নাই, নিঃশ্বাসও সে ফেলিতে পারে নাই। পথ হইতে পথে, বই হইতে বইতে সে খুঁজিয়াছে উত্তর। ক্ষ্যাপার মত খুঁজিয়াছে—দুই হাত দিয়া কেবলই একটার পর একটা যবনিকা ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছেঃ 'আবিরাবির্ম এধি'। প্রকশিত হও, প্রকাশিত হও, হে সত্য, আমার নিকটে প্রকাশিত হও। তারপর অকস্মাৎ উন্মত্ত প্রার্থনা সার্থক হইল কর্মোন্মাদনায়। জীবন-জিজ্ঞাসা ঠেলিয়া লইয়া গেল অমিতকে পিপাসা-নিবৃত্তির দিকে—অকূল সমুদ্রের মধ্যে, মানব-মহাসমুদ্রের তীরে,—এ কালের মানব-সাধনার পরম সমারোহের ক্ষেত্রে। আর অমিত প্রাণ ভরিয়া—সমস্ত প্রাণ ভরিয়া বলিয়া উঠিল: 'শোনো, শোনো, অমৃতের পুত্ররা, তোমরা যাহার ধ্যান করিতেছ, তাহাকে আমি জানিয়াছি।—না, না, শুধু জানি নাই—আমি তাহাকে পাইয়াছি,—পাইয়াছি শত সহস্রের মধ্যখানে। সমবেত জীবনের স্রোতে, জীবনে জীবন ঢালিয়া।' আর সেদিন মহদুন্মাদনায়, পরম উত্তেজনায় অমিত বলিয়াছিল, 'না, না, চিন্তা নয়। চিন্তা নয়; Thought is at best repressed action.—কর্মেই জীবন,—কর্মেই-জীবন।' অনেকখানি সত্য ছিল অমিতের ঘোষণায়,—অনেক-খানি অসত্যও।

তবু সেদিন চিন্তাকে অস্বীকার করিবার দিকেই ছিল তাহার সমস্ত ইচ্ছাশক্তি।—বহুদিনের চিন্তাজ্বর-তপ্ত অমিত সেদিন চিন্তাকে অস্বীকার না করিলেই সুস্থ বোধ করিত না।

তেমনি মুহূর্ত আসিয়াছে কি এবার তপনেরও জীবনে? তেমনি ভয়ংকর মুহূর্ত যখন আত্মবিস্মৃত হইতে না পারিলেই মানুষ আত্মভ্রষ্ট হয়?...

ও কথাটা আমার নয়, তপন।—অমিত বলিল।

জানি। এঙ্গেলসের; কিংবা তারও পূর্বেকার কারও। হয়ত গ্যয়টের। কিন্তু কথাটা আমার কাছে পৌঁছেছিল আপনার মুখ থেকে। আর, কথাটা সত্য।

তুমি কি করবে, তপন?—জিজ্ঞাসা করিল তখন অমিত।

জানি না।

কিন্তু তপন দেখিয়াছে পথে পথে কমিউনিস্টদের ঠ্যাঙানো হইতেছে; মেয়েদের অপমান করা হইতেছে; মা বোনের নামও আর পবিত্র নয় বাঙালী কংগ্রেস-ভক্তদের নিকট। সে কমিউনিস্ট নয়, কিন্তু বৈজ্ঞানিক, মার্কসিষ্ট; ইহার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ রচনা করিতে হইবে। আর প্রতিরোধ রচনা করিবে কিরূপে—জনতার মধ্যে ছাড়া? অতএব—

কিছুটা মজদুর আন্দোলনের অভিজ্ঞতা থাকা দরকার,—বলে অমিত।—জিজ্ঞাসা করো আমাদের শ্রমিক কর্মীদের।

নির্বাচনের ঝড়ে গাল খাইয়া, ঢিল খাইয়া, শেষে মাথা কাটিয়া রক্তাক্ত দেহে ফিরিয়া আসিল তপন। সন্দেহ নাই কংগ্রেসের জয় হইবে,—ভোটের বাক্সগুলি কংগ্রেসী বাবুদের না ভাঙিলেও চলিত। তাই বলিয়া তপন নিবৃত্ত হইবে না। কিন্তু করিবেই বা কি এখন?

হিন্দু-মুসলমানের মহাযুদ্ধে ভাসিয়া দেশ তখন 'আগষ্টীয় স্বাধীনতার' দিকে চলিয়াছে। দাঙ্গার দিনে একমুহূর্ত অবকাশ নাই। কিন্তু দাঙ্গা থামিলেও তপনের ডাক পড়িল। অধ্যাপক ও বৈজ্ঞনিকেরা নিজেদের সমিতি গঠন করিতে চান। বিলাতে ঐরূপ সায়েন্টিফিক্ ওয়ার্কর্স এসোসিয়েশন আছে, ট্রেড্

ইউনিয়নের পদ্ধতিতে চলে, এখানেই বা তবে তাহা হইবে না কেন? তপনের মত বৈতালিক কর্মী ছাড়া কে করিবে ইহার প্রাথমিক কাজ? এবার মাতিয়া উঠিল তপন। বিজ্ঞানের মুক্তি-স্বপ্ন আর সুদূর নয়। এইত, বৈজ্ঞানিকেরাও আজ নিজেদের বিজ্ঞান সেবার স্থানেই সংঘবদ্ধ হইতেছেন—শ্রমিকের সংঘ-সংগঠনের পদ্ধতিতে। মহা উৎসাহ মহামহোপাধ্যায় ও মহোপাধ্যায় অধ্যাপকদের। তপন কলেজ হইতে ছুটী লইল। বিজ্ঞানের মুক্তির একটা সোপান এবার তাহারা অন্তত রচনা করিবে। তপন ছয় মাস ঘুরিয়া ঘুরিয়া, সমস্ত ভারতবর্ষ-ব্যাপী বৈজ্ঞানিকদের বুঝাইয়া পড়াইয়া, পত্র লিখিয়া যখন দিল্লীতে সমিতি গঠন করিতে গেল, তখন ওয়াভেলের মন্ত্রি-প্রধানেরাই হইয়া বসিলেন এই সমিতির ভাগ্যবিধাতা। আর সমিতির পরিচালনা ভার রহিল তাঁহাদেরই মনোনীত অধ্যাপক ও উপকর্তাদের হাতে। অবশ্য তপনও উহাতে আছে, থাকিবেও। সে কর্মী, উদ্যোগ, পরিশ্রম করিবে, সে ইয়ংম্যান। ছিট আছে তাহার মাথায়, কাজ সে করিবে। অবশ্য বেশি বিশ্বাস তাহাকে করা যায় না—কমিউনিষ্ট। কিন্তু আপাতত ইহাকে ছাড়া কাজ করিবার লোকই বা পাওয়া যায় কোথায়? হাঁ, কর্তৃপক্ষ সতর্ক দৃষ্টি রাখিবেন। কারণ, বিশ্বাস করা যায় না, তপন যখন কমিউনিস্ট্।

সমিতিটা কুক্ষিগত করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন ভাগ্যবান ও ভাগ্যান্বেষী বিজ্ঞানসেবীরা। দরিদ্র, হীনাবস্থ, মন্দভাগ্য বৈজ্ঞানিক কারিগর, মিস্ত্রি, কর্মীরা তপনকে তখন শুনাইয়া শুনাইয়া গজগজ্ করিতে করিতে জানাইয়া গেল, 'ডা'নের হাতে পুত্র সমর্পণ। যাঁরা বরাবর আমাদের আধ-পেটা রাখছেন সেই মন্ত্রী আর মালিকদেরই করলেন আমাদের এই সমিতিরও কর্ণধার।' সমিতি অবশ্য বাঁচিয়া রহিল। রাজতিলক পরিতেছে কংগ্রেস নেতারা; রাজছত্রের ছায়ায় তাই 'ভারতীয় বৈজ্ঞানিক কর্মী সমিতি' নিশ্চিন্ত আয়ু লাভ করিল। উহার খাতা রহিবে, দপ্তর রহিবে, বড় বড় "ডোনার" মিলিবে। না,—আর হৈ রৈ-এর কোনো বালাই নাই; দ্বিতীয় কোনো অনুরূপ সমিতি গড়িবারও উদ্যম বৈজ্ঞানিক কর্মীরা কেহ করিবে, এমন সম্ভাবনাও নাই। নিশ্চিন্ত হইলেন মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপকেরা,— মন্ত্রি-মুরুব্বিদের নেক-নজরে পড়িবার মত আরও-একটা সোপান তৈয়ারী

হইয়াছে তাঁহাদের জন্য। অধৈর্য হইবার কারণ কি ছোকরা বৈজ্ঞানিক কর্মীদের, আর যুদ্ধের বেকার যত কারু-কর্মীদের? "সায়েন্‌স্‌ তো চায় না এরা, চায় পলিটিক্‌স—এরা সব কমিউনিষ্ট।"

তপন বলিল, আর না। বিজ্ঞানের মুক্তির সোপান খুব তৈরী হয়ে গেল। বিশ্ববিদ্যালয়ের এড্‌ভানস্‌মেন্‌ট্‌ অব লার্নিং এর মুখ্য উদ্দেশ্য যেমন এ্যাডভানস-মেণ্ট অব আর্নিং,—ছাত্রদের পক্ষে কেরানিগিরি, অধ্যাপকদের পক্ষে পরীক্ষার কাগজ ও পাঠ্য-পুস্তক বিক্রয়;—এও তেমনি। বিজ্ঞানের অধ্যাপকদেরও এখন একটা ব্যবস্থা হল মন্ত্রি-মহারাজের ছত্রতলে। একটা রাজকীয় খেলাত—শাঁসাল দুইএকটা চাকরি, বিদেশে ডিপুটেশন, এখন কারো কারো ভাগ্যে জুটবেই। আর সে আশা যতক্ষণ আছে ততক্ষণ বিজ্ঞানের এ মুক্তি ও এ মুক্তি-সোপান এখানেই শেষ।

অমিত বলিল: তা হলে তুমি করবে কি?

এবার কমিউনিজম্‌। অর্থাৎ ছোটলোক মজুরই আমার ভালো—বাবু কর্মচারীরা থাকুন। থাকুক ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল্‌ ফ্রন্‌ট্‌।

কেন? কেমিক্যাল ইন্‌ডাষ্ট্রিজ্‌ ওয়ার্কস ফেডারেশ্যানে গড়ার চেষ্টা হচ্ছিল। তোমাকে এখনও চাইছিলেন ইষ্ট এশিয়ার কেমিষ্ট ছোক্‌রারা—

আর সেসবে নয়। বরং চটকলে। জন্মে অবধি দেখছি—এই চিমনির ধোঁয়া, কিন্তু জীবনে কারখানার ভেতরটা দেখিনি। জানিনা কি ই বা তাঁত-ঘর, কিই বা ফুডন, কিই বা কি?

সেই অধ্যাপক পণ্ডিতের পরিবার—অমিতও জানে, কত সন্তর্পণে ইহারা আপনাদের পবিত্রতা এই কল এলেকার মধ্যে রক্ষা করিয়াছে। অমিত তাই বলিল, আর এখন চট্‌ করে তা জেনে ফেলবে? বিশেষত চটকলের যে অবস্থা।

কিন্তু জানিতেই হইবে। মোতাহেরের সঙ্গে জুটিয়া গেল তপন। কিন্তু চটকল যেন অচল। বহু হরতালের মধ্য দিয়া উহার মজুরদের পরীক্ষা হইয়াছে; অর্থাৎ জ্ঞান হইয়াছে,—'বাবুরা সবাই চোর।' আর তপনই বা 'বাবু' ছাড়া কি? কিন্তু তবু যাতায়াতের, সাধ-সাধনার ফলে সাড়া মিলিল নিকটস্থ সূতা

কলে। সেখানে ইউনিয়নও গড়িয়া উঠিল। দুঃখ ও অভাব অসন্তোষ রূপ-গ্রহণ করিতে লাগিল ঐক্যে। কথা ফুটিল বাক্যহারা মানুষের মুখেও :—মাগ্‌গী ভাতা কমাইলে চলিবে না। কথায় কথায় জরিমানা, বাড়তি খাটুনি কেন? তাঁত-ঘর বন্ধ রাখিলেও তাহা মজুর সহ্য করিবে না।

সহ্য করিবে না? খুব কথা বলিতে শিখিয়াছে দেখি এই মাদ্রাজী মাগীটাও। দু' টাকার জন্য কাহারও অংকশায়িনী হইতে উহাদের আপত্তি হয়না—সে মাগীদেরও এত কথা। গলাধাক্কা দিয়া বাহির করিয়া দিবে—রুক্‌মিনী মারিয়াম্মাকে সেকেণ্ড ফোরম্যান চক্রবর্তী। চক্রবর্তী ছোকরা নয়, যথেষ্ট সে দেখিয়াছে; কাজও জানে। কিন্তু মেয়েমানুষ লইয়া ঘাঁটাঘাটি সে করে না। তাই মেয়েমানুষের ঢং, ভড়ং, মুখে মুখে কথাও কাজের সময় বরদাস্ত সে করে না। ওসব ফষ্টি-নষ্টি করুক্ তাহারা রায় বা সিং এর মত ফক্কর আর লক্করদের সঙ্গে। সে বি, বি, চক্রবর্তী—সেকেণ্ড সিনিয়ার ফোরমান। হি উইল্ ষ্ট্যাণ্ড নো নন্‌সেন্‌স্।

কিন্তু 'নন্‌সেন্‌স্' নয়, গোলমাল বাধিয়া গেল। কোথা হইতে রুখিয়া আসিল বিলাসপুরী মেয়েটা মংগলী। উঠিয়া মুখোমুখি হইয়া দাঁড়াইল—সেই বাঙালী মেয়েটীও—সাত চড়ে যার মুখে রা সরিতে দেখে নাই কেহ, বিলুর মা সেই পার্ব্বতী। আর কোথা হইতে তারপর ভিড় করিয়া আসিতে লাগিল মাদ্রাজী, ওড়িয়া, বাঙালী, হিন্দুস্থানী নানা জাতের পুরুষ! শেষে ইঞ্জিন ঘরের রশিদ, মামুদ পর্যন্ত। সকলে কাজ বন্ধ করিয়া দিল।

হরতাল! দেশলক্ষ্মী মিলে হরতাল!

দেশলক্ষ্মী মিলে হরতাল? দেশের একটা জাতীয় প্রতিষ্ঠান, বাঙালীর নিজস্ব কাপড়ের কল,—তাহাতে হরতাল!

কিন্তু ঝাঁপাইয়া পড়িল উহাতে তপন।

আকস্মিক উদ্দীপনা ও দুইদিনের সতেজ সংগ্রামের মধ্য দিয়া বাহির হইয়া আসিল বাঙালী রশিদ মিঞা আর হিন্দুস্থানী সুখারী, 'বিলাসপুরীয়া' মংগলী আর

বাঙালী পার্বতী। জান মহম্মদ সর্দার আর জাফর আলী বিক্ষুব্ধ হয়। লোক-গুলার স্পর্ধা বাড়িয়াছে। সর্দারকে বলা নাই, কওয়া নাই, হরতাল করিয়া বসে। জাফর আলী শেখ মুখ ফিরাইয়া লয়—সুখারীকে দেখিলে। হাঁ, বিহার মুলুকের মানুষ তাহারা দুই জনেই। তাঁতঘরের 'জাফর চাচাকে' না জিজ্ঞাসা করিয়া তবু বাহির হইয়া গেল সকলে? আর সুখারীই গেল তাহাদের আগে আগে? ইমান বলিয়া একটা জিনিস আছে। এই সুখারীকে কারখানায় ছোট ফোরম্যান সাহেবের ক্রোধ হইতে জাফর চাচাই সেবার বাঁচায় নাই কি? সকলকেই 'চাচা' আপনা ব্যাটার মত দেখে। সতের' বছরের কাজ তাহার। আগে ছিল মেটিয়া বুরুজের কেশোরাম মিলে। শেঠী সাহেব লইয়া আসেন তাহাকে 'দেস্‌লক্‌স্‌মীতে'। এই কলের প্রথম দিন হইতে এখানে আছে জাফর আলী। কী-না দেখিয়াছে সে এই কলের, কী না করিয়াছে? প্রথম দিনে ম্যানেজার সাহেব আসিয়া বলিলেন, 'কারখানা আপনাদের হাতে, শেখ সাহেব। আমরা সবাই মিলে এ কারখানা গড়ছি।' সেই জাফর আলী শেখ কি এখন পাইতেছে? বেইমান মালিক! এখন উনিশ বছরেও তাহার অভাব যায় নাই। কিন্তু তাহার তাঁতখানার মানুষেরা কেহ বলিতে পারিবে না 'চাচা' কাহাকেও সাহায্য করে নাই। ম্যানেজারকে সে বলিলে কবে জাফর শেখের কথা না রাখিয়া পারিয়াছে ম্যানেজার? কিন্তু এইবার জাফর চাচার সেই মাথা তাহারা হেঁট করিল। একটা বার জিজ্ঞাসা করিল না তাহার তাঁতঘরের লোকেরা তাহাকে; অমনি হরতাল করিয়া বাহির হইয়া গেল। আর কাহার কথায় করিল হরতাল?—এই একাউন্‌টের কেষ্ট মল্লিক, আর এই বাহিরের তপন ভটচাজ্জি বাবুর কথায়। এই সব 'বাবুদে'র চিনিতে দেরী আছে মজুরদের। কেন সুখারীরা হরতাল করিয়াছে? সেই মাদ্রাজী আওরাৎকে মারপিঠ করিয়াছে চক্রবর্তী? 'বুরা কাম।' কিন্তু কলের আবার আওরাৎ!—জাফর ঘৃণায় মুখ বাঁকায়—আধা-কসবি, আধা-জনোয়ার। 'বিলাসপুরীয়াকে' কি নতুন দেখিতেছে জাফর? কামারহাটির কলে ছিল এই মংগলী পাঁচ বৎসর। তখনো 'ছুকরি' ছিল। এখনো কপালের দাগ রহিয়াছে 'বিলাসপুরীয়ার'—

ওর মরদের মার। ফিরিঙ্গি সাহেবটার পেয়ারের হইয়াছিল তখন ছুকরি মংগলী; চোখে মানুষ দেখিত না সেই কলে। তারপরে লাগিল উহাদের সর্দারের সঙ্গেই, শাহাবাদের এলাহি বক্সের সঙ্গে। তারপরে 'বিলাসপুরীয়া' পলাইয়া আসে এপারের চটকলে। সেখান হইতে আবার এই পাঞ্জাবী গেন্দা সিং এর সঙ্গে জুটিয়া এখন দেশলক্ষ্মীর সুতাকলে আসিয়াছে। ইতিমধ্যেই এখানে মংগলী কত জনের সঙ্গে কত কাণ্ড করিয়াছে তাহার ঠিক নাই। হাঁ, হাঁ, বাঙালী আউরাৎকে দেখিয়াছে জাফর আলী ;—ওই পার্বতী। বাঙালী আউরাৎ—ভালো হইলে কলে আসে কভি বাঙালী জেনানা? হুঁ, আসিতেছে আজ কাল? আকাল দেশে পড়িয়াছে, জানে জাফর আলী। কিন্তু জানে—আসেও তেমনি আউরাৎই। আসিবে এই মথুরার বউ? হাঁ, গ্রামের বাড়ি বাড়ি যায়, ঘরে দুয়ারে কাজ করে, ধান ভাঙে, আপনা পেট গুজরায়—তব্‌ভি কলে আসিবে না। ইজ্জত থাকিলে বাঙালী আউরাৎ কলে মজদুরণী হইবে না। আর এই মাগীদের কথায় নাকি এখন মামুদ, রশিদের সঙ্গে মিলিয়া সুখারী এই কারখানায় গোল পাকাইতেছে—'চাচাকে' একবার 'পুছলও' না।

তথাপি তৃতীয় দিনে হরতালের জয় হইল। তখন সেকেণ্ড ফোরম্যান নাই। তাহার পদচ্যুতি হইয়াছে কিংবা ছুটি মিলিয়াছে। কিন্তু সর্দার, দরওয়ান, ফোরম্যান, কাহারও নিকটে আর মাথা নিচু করে না—পনের শত এই খড়দ' পেনেটির দেশলক্ষ্মী কাপড়ের কলের মজুরেরা—মেয়ে বা পুরুষ। ইউনিয়ন জাঁকিয়া উঠিল। সভ্য হইবার জন্য আফিসে ভিড় লাগিয়া গেল। শিফ্‌ট শেষ হইতে না হইতে সভ্যের ফরম্‌-এ টান্‌ পড়িয়া যায়। চাঁদায় ইউনিয়ন ফণ্ড ভরিয়া উঠে।

লাল ঝাণ্ডা উড়াইয়া ফ্যাক্টরিরই সামনে একটা চা'লের দোকানে দোতলা টিনের ঘর ভাড়া লইয়া বসে ইউনিয়ন আপিস। সেখানে নির্ভয়ে আসিয়া কাজের শেষে মজুরেরা জটলা করে। দাবি-দাওয়ার কথাই আলোচনা করে, কারখানার সমস্ত অন্যায়ের হিসাব লইয়া বসে, কল্পনা করে আগামী দিনের হরতালের—একাউণ্টের মল্লিক বাবু আর ইউনিয়নের তপনের সঙ্গে। মজুরেরা কারখানায়

যখন যায়, যায় তাহারা বিজয়ীর মত। কারখানাটা যেন আর ম্যানেজার ও মালিকের নয়। চালাইতে পারে নাকি তাহারা কল এক রোজও? সে ত দেখাই গেল। মজুরেরাই কল চালায়, উহাদেরই জিনিস কারখানা। কল উহাদেরই জিনিস যখন, উহাদেরই বাঁচিবার দাবিও মানিয়া লইতে হইবে প্রথম তখন;—মালিকদের লুঠ ও খুন-শোষণ আর আগেকার মত চলিবে না।

সত্যই সুখারী আর রশিদ মিঞা, মংগলী আর পার্বতী একটা তোলপাড় বাধাইয়া দিয়াছে দেশলক্ষ্মী মিলে। কেষ্ট মল্লিককে হাত করিবার চেষ্টায় লাগিলেন ম্যানেজারেরা। অনেকখানি বেতন বৃদ্ধি আর প্রমোশনের প্রলোভন: মল্লিকের নিকট উহা তুচ্ছ করিবার মত জিনিসও নয়। মধ্যবিত্ত চাকরোর সংসারে অভাব অনটনের অন্তত অভাব নাই। কিন্তু তাহা শেষও হইবে না কিছুতে, তাহাও জানে কেষ্ট মল্লিক। ছোট বোনের বিবাহ দুই দশ টাকা বেতন বাড়িলেও সম্ভব হইবে না। পিতার চোখের দৃষ্টিও তাহাতে ফিরিয়া আসিবে না। কেষ্ট মল্লিককে ম্যানেজাররা পক্ষে পাইলেন না। তপনকেও পাওয়া গেল না—না কলেজের মারফতে, না তাহার আপন আত্মীয়দের মারফতে। তাহাকে পাইবার কথাও নয়, লোকটা ক্ষ্যাপা। তাহা ছাড়া পাকা কমিউনিস্ট। এ দেশের কমিউনিস্ট অর্থাৎ ছিল ইংরেজের পুষ্যি পুত্র। তাই উহাকে এই অঞ্চল হইতে সরাইতে হইবে; এখানে ঢুকিলেই মার দিতে হইবে। অবশ্য একটু দেরী করা প্রয়োজন। সুখারী আর রশিদ আলিও যে এত পাজি হইবে তাহা ম্যানেজার সাহেব বুঝিতে পারেন নাই। তিনি বিলাতে টেক্স্‌টাইল ইনজিনীয়ারিং শিখিয়াছেন; ট্রেড ইউনিয়ন ম্যুভমেণ্টের পক্ষপাতী। মনে মনে তিনি নিজেই ত সোশ্যালিস্ট। আর '৪২-এও জহরপ্রসাদ তাঁহার বাড়িতে দুই দিন ছিলেন। অর্থাৎ থাকিবার কথা ছিল।—কিন্তু সুখারী রশিদের কাণ্ডটা ভাখো? ব্যাটাদের ভারী গুমোর হইয়াছে,—"নেতা" হইতে চায় নিশ্চয়। সেরূপ ব্যবস্থাই করিতে হইবে জান্নু সর্দার আর জাফর মিঞাকে দিয়া। কিন্তু তাহাতেও আবার একটু দেরী করিতে হইবে, তারপর ব্যবস্থা। শেষ পর্যন্ত না হয় জবাব দিতে হইবে দুই-একজনকে; একটা

গোলমাল বাধিয়া উঠিবে তাহাতে। সেই সম্পর্কেও তাই আগেই ব্যবস্থা করা চাই,—সেইরূপ কথাও হইয়াছে মন্ত্রীদের সঙ্গে। তাঁহারা চান—মিলের মধ্যে কংগ্রেস মজদুর সংঘের ঢুকিবার মত যত সুবিধা করিয়া দিতে হইবে। না, সোশ্যালিস্ট মজদুর সভা-টভা মন্ত্রীরা পসন্দ করেন না; উহাতে কাজ হইবে না। নিকটেই একটা ভালো ঘর ভাড়া লইয়া কংগ্রেস মজদুর সংঘের আফিস খুলিয়া দিবেন মিলের মালিকেরা। ম্যানেজার, দরওয়ান, সর্দার, সবাই উহার সভ্য হইবে; পুলিশ ত আছেই। মজদুর সংঘের লোকেরা এখানে বসিতে আরম্ভ করিবে।

একটু দেরী করিতে হইবে তথাপি এই সবে···

একটু দেরী করিতে হইবে, একটু দেরী করিতে হইবে।···যাহাই করিতে চাহেন ম্যানেজার সাহেব—'একটু দেরী করিতে হইবে।' কিন্তু দেরী করিবার মত সময় যে নাই। প্রতিদিন সভা, প্রতিদিন মিছিল, নতুন নতুন দাবি—'রেশন কাটা চলবে না,' 'খুন-চোষা চলবে না'—চারিদিক যে গরম। কলের মেয়েগুলি পর্যন্ত আর ভয় করে না কর্তাদের।

সাত চড়ে কথা সরিত না মুখে সেই মেয়েটার—পার্বতী। বাঙালী মেয়ে। দরিদ্র হইলেও ভদ্রঘরেরই মেয়ে। ভালো কায়স্থ তাহারা। ভাই চাকরী করিত বেলুড়ের এলুমিনিয়ম কারখানায়। আকালের দিনে পার্বতী পূর্ব বাঙলার বাড়ি ছাড়িয়া আসে। স্বামী রুগ্ন, দেশে খাতা লিখিত কোনো মহাজনের ঘরে। অভাবে ও অসুখে চলচ্ছক্তিহীন, বাতে অচল। ছেলে ও মেয়ে লইয়া পার্বতী প্রথম আসিয়াছিল বেলুড়ে ভাইয়ের নিকটে। কোনো ভদ্রলোকের সংসারে গৃহকর্ম পাইবে না কি? কিন্তু তখন চা'লের মন চল্লিশ টাকা; 'রেশনের'ও ব্যবস্থা হয় নাই। ইচ্ছা থাকিলেও অবস্থাপন্ন ভদ্রলোকের আর খাওয়া-পরা দিয়া ঝি-দাই রাখিবার সাহস বিশেষ নাই। তাহার উপরে যাহার দুইটি ছেলেমেয়ে আছে, তাহাকে কে গৃহে স্থান দিবার কথা একালে ভাবিতে পারে? ভাইএর চেনায় ও চেষ্টায় পার্বতী আসিল 'দেশলক্ষ্মী মিলে' কাজ লইয়া। ভয়ের অন্ত ছিল না। কিন্তু আর উপায়ও নাই। দেশে স্বামী আছে কি নাই, জানে না। কিন্তু

এখানে ছেলেমেয়েদের আর বেশি দিন বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই, তাহা বোঝে। দাদা ভরসা দিলেন, 'দেশলক্ষ্মী মিলে মল্লিক আছে।' সে দাদার পরিচিত, তাঁহার শ্বশুর বাড়ির দেশের লোক, একটু জানাশুনাও ছিল গ্রামে। 'স্বদেশী' করিত মল্লিক এক সময়ে। তারপর এখন কি হইবে সেই মল্লিক, তাহা কে জানে? কিন্তু আপাতত পার্বতী দেখিল কারখানায় রেশন দেয়; নিজে ও ছেলেমেয়ে তাহাতে বাঁচিবে; এমন কি দুই এক টাকা স্বামীকেও পাঠানো সম্ভব হইতে পারে। পরে অদৃষ্টে যাহা আছে তাহা হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া এখন বাঁচিবার চেষ্টাও করিবে না সে? অন্তত যাহাই থাকুক পার্বতীর অদৃষ্টে, ছেলেমেয়েদের সে না খাইয়া মরিতে দিবে কি করিয়া?

না, পার্বতী কিছুতেই ভয় পাইবে না। যে করিয়াই হউক বাঁচিবে, ছেলেমেয়েদের বাঁচাইবে। যত অপমান থাকুক কলের কাজে, যত ভয় থাকুক ইজ্জতের, সে নিজে যদি যদি ভালো থাকে, কাহাকে তাহার ভয়?

পার্বতী নিজে বাঁচিয়াছে, ছেলেমেয়েদের বাঁচাইয়াছে, স্বামীকেও এখন দেশ হইতে আনাইয়াছে। কারখানারই লেবর কোয়ার্টার্সে তাহাদের স্থান করিয়া দিয়াছেন ম্যানেজার সাহেব নিজে। হাজার হোক, বাঙালী তিনি; বাঙালী মেয়ে-মজুরের জন্য একটু 'সিম্প্যাথি' না রাখিলে চলিবে কেন? তাহা ছাড়া মেয়েটি মুখে রা কাড়ে না, কাজেও নিয়মিত আসে। স্বভাব চরিত্রও নাকি ভালোই,—মানে, যতটা ভালো হইতে পারে কারখানায় কাজ-করা এই সব মেয়ের। কতই বা ভালো হইবে? কি করিয়াই বা কেহ ভালো থাকিতে পারে? যে সংসর্গ!—একদিকে এই সর্দার, বাবু, ফোরম্যান মিস্ত্রিগুলির প্রলোভন উপদ্রব, অন্যদিকে ওই মাদ্রাজী, বিলাসপুরী প্রভৃতি মেয়েগুলির সঙ্গে এক সঙ্গে কাজ করা: ইহার মধ্যে ভালো থাকিতে চাহিলেই বা ভালো থাকিতে পারিবে কেন কেহ? কোনো দেশেই থাকে না,—বিলাতেই কি থাকে? নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা মনে পড়ে ম্যানেজার সাহেবের। তাহা ছাড়া পার্বতীর বয়সও এমন কিছু নয়। শরীর দুঃখে তাপে বেদনায় ক্লান্ত, ম্লান হইলেও ভাঙিয়া পড়ে নাই। অবশ্য তাহার ছেলে-পিলে আছে; ঘরে একটা স্বামীও

আছে—যদিও পক্ষাঘাতগ্রস্ত, আর নিজেও দেখিতে পার্বতী ময়লা। যাহা হউক, ম্যানেজার সাহেব বোঝেন—পার্বতী কিছুটা বুঝিয়া-শুঝিয়া চলিলেই যথেষ্ট।

সেই পার্বতী ম্যানেজারের ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল। কথা এখনও বেশি বলিল না। কিন্তু যাহা বলিল, বলিল স্পষ্ট—গুছাইয়া। কেহ লিখাইয়া-পড়াইয়া তৈয়ারী করিয়া দিলেও ম্যানেজার অবাক হইতেন। কিন্তু সেরূপ সুযোগও পাইবার কথা নয়। একেবারে কাজ হইতে হঠাৎ ডাকাইয়াছেন তিনি পার্বতীকে। মেয়েটা কিছুতেই মানিবে না—তাহার ভাগ্য ভালো। সে মরিতে বসিয়াছিল, এখন ছেলে-পিলে স্বামী লইয়া খাইয়া পরিয়া আছে; এই সত্যটা যেন একটা সামান্য কথা। উল্টা বলিতে চাহে, পরিশ্রম ও গঞ্জনার মূল্যে যাহা পাইবার তাহাই সে পাইয়াছে। তাহার স্বামীর চিকিৎসা হয় না; দুইজনে রেশনের চালে আধা পেটা খায়; ছেলেমেয়ে দুটিকে খাওয়াইতে হয়; বিলুকে পাঠশালায় পাঠাইবার পয়সা নাই; নিজের অসুখ বিসুখ থাক, ছেলেটার জ্বর হইলেও একবেলা কামাই করিবার তাহার জো নাই। অথচ কাজ কি কারখানায় এই কয়বৎসর কম হইয়াছে? যুদ্ধের সময়ে ত মালিকেরা পাঁচগুণ মুনাফা লুটিয়াছে। পার্বতী অবশ্য সব হিসাব জানে না; কিন্তু যাহারা জানে তাহাদের নিকট হইতে শুনিতে পায়। তাহা ছাড়া নিজের চক্ষে দেখিতেও পায়—কি ছিল তখন কারখানা, চোখের উপর বাড়িয়া তাহা কি হইয়াছে এখন।

কেউ ত জোর করে তোমাকে এ মজুরীতে খাটতে বলে না। তোমরা নিজের ইচ্ছায় কাজ নিয়েছ। এখানে কাজ না পেলে তখন কি হত, মনে পড়ে?

মরতাম!

তবে?—বিজয়ীর মত ম্যানেজার সাহেব প্রশ্ন করিলেন।

হয় না খেয়ে শুকিয়ে মরো,—নয় খেটে মুখে রক্ত উঠে মরো,—মোটের উপর মরতেই হবে। এর মধ্যে তা হলে আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কি আছে?…

ইউনিয়ন আপিসে কথাটা শুনিতে শুনিতে সেদিন সন্ধ্যায় তপন প্রায় লাফাইয়া উঠিয়াছিল। 'ফ্রিডম্ টু ষ্টার্ভ্ অব্ দী স্লেভ্':—এমন পরিষ্কার রূপে কি করিয়া বুঝিল এই অশিক্ষিতা বাঙালী মজুর-মেয়ে বুর্জোয়া ফ্রিড্মের এই স্বরূপকে? আপনার অভিজ্ঞতা হইতে? তপনের উৎসাহদীপ্ত সেই মুখ অমিতের মনে আছে! তপন অতি উৎসাহী; হয়ত পার্বতীর কথাও বাড়াইয়াই বলিতেছে।

বেশ সেই বিলাসপুরীয়া মংগলীর? তার কথা ত সবাই জানে।

ম্যানেজার তাহাকে ডাকিয়া পাঠায় নাই। 'পাঠাত'—মংগলী বলিয়াছে,—'একবার দেখে নিতাম।' কতকটা তাচ্ছিল্য, কতকটা ক্ষোভে মিশাইয়া সে এমনি ভাবে কথাটা বলিল যেন তাহা হইলে একটা মজাদার ব্যাপার হইত। সে সেই সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, পৃথিবীও বঞ্চিত হইয়াছে। কি করিত সে?

সে তুহারা না শুনিলে—তুহারা ভাল মানুষ আছিস।—থাক্ মংগলী ত আর ভালো নেহি।

কি করিত মংগলী ঠিক নাই, কিন্তু তাহার ভ্রূভঙ্গির সঙ্গে কালো দেহের মধ্যে এমন একটা তরঙ্গ খেলিয়া যায় যাহাতে অদ্ভুত রহস্যময় সম্ভাবনায় ভরিয়া উঠে তাহার উক্তি। তপনের কল্পনা যেন একটা উত্তেজনা পায়—সেই কথাটি আশ্রয় করিয়া নানা কল্পনায় মাতিতে। হাস্যকর ঔদ্ধত্যের কল্পনা, অসংযত ইয়াকির কল্পনা, আর অসংকুচিত লাস্যবিলাসের কল্পনা,—কোনোটাই যেন বিলাস-পুরীয়ার' কথা, চক্ষু, অনতিব্যক্ত দৈহিক ভঙ্গি হইতে কল্পনা করিতে কষ্ট হয় না। কষ্ট হয় না এই বলিয়াই বোধ হয় যে, সে 'বিলাসপুরীয়া'। শুধু দেহের ভঙ্গিই নয়, তাহার ইতিহাসও এইরূপ রহস্যের পরিপোষক। কিছুতেই তাহার সংকোচ নাই, কিছুতেই তাহার শংকাও নাই। এই কলের যে মিস্ত্রি-ফোরম্যান গেন্দা সিংকে সে সত্য সত্যই ভালো লাগিয়াছে বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে, তাহাকেই আবার অবলীলাক্রমে ব্যঙ্গ করিয়া, অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিতে জানে হরতালের প্রারম্ভে। আবার তাহারই জন্য হরতালের শেষে ইঞ্জিনীয়ার 'কোয়ার্টারের' আনাচে-কানাচে সে ঘুরিয়া মরিতে পারে।

মংগলী বলিবে যে, যখনকার বিরোধ তখন গিয়াছে, এখন তাহার জের টানা কেন? 'তুহার আপনকার লোক আসবে; পরিবার আনিবি; বহু আসবে;—তখন কি মংগলী আসবে তুহাকে ডাকতে, সিং? আসবে না। তুহার ইজ্জত আছে, তুহার বহুরও ইজ্জত আছে। সে তুহার যেমন আপনার; মংলীর ইমান, মংলীর ইজ্জত, উভি ঐসা মংগলীর আপনার। তখন হরতালের রোজ ছিল। তুহার সকলরেই সাথে হামাকার লড়াই। মালিক ম্যানেজার অফসার ইঞ্জিনীয়ার—সকল গোষ্ঠীর সাথে লড়াই তখন হামাকার গোষ্ঠীর, মজুর-মজুরণী সবাইকার। দু'জাতের লড়াই,—তুহার জাতের, হামার জাতের। তু হামাকে তখন ছুঁবি? হামার জাত নেহি? হামার জাতের ইজ্জত নেহি? দুশমনের জাত, লড়াইর ওক্তে আস্‌বি আমাকে ছুঁতে? তু দালালি করতে বলছিলি—'তেরী ভারী তলব মিলেগা, তুমকো খুশী কর দেগা মালিক লোক'। থুঃ! থুঃ। তুহার ইমান আছে, সিং; তুহার জাতের ধরম তুই রাখছিস। আর হামাকে বলছিলি হামার জাতের ধরম হামি ছেড়ে দিই।'

বিলাসপুরীয়ার এই যুক্তি শুনিয়াছে সুখারী, শুনিয়াছে কেষ্ট মল্লিক, তাহাদের মুখেই উহা শুনিয়াছে তপনও। তাই ত বিলাসপুরীয়াকে লইয়া মুসকিল। ভয় পায় না সে কিছুতেই। লড়াই বাধিলেই খুশী। কিন্তু তাহার পরে?—যে-কে সেই। কাহার সঙ্গে ভাগিয়া পড়িবে হঠাৎ, কোথায় মদ খাইয়া গানে নাচে মাতিবে; তারপর বেঁহুস হইয়া দিন কাটাইয়া দিবে। একেই ত মিলের এলেকা; বিলাসপুরীয়া মেয়েগুলি এইসব দিকে লজ্জা, শরম, নিয়ম-নীতি বিশেষ মানিতেও চাহে না। ইউনিয়নের কাজে উহাকে দৈনন্দিন পাইবার জো নাই; অথচ সংগ্রামের ক্ষেত্রে বিলাসপুরীয়া আসিয়া দাঁড়াইবে সর্বাগ্রে। যেমনি সাহস—তেমনি বুদ্ধি।

সেই সাহস, সেই বুদ্ধিই উহাকে টানিয়া লইয়া যায় যৌন-পিপাসার ও উৎকণ্ঠ বিলাস-লাস্যের দিকে; তপনের তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। প্রাণশক্তি মংগলীরর প্রবল। আপনাকে উচ্ছ্রিত করিতে না পারিয়া আপনার মধ্যে গুমরাইয়া গুমরাইয়া মরিবে, সভ্যতার এমন সংযম-শিক্ষা ত মংগলীর ভাগ্যে জোটে নাই।

কিছুই মংগলী মানেও না। তবু কাজের মধ্যে, মজুর আন্দোলনের বিপুল উত্তেজনার মধ্যে একবার যদি উহাকে ডুবাইয়া ফেলা যায়—তাহা হইলে? তাহা হইলে এই সংকোচ-শংকাহীনা মেয়ে নতুন মানুষ হইয়া উঠিতে পারে না কি? দেশলক্ষ্মী মজুর ইউনিয়নের মধ্য হইতে উত্থিত হইতে পারে নাকি সত্যকারের ভারতীয় মজদুরণী নেত্রী বিলাসপুরীয়া মংলী, আর বাঙালী পার্বতী?

তপন তাহাদের ডাকিয়া পাঠায় ইউনিয়নের কাজে। বুঝাইতে বসে তাহাদের,—হাঁ, একদিন তাহাদের ইউনিয়নের চিঠিপত্র হিসাব সবই তাহাদের নিজেদের রাখিতে হইবে। স্থির হয়—রশিদ, সুখারী আর বিলাসপুরীয়া ও পার্বতীকে লইয়া সে রাজনৈতিক ক্লাশ করিবে।

প্রাণপণ চেষ্টায় তপন উহার সহজ পাঠ তৈরী করিতেছে। কোথা হইতে আরম্ভ করিবে সে?—কোথা হইতে? ইতিহাসের ধারা প্রথমাবধি অনুসরণ করিয়া? না, এই দেশলক্ষ্মী মিলের প্রত্যক্ষ দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা হইতে? বিদেশের মজদুর আন্দোলনের পাঠ্যতালিকা দেখিয়া তপন সিলেবাস প্রনয়ণ করিতে থাকে, মনে মনে বক্তৃতা ভাঁজে। তারপর কেরোসিন তেলের ডিবা জ্বালাইয়া বসে রাত্রি সাতটায় প্রথম ক্লাশ খুলিয়া। তাহার উৎসাহের অন্ত নাই। কিন্তু ন'টা বাজে যে! চঞ্চল হইয়া উঠে প্রথমে মংগলী। অনেকক্ষণ সংযত হইয়া বসিয়া আছে সে। অনেকক্ষণ শুনিয়াছে সে তপনের কথা। হাঁ, ভালো বুঝে নাই; তবে শুনিয়াছে, সব শুনিয়াছে। কিন্তু ন'টা বাজিয়া গেল নাকি? তাহা হইলে হাজিগঞ্জের কলের একটা পুরানা দোস্ত আসিবে। দুয়ার বন্ধ দেখিয়া ফিরিয়া যাইবে হয়ত। আজ ভালো একটা আচ্ছা ছবি আছে: 'বন্দুকওয়ালী'। সাড়ে আটটা না বাজিতেই তাই তপনের সেদিন ক্লাশ শেষ করিতে হয়। আর দ্বিতীয় দিনে ন'টা বাজিল, তবু আর মংগলী আসে না। পরদিন আসিয়া জানাইয়া যায়—সন্ধ্যায় সারাদিন খাটিয়া আবার পড়াশুনা, মংগলী তাহা পারিবে না। আসলে অন্যরাও বেশি পারে না। সুখারী ঝিমাইতে থাকে। পার্বতী ঘরে গিয়া রাঁধিয়া সকলকে খাওয়াইয়া আসিয়াছে। কিন্তু তবু সারাদিনের পরে এই সময়টাতেই ছেলে মেয়ে স্বামীর সঙ্গে তাহার কথা বলিবার সময়। তাহাও ছাড়িতে হইবে কি?

না, সপ্তাহে দুই দিনের বেশি তাই পার্বতীও আসিতে পারিবে না। আবার ইউনিয়নের মেয়েদের মেম্বর করিবার জন্যও তাহাকেই ঘুরিতে হইবে—মংগলী স্পষ্টই বলে, উহা তাহাকে দিয়া হইবে না।

মজদুরদের ক্লাশ যেন কিছুতেই জমে না। একা রশিদই শুনিয়া যায়, বুঝিতে চাহে, প্রশ্ন জিজ্ঞাসাও করিয়া বসে। সে ইস্কুলে পড়িয়া ছিল; উচ্চ প্রাইমারি পাশ করিয়া মাইনরও পাশ করিয়াছিল। নিকটে উচ্চ ইংরাজি ইস্কুল নাই। তাই কাজের খোঁজে সে তখন আসে কলকাতায়। এখানে ইঞ্জিনীয়ারিং রুমে তাহার কাজ মিলিয়াছে—সাত বৎসর যাবৎ। লেখাপড়া সে প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিল। এখন—হঠাৎ এক পশলা বৃষ্টি পাইয়া যেমন শুষ্ক মাঠের ঘাস পাতা মাথা তুলিয়া উঠে,—রশিদের মনের সমস্ত চিন্তা যেন সতেজে বাড়িয়া উঠিতে চাহিল। পাকিস্তান-হিন্দুস্থান : সে পাকিস্তানের মুসলমান, জীবিকার দায়ে হিন্দুস্থানে। এই জীবিকার শর্তটা কি? কি তাহার বর্তমান, কি তাহার ভবিষ্যৎ? পাকিস্তানে কল-কারখানার পত্তন হইলেই বা রশিদের ভরসা কি? 'ইসলামী রাষ্ট্রের' মালিকদের আরও মুনাফা জোগাইবে রশিদ মিঞারা, আরও সস্তায় বুকের রক্ত ইঞ্জিন-রুমের আগুনে-জলে বরাবর এমনি করিয়া নিঃশেষ করিয়া ধন্য হইবে তাহারা।

'মজদুরের দেশ নাই, মজদুরের জাতি নাই।' কিন্তু ইহাও আবার রশিদ জানিয়াছে, আজ মজদুরের নিজস্ব রাষ্ট্র আছে। পৃথিবী-জোড়া মজদুর কিসান তাহাদের ভাই-বোনদের এই নাড়ীর টানও আজ অনুভব করিতেছে।

তপন খাড়া হইয়া বসে রশিদের জিজ্ঞাসায়। জিজ্ঞাসা করে, শুনবে তোমরা সোভিয়েট দেশের কথা?

শ্রমিক এলেকায় দেখাইবার সাধ্য নাই সোভিয়েট ফিল্ম। তাই দেখিতে পাইবে না উহারা 'রোড্ টু লাইফ্', কিংবা 'রেন্‌বো'। যাহাদের আপনার কথা, তাহারাই দেখিবে না। তপন চটিয়া যায়, বড় জোর উহা দেখিবে মধ্যবিত্ত শৌখীনেরা, আর নিম্ন-মধ্যবিত্ত ছাত্র-ছাত্রীরা। কিন্তু যাহারা দেখিলে বুঝিবে, মানিবে, আর তাহাতে পৃথিবীর নতুন শক্তির সঞ্চার হইবে, তাহারাই দেখিতে পায় না। কোনো ছবিঘরের মালিক সেই সব ছবি দেখাইতে দিবে না

নিজের ঘরে। অগত্যা ছবির বই লইয়া আসে তপন। ডাকিয়া আনে ইউনিয়নের আফিস ঘরে মজুরদের। পার্বতী লইয়া আসে মাদ্রাজী ও বাঙালী মজুরণীদের। বিলাসপুরীয়া মংগলীও শুনিয়া দেখিতে আসে; দেখিয়া লাফাইয়া উঠে—'বাহাদুর, মজদুর মেয়ে! অমন তাহাদের বেশভূষা, হাসি, রং! আর এদেশে তুমরা বাবুরা কিনা আমাদের 'বলো প্যাঁচা হয়ে থাক্'। যেমন তুমরা সব, তেমনি হামরা সব।'—এমন করিয়া তপন ও মল্লিকের দিকে দেখাইয়া পার্বতী ও অন্য মেয়েদের দিকে মংগলী হাত বাড়াইল যে তাহার উপহাসে হাসির রোল পড়িয়া গেল।

তপন বলিল, ঠিক। তবে আগে মুলুকটা ও-রকম করে না নিলে মেয়েরাই বা ও-রকম হবে কোথা থেকে?

তা কর না, বাবু, দেশ অমন? তা কই? তুমরা ত সব পণ্ডিত বানাবে, ইস্কুল খুলবে, ভালো মানুষ হবে, গরীবের ভালাই করবে।—দাঙ্গা-ফ্যাসাদ, হরতাল, ইন্‌কেলাব্ করবে কেনে?

তপন বুঝায়, ইন্‌কেলাব-ই তো করতে হবে—তৈরী করো, তৈরী হও। লড়াইতে লাগো।

মংগলী বলিল, সে তুমরা করো। ওসব হামাকের দিয়ে হয় না,—গজর-গজর বুকনি। লড়াই লাগুক্, হামিও লাগ্‌ব কামে।

...'কর্মেই জীবন'—Only in action do we live.

কিন্তু কী কর্মে? কী ধরণের action এ?—ক্লাশ করিবার, মজুরদের 'ভালাই করিবার' কাজেই কি মজুরদের সত্যকারের ভালো হয়?—তপনের নিকট এ প্রশ্ন নিরর্থক। মংগলীর উপহাসে তাহার অর্ধসুপ্ত আত্ম-সমালোচনা তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল।

দেশলক্ষ্মীর বিজয়ী শ্রমিকদের,—এতগুলি সংগ্রামমুখী সেই শ্রমিকের উদ্যম উৎসাহকে জুড়াইয়া দিতেছে না ত তাহারা? ইউনিয়ন গড়িবার ঝোঁকে, দাবির হিসাব-পত্র পাকা করিবার নামে, শ্রমিকের 'একাই', সংগঠন, সুদৃঢ় করিবার অজুহাতে, ভাবী সংগ্রামের জন্য 'ফণ্ড' তুলিবার প্রয়োজনে,—এই যে

দেশলক্ষ্মীর ইউনিয়ন-নেতারা সময় কাটাইল,—তাহাতে ছোটখাটো অসন্তোষ গুলিকে অবশ্য ইতিমধ্যে দানা বাঁধিবার সময় দিল, দাবীগুলিকে মজুরদের মনে সুস্পষ্ট ও সুদৃঢ় করিয়া তুলিল,—কিন্তু ইহার মধ্য দিয়া কি মজুরদের এই বিজয়প্রবুদ্ধ উৎসাহ স্তিমিত হইতেছে না? না, সহজলব্ধ এই জয়ফলকে মজুরেরা আয়ত্ত করিয়া আপনার করিয়া তুলিতেছে—আগামী দিনে নূতনতর, কঠিনতর, সংগ্রামের পাথেয় হিসাবে?—তাহাদের সভা মিছিল, জলুষ—এই সবের মধ্য দিয়া উৎসাহ উদ্দীপনা বাড়িতেছে কি? না, উল্টা ইহার মধ্যে আসিয়া যাইতেছে মজুরদের মনে একটা একঘেয়েমি?—তর্ক বিচার বাধিয়া গেল ইহা লইয়া তপনের সঙ্গে অন্যান্য অভিজ্ঞ সহকর্মীদের। মোতাহের বলিল, ধীরে, তপন, ধীরে। আকস্মিক আঘাতের ফলে একবার না হয় বিজয় সহজে লাভ হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে মাতাল হইয়া উঠিয়ো না। কি তোমাদের সংগঠনের জোর? কি আছে তোমাদের ফণ্ডে? ট্রাইব্যুনাল, আর্‌বিট্রেশনের' পথটাও দেখা উচিত নয় কি?—তপনের শ্রমিক-সংগ্রামের অভিজ্ঞতা নাই। প্রথম বিজয়ের আস্বাদনে তাহার পুঁথি-পড়া ক্ষ্যাপা-মন মাতিয়া উঠিয়াছে, বিপদ ঘটাইবে হয়ত সে 'দেশলক্ষ্মীতে', আর ঐ এলেকার সমস্ত মজদুর আন্দোলনে—ওই 'লুম্পেন' বিলাসপুরীয়াকে বড় করিয়া দেখিয়া।

অমিতেরও মনে হইল—বড় উগ্র, বড় ধৈর্যহীন তপন। কর্মকে চিন্তার সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া লইবারও যেন সময় নাই; তথ্য ও তত্ত্বের অঙ্গাঙ্গিত্ব বুঝিবার মত অভিজ্ঞতা সে লাভ করে নাই। এইরূপই হইবার কথা; পুঁথিপড়া পেটি বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী কর্মীদের মধ্যে' অধীরতা, অতিবিপ্লবী কর্মোন্মাদনা মোটেই অস্বাভাবিক নয়।—...তাহার নিজের পক্ষেও তাহা ঘটিত! চিন্তার পর চিন্তার গ্রন্থি খুলতে গিয়ে ধৈর্য হারাইয়া কর্মে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে সে নিজেও—...ঠিক কাজই অবশ্য সে করিয়াছে।—কিন্তু চিন্তার গ্রন্থি কি তাহাতে খুলিয়া গিয়াছে?...To be or not to be—কই, হ্যামলেটের-এর সংশয় ত ঘোচেনা। সংশয়-তাড়িত বলিয়াই না হ্যামলেট ঝাঁপাইয়া পড়ে উগ্রতম উন্মাদনায় কর্মক্ষেত্রে। হোক সে পোলিনিয়স্, হোক সে ওফিলিয়া, হোক

সে রোজেনক্রাট্জ, কারো নিস্তার নাই তাঁহার নিকটে। এই হ্যামলেট! আর তাই কি আমরা অমিতেরা, তপনেরাও 'হ্যামলেটস্ অব দি এজ!'—পুঁথিপড়া মধ্যবিত্ত সমাজের মহৎ-কল্পনার ও মহৎ-প্রয়াসের ঘূর্ণীপাকে জড়িত বাঙালী বুদ্ধিজীবী আমরা—আমি অমিত, তপন,…আরও, আরও কত পরিচিত সহকর্মী—হ্যামলেটস্ অব দি এজ্?…

আজ অমিত জানে, সেদিন সে হ্যামলেটের চিন্তা-উদ্বুদ্ধ কর্মী চরিত্রকে চিনিতে পারে নাই। ভুল করিয়াছে, ভুল দেখিয়াছে কোলরিজ-এর মত কর্মশংকিত চোখে দেখিয়া হ্যামলেটকে। বুঝে নাই হ্যামলেট্ কর্মবীর আর চিন্তাবীর। তপনও নয় ক্ষ্যাপা বুদ্ধিজীবী, অমিত নয় ক্লান্ত কর্মী। সেই 'হার্স ওয়ার্ল্ড্ও' শেষ হইতেছে, আসিতেছে আর-এক দিন:—এইরূপই তাহার হ্যাম্লেট্স্ অব্ দি এজ্—চিন্তাবীর ও কর্মবীর, সংগ্রাম-প্রবুদ্ধ 'নতুন মানুষ।' কর্মই চাই প্রথম, আর চাই চিন্তাও; কিন্তু চাই সংগ্রাম।··

কিন্তু বুদ্ধিজীবী তপনের জন্য নয়, বুদ্ধিজীবী মালিক ম্যানেজারদের চেষ্টাতেই সেই সংগ্রাম বাধিয়া গেল। ইউনিয়নের দাবি ও নোটিশ মাত্র পেশ হইয়াছে, অমনি সুথারীকে লইয়া গোলমাল বাধিল সর্দারের সঙ্গে। তাহার তলব কাটা যাইবে। তাঁত-ঘরে কাজ নাই বলিয়া নোটিশ হইল কিছু মজুরের উপর। নোটিশ হইল কিছু মেয়ের উপর; আর তাহাদের মধ্যে পার্বতীও আছে। ইউনিয়ন নেতাদের মধ্যে শুধু রশিদেরই কিছু হইল না। সে পাকিস্তানের মুসলমান, তাহাকে বিদায় করিতে পারিলে ম্যানেজার খুশী হইতেন। কিন্তু ইঞ্জিনের কাজ এই নোয়াখালী-চাটগাঁয়ের মুসলমানদের ছাড়া চলে না। অতএব, তাহাকে তোয়াজ করিয়াই রাখা উচিত। সে ভার জাফর আলী শেখের উপর। চেষ্টার ত্রুটী করিবে না জাফর আলীও। কিন্তু নোটিশ হইতেই মেয়ে মজুরগুলি প্রথম কাজ বন্ধ করিল। মংগলী বিলাসপুরীয়া রুখিয়া দাঁড়াইল। তিনজনার উপর 'লুটিশ' হইয়াছে। তাহারা তিনজনাই কিন্তু তাহা শুনিবে না:—'লুটিশ তুলে নাও সাহেব, নইলে দেখি কে কাজ করে এ ঘরে।' কাজ বন্ধ হইল। মংগলী আসিয়া দাঁড়াইল, আঙিনায়

ডাকিল তাঁতঘরের মজুরদের, 'তুহরা শুনিস নাই লুটিশ দিয়েছে পার্বতীকে, মাদ্রাজী মারিয়াম্মাকে, বুড়ী লছমনিয়াকে?' বাহির হইয়া আসিল তাঁতঘরের লোকেরা।

তারপর বিপুল উত্তেজনা।

রশিদ আসিয়া ম্যানেজারকে জানাইল, ইঞ্জিন-ঘরও কিন্তু বন্ধ হইবে—যদি ম্যানেজার নোটিশ তুলিয়া না লন।

দেখিতে না-দেখিতে হরতাল। সম্পূর্ণ বন্ধ কারখানা ছুপুরের পরেই। বুদ্ধি, পরামর্শ, সংগঠন, ফণ্ড—কোনো কিছুরই পরোয়া না করিয়া দেশলক্ষ্মীর মজুরেরা ছুইতিন ঘণ্টার মধ্যে মিলের সমস্ত কাজ বন্ধ করিয়া ঘোষণা করিল, 'লুটিশ উঠা লও', 'মাঙ্ পুরী করো।'

আগুন চোখে জ্বলিতেছে মংগলীর। আর তেমনি প্রদীপ্ত অগ্নি চারিদিকে। আলাপ, চেতনা, অভিজ্ঞতা—ইহার মধ্য দিয়া কখন পরিচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে রশিদের মন। নিজের মনের আগুন পার্বতীই বা কতটা চাপিয়া রাখিবে?

কিন্তু এবার ম্যানেজার ও মালিকেরাও আসলে প্রস্তুত ছিল।···চিরদিনই প্রস্তুত থাকে সেই বিষ-কুটিল চক্রান্তকারী রাজা ও লেইরটিস্—হ্যামলেট্ ঝাঁপাইয়া পড়ে ছুঃসাহসে, জানে অমিত। আধঘণ্টার মধ্যেই আসিয়া গেল এক লরী গুর্খা পুলিশ। তখনো ইঞ্জিনঘরের ছুয়ারে দাঁড়াইয়া রশিদ,—ইঞ্জিন তখনো চলিতেছে। সেখানে দাঁড়াইয়াই দেখিল বড় দারোগা হুকুম করিল, কাজ না করিলে মজুরেরা মিল ছাড়িয়া যাক্। তারপর এক-একটা ঘরের ছুয়ারে দাঁড়াইল বন্দুকধারী গুর্খা; মিলের ফটক বন্ধ হইল। উহার বাহিরে পাহারা দিতে লাগিল ছুই জন গুর্খা, ভিতরে দরওয়ানরা। রশিদ ও মামুদের আর কাজ করা হইল না। ইঞ্জিনঘরের ছুয়ার হইতে আসিয়া দাঁড়াইল তাহারা সকলের সঙ্গে আঙিনায়। বড় দারোগা হুকুম করিতেছে—মজুরেরা মিল খালি করিয়া দিক্, শান্তভাবে বাহির হইয়া যাক্। না হয়, নিজ নিজ কাজে লাগুক প্রত্যেকে।

আগুন এবার বুঝি জ্বলে। চারিদিক থমথম···

মিল চালাবে কে রে হামরা মিল খালি করে দিলে—ওই মোটকা ম্যানেজার ? —মংগলী হাসিয়া খুন। উত্তেজনায় স্তব্ধ চারিদিক; হঠাৎ এই হাসিতে ফাটিয়া পড়িল মজুরেরা সকলে।

চালাবি তুহারা ? চালা না দেখি—কত তুহাদের তাগদ। কেমন তুহাদের বাপের জন্ম—কথাটা আরও একটু অশ্লীল হইতেছিল। কিন্তু মংগলীর চোখ ছিল অন্য দিকেও—ঘেরাও করিতেছে চারিদিক হইতে সিপাহি-দরওয়ানে মিলিয়া তাহাদিগকে। মিলের ফটকও খোলা নাই যে। কী খেয়াল হইতেই মংগলী বলিল: আচ্ছা চালা না তুহারা, চালা। দেখব হামরা।—চল্‌লো, চল্,…দেখি উহারা কল চালাক, হামরা যাচ্ছি ঘরে।…উহারা কল চালাক… পুলিশ আর দরওয়ানে মাকু চালাক,…হামরা ঘরে বসে শুনি…

"চল্ চল্।" মংগলীর সঙ্গে সাড়া পড়িয়া গেল—চল্-চল্। বাহির হইয়া চলিল সকলে। ম্যানেজার সাঙ্গ-পাঙ্গ লইয়া এবার নিজের আপিসের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাই ত, মিলের আঙিনায় আর কাহাদের ঘেরাও করিয়া চড়াও করিবে পুলিশ-দরওয়ান ?

ফটকের বাহির হইতে মংগলী আবার হাঁকিল ম্যানেজারের উদ্দেশে,—দেখিস সাহেব, বাপের ব্যাটা যদি হোস বে-ইমানি করবি না—কল চালাবি তুহারা।

কিন্তু এদিকে ইউনিয়নের আপিসের লাল ঝাণ্ডা বাহির করিয়া লইয়া আসিয়াছে পার্বতী আর কেষ্ট মল্লিক। দেখিবা মাত্রই উত্তেজনায় আগুনের মত মজুরেরা জ্বলিয়া উঠিল। অমনি লাল ঝাণ্ডার সভা বসিল, লাল ঝাণ্ডার শপথ লইল—বস্তি ছাড়িয়া ছেলেমেয়ে তখন আসিয়া জড় হইতে লাগিল। আগুন ছড়াইয়া পড়িতেছে শ্রমিক বস্তিতে, নিকটের পথে, দোকানে, লোকের মুখে, কথাবার্তায়: 'বাহাদুর মজদুর, দেশলক্ষ্মীর।'

কলেজের ল্যাবরেটরি হইতে ইউনিয়নের আপিসে নিত্যকার মত আসিতেছিল তপন; দেখিয়া অবাক। দেখুক মোতাহের ও অমিত—তাহার উগ্রতা, তাহার বামপন্থী বাড়াবাড়ির কোনো প্রয়োজনও হয় নাই। জানে কি অমিত

আপনাদের সংগ্রাম-বুদ্ধিতেই আগাইয়া গিয়াছে দেশলক্ষ্মীর মজুর? না, হ্যামলেট্ নয় সে, সে হোরেশিও!...

এক মাসের নোটিশের সময় পার হয় নাই। ট্রাইব্যুনালে আবেদনের চেষ্টাও করে নাই মজুরেরা।—সাবধানে মজুরদের জানায় একবার তথাপি তপন।

উঃ, তুহরা বাবুরা করগে—জানাইল মংগলী। মামলা, মোকর্দ্দমা তুহাদের ভালো লাগে, তুহরা কর। হামরা যা জানি, তা'ই করি।

অমিতও মনে মনে স্বীকার করে—ভাঙিবে কি এবার হরতাল? হয়ত ভাঙিবে। 'হ্যামলেট্' এই হার্শ ওয়ার্লডে বলি যাইবে।—দেশলক্ষ্মীর মজদুরও হয়ত এবার হারিবে। শেষ সংগ্রামে ছাড়া কোন সংগ্রামে জিতে আবার কবে মজদুর? তবু সংগ্রামটাই আসল কথা। আর তাই 'বাহাদুর মজদুর দেশলক্ষ্মীর।'

আগুন জ্বলিতে লাগিল। বন্ধ হইয়া যাইতেছে ইঞ্জিন-ঘর। সমস্ত মিল যেন একটা মৃত্যুপুরী। রাক্ষস পড়িয়াছে দেশে। পাড়ায় পাড়ায় শ্রমিকের উত্তেজিত পদধ্বনি, দৃঢ় পদক্ষেপ। সপ্তাহের পর সপ্তাহ শেষ হয়। তলব মিলে নাই। মালিকেরা মিলের সস্তা রেশন বন্ধ করিয়া দিয়াছে। তাহা না পাইলে শীঘ্রই খুনাখুনি হইবে। শুনিয়া কেমন চিন্তিত হয় অমিত। মল্লিক ছুটিতেছে দিনরাত্রি। কলেজ আর বেশীক্ষণ করা চলে না তপনের। বাড়িতেও কিন্তু ফেরা সম্ভব নয় সব সময়ে। তিনজনে বাসা বাঁধিয়া লয় ইউনিয়নের আফিসে, ছোটে কলিকাতার শ্রমিক দপ্তরে। রেশনের কার্ড যদি বা আদায় করিল তপনেরা, রেশন কিনিবে কি দিয়া মজুরেরা? হপ্তার তলব অল্পই বাকী ছিল। যাহা পাওনা তাহাও মিলে নাই। দোকানীরা আর বাকি দিবে কি তেল নুন?

জাফর সর্দার নিষেধ করিয়া দিয়াছে তাহাদের—সাবধান! সব মারা যাইবে। এবার আর খেলা নয়। মালিকেরা আগেই এই সব বুঝিয়াছিলেন। তাই এবার আর মালিকেরা আপোষ করিবেন না।

মজুরদের কাহারও ঘরে চাল ডাল নাই। ইউনিয়নের ফণ্ড হইতে কতটুকু সহায়তা হইবে? নিকটের গ্রামে যাও, কৃষক বস্তিতে যাও, গৃহস্থদের বাড়ি যাও। যে করিয়া পার সাহায্য সংগ্রহ করো। অন্তত জন-সাধারণকে মিলের অবস্থা বুঝাইয়া বলো—কেন তাহারা কাপড় পায় না। তাঁতে এত কাপড় বুনিতেছে মজুরেরা, কেন তবু দেশের লোক কাপড় পায় না বুঝাইয়া বলো। পার যাহা সংগ্রহ করিয়া আনো তাহাদের নিকট হইতে।

কলিকাতার মধ্যবিত্ত বন্ধুদের বাড়ি ছোটে অনুরা, সুজাতারা, মঞ্জুররা, বুলুরা।

মিলের কাছাকাছি গ্রামে যায় পার্বতী। প্রথম প্রথম গেল অনুকে লইয়া। কি বলিতে হইবে পার্বতী বুঝিতে পারে না। তারপর একা-একাই চলিল পার্বতী; অনু ইস্কুলের কাজে যায়, উহা শেষ করিয়া আসিতে দেরী হয়। তারপর মজুর-মেয়েদেরও দুই এক জনকে পার্বতী সঙ্গে লয়—গ্রামে চাঁদা তুলিতে হইবে। হরতালের ফণ্ড শূন্য হইতেছে। বাড়ি বাড়ি যাইতে হইবে, অন্তত ছেলেমেয়ের খাদ্য জুটাইতে হইবে। পার্বতীর ও স্বামীরও খাদ্য চাই অন্তত দিনে এক বেলা। বেলুড়ে দাদার নিকটে পাঠাইয়া দিবে ছেলেটাকে। হাঁ, যেমন করিয়া হোক এক সপ্তাহ—দুইটা সপ্তাহ দাদা উহাকে বাঁচাক। মেয়েটাকে নিজেই লইয়া ফিরিবে পার্বতী; যেমন পায় খাওয়াইবে, না পায় খাওয়াইবে না। তবু কাজ করিতেই হইবে;—হাঁ, কাজ করিতেই হইবে। ধার এখনো জোটে কেষ্ট মল্লিকের? তপনেরও জোটে—একেবারে না দেখিলে চলিবে কেন এতগুলি মজুরকে।

দোকানী পশারীকে কিছু নগদ দিতে পারিলে কিছুটা তাহারা বাকী দেয় এখনো। কারণ তাহাদের বরাবরকার ক্রেতা মজুর-মজুরাণীরা। জানু সর্দারকে না হয় দোকানীরা বলিবে—বাকী দেয় নাই। এখনও সাহায্য না করিলে ভবিষ্যতে মজুরেরা কিনিবে কেন আর তাহাদের দোকান হইতে? আর একেবারে 'না' বলিবার উপায় কি আছে? লুঠ হইয়া যাইবে না দোকান? মংগলীর চোখ দেখিলেই বুঝা যায়—বেশি আপত্তি করিলে এখনি আগুণ লাগিবে এই দোকান-পত্রে। অসম্ভব নয় কোনো কাজ এই হরতালীয়া মজুরদের। অসম্ভব আরও নয় এইখানে মংগলীর মত ভয়ঙ্কর মেয়ে

থাকায়। মানুষ লইয়া খেলিতে জানে এই বিলাসপুরীয়া মেয়ে মানুষটা, আগুন লইয়াও খেলিতে জানে। কেমন করিয়া সে পাহারা বসাইয়াছে জামু সর্দারের বিরুদ্ধে। জাফর শেখের দালালি কেমন করিয়া সে ধরিয়া ফেলিতেছে। চারিদিকে তাহার দৃষ্টি, চারিদিকে তাহার গতি। কলে ও সাহেবটা কে আসিয়াছিল? 'লেবর অফিসার? সরকারের লোক?' যে-ই হোক মালিকদের কেহ। দালালির একটা না একটা ফন্দিতে সে ঘুরিতেছে। মংগলী চিনে ওই তিলিতলা চটকলের খুনী ইউনিয়ন বাবুদের। হাঁ, হাঁ, লম্বা লম্বা কথা; তারপর লম্বা দৌড়। সাবধান! এই পাড়ায় কোনো চায়ের দোকানীর ঘরে এই তিলিপাড়ার ওই সব লোকদের দেখিলে কিন্তু দেশলক্ষ্মীর মজুরেরা দোকানীকে ক্ষমা করিবেনা।

গেল দুই সপ্তাহ। মিলে তালা বন্ধ করিবে এবার মালিকেরা। তবু জাফর সেখ ও জামু সর্দারের সাধ্য হইল না কাহাকেও হরতাল ভাঙিতে মুখ খুলিয়া বলে। গেল তিন সপ্তাহ। সত্যই তালা বন্ধ হইল মিলে। যেন এক বারের মত জিতিল ইউনিয়ন। চোখে মুখে দর্প মংগলীর:—কোথায় ম্যানেজার সাহেবের সাঙাৎরা, কল চালাইল না তাহারা? মজুরদের ত খুব কল হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিল। কল চালাইল না তার পর?

কিন্তু চার সপ্তাহও গেল। কল না চলিলে মজুরদেরও যে দিন চলে না। উড়িয়ারা বাড়ি গিয়াছে কেহ কেহ—দেশে শীঘ্রই ধান উঠিবে। হিন্দুস্থানীরাও সকলে নাই। বাঙালীরা আশ পাশের গ্রাম হইতে কাজে বেশি আসিত; তাহারাও এখন নানা খানে চাষের কাজ করিতেছে। কিন্তু মাদ্রাজীরা করিবে কি?

কোয়ার্টারে যাহারা আছে তাহারা আরও উদ্বিগ্ন হইল। ঘর ছাড়িবার নোটিশ দিয়াছে মালিকেরা। পার্বতী জানাইয়া দেয়—ঘর ছাড়ার কথাই নাই। আসুক মালিকেরা যদি পারে সিপাহি লইয়া, তারপর দেখা যাইবে।

মারামারি হইবে, লাঠি চলিবে, হয়ত বন্দুকও—ভয়ে কাঠ হইয়া যায় পার্বতীর পক্ষাঘাতগ্রস্ত স্বামী। ভয় কি পার্বতীই পায় না? কিন্তু ভয় পাইলেই বা করিবে কি? সংগ্রাম করিবে না? তাহা ছাড়া উপায় আছে কাহারও

বাঁচিবার আর? দাদা ছেলেটকে আর রাখিতে চাহেন না। মেয়েটাকেই বা আর কত দিন না-খাওয়াইয়া না-পরাইয়া রাখা যাইবে? নিজের আর স্বামীরই বা এভাবে চলিবে কিরূপে? তবু ত পার্বতীর নিজের অবস্থা তত সঙ্গিন নয়। দোকানী এখনও তাহাদের ধারে তেল নুন দিতে অস্বীকার করে নাই। পার্বতী নিজেও বুঝে না—তাহারা আর কত দিন ঐরূপ ধার দিবে। কিন্তু নিজেও জানে না কোথায় আর তাহারা যাইবে? অন্য কোন কলে? অন্য কোনো কাজে? কোথায় তাহারা কাজ পাইবে? সেখানেও ত সংগ্রামই করিতে হইবে। তাহা হইলে এই সংগ্রামই বা ছাড়িয়া যাইবে কেন? সংগ্রাম ছাড়া বাঁচবার পথ কই?

পার্বতীর স্বামী দেশে ফিরিয়া যাইবার কথা বলে। তপনকে পাইয়া, অমিতকে পাইয়া সে কথা বলিবার সে সুযোগ পাইল। দুর্ভিক্ষের বিভীষিকা মন হইতে তাহার এখন মুছিয়া গিয়াছে। তাহার চক্ষে এখন বরং একঘেয়ে, অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে এই কুলি-কোয়ার্টারের জীবন। নানা জাতির ঘর, নানা ধরনের মানুষ, বাঙালী এখানে আর কেহ বিশেষ নাই। পার্বতী কাজে চলিয়া গেলে দীর্ঘ সময় সে কোনরূপে উঠিয়া আসিয়া বসে বাহিরের আঙিনায়। দেখে এই কোয়ার্টারের জীবন-যাত্রা। তাহার সঙ্গে কথা বলিবার কেহ নাই, কেহ কথা বলিতে আসেও না। কুলিদের ছেলে মেয়েদের সঙ্গে খেলে তাহার ছেলে মেয়ে। একটা কায়স্থ সন্তান সে, ভদ্রলোক। কি ভাষায় তাহার ছেলে মেয়ে কথা বলে, কি ভাবা শিখিতেছে তাহারা? লজ্জা হয় তাহার। কি রকম চাল-চলন এই মাদ্রাজী ও হিন্দুস্থানী মেয়ে গুলির! যদি দেখিত অমিত! বিশ্রী! চরিত্রই বা ইহাদের কিরূপ? কাহারও যে লজ্জা নাই শরম নাই, চরিত্রের বালাইও নাই,—তাহা পার্বতীর স্বামী বুঝিতে পারিতেছে। সর্বদাই ত দেখে এই বিলাসপুরীয়া মংগলীকে। এ কি মেয়ে মানুষ? অথচ ইহাদের সহিত একত্র কাজ করিতে যায় পার্বতীও। কাজ করে, গল্প করে, একসঙ্গে মিটিং করে—বক্তৃতাও দেয় পার্বতী। পুরুষের মধ্যে, নানা জাতীয় পুরুষের সঙ্গে গা ঘেঁষিয়া বসে, পুরুষের পাশাপাশি মিছিলে চলে; এই বিলাসপুরীয়ার মতই হয়ত পুরুষের

সঙ্গে হাসে, হয়ত পরিহাসও করে। অন্তত সভায় উঠিয়া নাকি উহার মতই সে বক্তৃতা দেয়—বলে তাহা পার্বতীর মেয়ে। বলে অন্যান্য সকলে—'পার্বতী, তুই খুব ভালো বলিস। কিন্তু মুখ বটে বিলাসপুরীয়ার! কিছু আটকায় না মুখে। —মুখেও না চরিত্রেও না। আশ্চর্য মেয়ে!'

অস্থির হইয়া উঠে পার্বতীর স্বামী। না, জবাব যখন হইয়াছে তখন পার্বতীর এখানে আর পড়িয়া থাকিয়া কি হইবে? দেশে চলুক পার্বতী। দেশে দুই মুঠা তাহারা নিশ্চয়ই খাইতে পাইবে। অবশ্য ঠিক বলিয়াছে অমিত, 'পাকিস্তান' হইয়াছে দেশ। দেশের মানুষও দেশ ছাড়িয়া এদিকে আসিতেছে। অনেকে নানাস্থানে ভিড় করিতেছে। কেহ কেহ আশ্রয়-কেন্দ্রে স্থান লইয়াছে। বেশ, চলুক পার্বতী না হয় টিটাগড়ের এই আশ্রয়কেন্দ্রেই,—দেশের লোক আছে সেখানে। হাঁ, আপাতত সেখানেই চলুক। তবু এই কারখানার ত্রিসীমানায় আর নয়। এখানে মানুষ থাকে? মানুষ ইহারা?—কিন্তু পার্বতীকে আসিতে দেখিয়াই চুপ করে তাহার স্বামী ভয়ে। পার্বতী ক্ষেপিয়া যাইবে আশ্রয়কেন্দ্রের কথা শুনিলে। সে কি ভিখারী, না, সমস্ত মান ইজ্জৎ খোয়াইয়াছে? নিজের পরিশ্রমে রোজকার করে সে। 'নিজের জোরে খাই। আমি কেন যাব আশ্রয় কেন্দ্রে? কাজ করব খাব, খাওয়াব ওদের। অন্যের ভাবনা কেন আমার জন্য, এই হরতালের জন্য? আমি ত ভাবি না।'

কিন্তু ভাবে না কি পার্বতী? অমিত পার্বতীকে দেখিতেছে, সে জানে—পার্বতীর চোখে মুখে ভাবনা। না, শুধু পরিশ্রম ও ঘোরাফেরার শ্রান্তি তাহা নয়, সংসারও ভবিষ্যতের ভাবনাও আছে। তবু উহার সহিতই আছে সেই মুখে একটা সংকল্পের দৃঢ়তা; এই চেতনা—সে পার্বতী, দেশলক্ষ্মী মিলের মজুর ইউনিয়নের সে একজন। নিজের পরিশ্রমে সে পরিবার বাঁচাইয়াছে, নিজের মান বাঁচাইয়াছে। কাহারও নিকট হাত পাতে নাই সে এই কলে কাজ পাইবার পর হইতে। অমিত দেখিয়াছে তাহার শান্ত গর্ব—'কারও কাছে হাত পাতি নি আর—কাজ পেয়ে অবধি।' কাহারও গলগ্রহ সে নয়—দাদার নয়, স্বামীর নয়, সমাজেরও নয়। সঙ্গে সঙ্গে আরও বলিয়াছে

পার্বতী, 'দোকানী তাই আমাকে তেল নূন ধার দেয় বিনা প্রশ্নে। কিন্তু বুঝি ওদেরও কেমন এখন সংশয় আসছে—আমি ধার শোধ করতে পারব ত শেষ পর্যন্ত ? আমি বলি, 'না, না, ভয় করো না। বেঁচে থাকলে কাজ করব, ধার শোধ করব।' 'না, না,' বলে তারা, 'না,—তোমার কথা ভাবছি না পার্বতী মা। ভাবছি এই মাদ্রাজীদের কথা—।' 'কারও কথা ভাবতে হবে না—ইউনিয়ন যখন আছে, ইমান তখন থাকবে।'……

কিন্তু পাঁচ সপ্তাহ ছাড়াইয়া ছয় সপ্তাহও শেষ হয় যে। কলও খোলে না, কাজও শুরু হয় না। জাফর মিঞা বলে, আর আমরা কতদিন বসে থাকব ? বালবাচ্চা নিয়ে মরছি যে।

কথাটা নীরবে শোনে, পরে সমর্থনও করে ওড়িয়ারা। তারপর হিন্দুস্থানীরা। তারপর আরম্ভ হয় মল্লিক ও তপনকে প্রশ্ন। মজুর মেয়েপুরুষের ডিপুটেশন সঙ্গে করিয়া তাহাদের আশা উৎসাহকে জীয়াইয়া রাখিতে কলিকাতা যায় তপন ও মল্লিক। হতাশ হইয়া তাহারা ফিরিয়া আসে। তপন শোনে—শ্রমিক মন্ত্রী হস্তক্ষেপ করিবেন না। তিনি ট্রাইব্যুন্যালও বসাইবেন না। এই শ্রমশিল্পের বিরোধিতাকারী ও 'শিশুরাষ্ট্রের' বিরুদ্ধে নানা কুৎসা-রটনাকারীদের কথায় দেশলক্ষ্মীর মজুরেরা নাচিতেছে। আগে হরতাল ছাড়ুক সেই মজুরেরা, তবে মন্ত্রী-বাহাদুর শুনিবেন তাহাদের কথা।

জাফর পরামর্শ দিল, ইউনিয়নে ডেকে আনো মন্ত্রী-বাহাদুরকে। তাকে প্রেসিডেণ্ট বানাও। ওর সাক্রেদ এই কথাই বলেছেন। মজদুর সঙ্ঘের দফতরে কাল এই কথা হচ্ছিল।'

'দেশলক্ষ্মী ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট হবে ওই কাণকাটা মন্ত্রীটা?'—রশিদ ক্ষেপিয়া উঠে। মংগলী হাসিয়া বলে, 'ওর মুরদ্ কত ? আস্‌তে বলো না উহাকে এখানে জাফর চাচা, দেখবে তাকে মংগলী বিলাসপুরীয়া'—মাদ্রাজী, ওড়িয়া, হিন্দুস্থানী বাঙালী কেহ মংগলীর কথার প্রতিবাদ করিতে সাহস পায় না। কিন্তু উপায় কি ? দুইমাস চলিতেছে হরতাল, তিলিতলার চটকলের ইউনিয়নের 'বাবুরাও' ঘন ঘন আসা যাওয়া শুরু করে এইদিকে। হিন্দুস্থানীদের তাহারা বলে, 'এ

ইউনিয়ন তোমাদের ফাঁসাচ্ছে, বুঝছনা? কমিউনিষ্টদের এমনি নিয়ম—হরতাল বাধিয়ে দেশওয়ালী মজুরদের ফাঁসিয়ে দেওয়া।'

খড়দহ-পানিহাটির গ্রামের মেয়েরাও ইদানীং বলে পার্বতীকে, তা তোমরা এখন মিটিয়ে ফেলোনা? মিলটা আমাদের বাঙালীদের; ওটায় কেন হরতাল?

মনে মনে পার্বতী ক্রুদ্ধ হয়—ওদের সব কিছুতে বাঙালী আর মাড়োয়ারী। মুখে পার্বতী বলে, কিন্তু আমরা বাঙালী মজুরেরাও না খেয়ে মরছি যে, দিদি। আমাদেরও যে জবাব দিচ্ছে কাজে।

তোমরা কমিউনিস্ট্ হতে গেলে কেন?

'কমিউনিস্ট্!' সে আমরা হব কি করে? সে সব বিষয় জানি কি? বুঝি কি আমরা?

তবে হরতাল করছ কেন? এখন দেশ স্বাধীন হয়েছে; হরতাল কে করে এখন কমিউনিস্ট্রা ছাড়া?

হরতাল করলেই দোষ আর ছাঁটাই করলে দোষ হয় না? হপ্তা কাটলে দোষ হয় না? বেতন কাটলে দোষ হয় না? আধ-পেটা খাইয়ে মানুষকে মারলে দোষ হয় না? কলে তালাবন্ধ করলেও দোষ হয় না?

গিন্নীরা আশ্চর্য হন। সেই মুখচোরা মেয়েটাও ফোঁস করে। সহজ কথা বোঝেন—পার্বতী আর সেই ভদ্র মেয়েটি নাই। সেই শ্রীছাঁদ লজ্জা সহবৎও তাহার আর নাই।

গিন্নীরা বাড়িতে মেয়েদের-বউদের বলেন, ওর সঙ্গে এত গল্প কি তোমাদের? তারপর পার্বতীকে জানান, ওগো ভালোমানুষের মেয়ে, যাও। তোমরা কলে কাজ করো—কলের কথা আমরা বুঝি না। তোমাদের কাজও আমরা ভাল বুঝি না, তোমাদের এসব কাণ্ডও আমাদের ভালো লাগেনা।

কলিকাতার নারী সমিতির মেয়েরাও আবার আসিল দুইদিন। দেশে-গ্রামের ভদ্রলোকেরা এবার উদাসীন। গৃহিণীরা বসিয়া বসিয়া সবই শুনিল। কিন্তু চুপচাপ।

তপন ও অমিত অন্যান্য পরামর্শদাতাদের লইয়া কলিকাতায় বাহির হয়।

বাহির হইয়া পড়ে কলিকাতার ট্রেড্ ইউনিয়নের কর্তারাও কলিকাতায়। কাহাকেও মধ্যস্থ খুঁজিয়া বাহির করা চাই। এদিকে মালিকেরাও এখন কথা চালাইতে চায়। কারণ মালিকেরাও বুঝে—ক্ষতি বড় বেশি বাড়িতেছে; একটা মিটমাট হইলে মন্দ হয় না। শুধু মন্ত্রীর উপর ভরসা করিলে জয় হইবে মন্ত্রীর; কলের যে ক্ষতি হইবে তাহা উহাতে পূরণ হইবে না। তাহাদের মালিকদের ইঞ্জিন-ঘর নিবিয়া গিয়াছে; কারখানার আঙিনায় ঘাস গজাইতেছে; মরিচা পড়িতেছে লোহা-লকড়ে। কারখানা একদিন খুলিতেই হইবে, সেদিন এই ক্ষতি পোষাইবে কিরূপে? কতদিনে তাহা তখন পূরণ হইবে?

আরও এক সপ্তাহ তবু কথাবার্তায় কাটে, তারপর মিটমাট হয়। ঠিক হয়, কেহ ছাঁটাই হইবে না; কাহারও হপ্তা কাটা যাইবে না; হরতালের সময়কার বেতন ও দাবিদাওয়ার বিচার হইবে পরে ট্রাইব্যুন্যালে।

জিতিয়াছে কি ইউনিয়ন? নিশ্চয়ই জিতিয়াছে।

শুধু শেষ যুদ্ধ নয়, সাময়িক খণ্ডযুদ্ধেও আবার জিতিয়াছে দেশলক্ষ্মীর বাহাদুর মজদুর!

তেষট্টি দিন পরে কল খুলিল। লাল ঝাণ্ডা লইয়া মিছিল করিয়া গলায় মালা পরিয়া সকলের আগে চলিল ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি কেষ্ট মল্লিক; তারপরে পার্বতী আর মংগলী, রশিদ আর সুখারী, আর জঙ্গী কর্মীরা। মুখে লাল ঝাণ্ডার জয়; ইনকেলাবের ঘোষণা; জয় জয়কার দুনিয়া কী মজদুরের। জীবনে এমন দৃশ্য আর দেখিয়াছে তপন? জোয়ারের জল যেন শুষ্ক নদীর খাতে জাগিয়া উঠিল। কানায় কানায় ভরিয়া গেল কারখানার মড়া চরা। আর কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে মজদুরদের প্রাণ। 'বাহাদুর মজদুর দেশলক্ষ্মীর।' অমিতের মনও সেদিন স্বীকার করিয়াছে—বাহাদুর মজদুর! আর হারিলেই বা ক্ষতি ছিল কি?—তপন তাহাকে জানায়,—সংগ্রাম বাদ দিলে শ্রেণী-সংগ্রামের থাকে কি?

দুইমাস মাত্র। কারখানায় মজুরের রাজত্ব বুঝি প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। অন্তত অমিতদেরও মনে সংগ্রামশীলতা উগ্র হইতেছে। ট্রাইব্যুন্যাল বসিবে—

মন্ত্রী কিন্তু সেই হুকুম দেন না। হঠাৎ বরং জবাব হইল এইবার রশিদের, আর মংগলীর। তেমনি হঠাৎ হরতালও আবার সঙ্গে সঙ্গে। অমনি আসিল লরী-ভরতি পুলিশ। আসিল তিলিতলার কলের ভাড়াটে দরওয়ানরা; আসিল বারাকপুরের 'জয়হিন্দ' বাবুরা। এবার তাহারা দেরী করিল না—প্ল্যান ঠিক ছিল মালিকের ও মন্ত্রীদের। একযোগে কারখানার মধ্য হইতে পুলিশে-দরওয়ানে মজুরদের লাঠি চালাইয়া বাহির করিল। মাথা ফাটিল মংগলীর ও কেষ্ট মল্লিকের; আর আরও দুইজন মজুরের। আবার তালাবন্ধ, লক-আউট। কিন্তু তারপর দিনই পাল্টা-আক্রমণ মজুরদের। ফটকের দরওয়ানদের গায়ের জোরে ঠেলিয়া ফটক ভাঙিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল বারশ' মজুর। সকলের আগে পার্বতী, সুখারী, রশিদ। নিজেরাই তাহারা কাজ চালু করিয়া দিল, মজুরের কারখানা মজুরেরা দখল করিয়া বসিল। দুপুরে বাহির হইতে খাবার আনাইল। তখন মংগলী আসিল, মল্লিকও আসিল। দুপুর গড়াইয়া যায়—কিন্তু কেহ কারখানা ছাড়িল না, ছাড়িবে না। কারখানা কাহার যে তাহা বন্ধ করে ম্যানেজার বা মালিক? একটা তাঁত যাহারা চালাইতে পারে না তাহাদের কেন এত মালিকানার বড়াই? যাহারা কল চালু করিয়াছে তাহারাই কল চালু রাখিবে; কারখানা ছাড়িবে না। লরী লরী গুর্খা নামিল দুয়ারে; কিন্তু কারখানার ফটক ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া বসিয়াছে মজুরেরা।

অমিত শুনিয়া ভাবে,—কি হইবে? এখন আর উপায় কি?

সন্ধ্যা গেল, রাত্রি গেল। কেমন অসোয়াস্তি বাড়ে মজুরদের—এইভাবে আর কত বসিয়া থাকা যায়—কারখানার মধ্যে? সকালে মিলের বস্তিতে কোয়ার্টারে ফিরিয়া গেল একদল—বাহিরের নানাবিধ ব্যবস্থা চাই। তপন বাহির হইতে খাবার পাঠাইতেছে; উহার কিছু ভিতরে যায়, কিছু পুলিশে ধরিয়া রাখে। আর পারে না ভিতরের মজুরেরা। বেলা বাড়িতেছে। বাহিরে পুলিশের কর্তা ও মিলের কর্তাদের ব্যবস্থাও ঘণ্টায় ঘণ্টায় বাড়িতেছে। ভিতরে? তপন খবর পায়, ভিতরেও এখন যুদ্ধের জন্য সাজিতেছে মজদুর। আর বসিয়া নাই কেহ। মংগলী আবার ব্যস্ত কাজে।

সে-ই বুঝাইতেছে কোন্ পথে আসিবে পুলিশ, কোথা হইতে তাহারা লাঠি চালাইবে; কোথা হইতে গুলি ছুঁড়িবে; কি ভাবে বাধা ও ব্যারিকেড্ তুলিতে হইবে প্রত্যেকটি ঘরের দুয়ারে; প্রত্যেকটা ঘরের ভিতরে—তুলার বস্তার আড়ালে আড়ালে। একটা নূতন উত্তেজনা তাই ভিতরে।

অপরাহ্ণ যখন শেষ—তখন শুরু হইল গুর্খা পুলিশের অভিযান। লাঠি চলিল, কাঁদুনে বোমা ফাটিল, তারপর গুলি।...

দেখা গেল সাতজনের খোঁজ নাই। আহত মংগলী ও মল্লিকেরও খোঁজ নাই; কিন্তু গুলিতে আহত রশিদ, পার্বতী, প্রভৃতিকে পুলিশ গ্রেফ্‌তার করিয়াছে। কোথায় তাহারা? তিনদিন ধরিয়া তপন তাহাদের সংবাদ সন্ধান করিতেছে। কেহ বলে তাহারা সম্ভবত পুলিশ হাসপাতালে; পার্বতী হয়ত মেডিকেল কলেজেই। শোনা গেল কে একজন মরিয়াছে হাসপাতালে। হয়ত মিথ্যা গুজব; কিন্তু সংবাদটা পাকা করিয়া জানা যায় না। তপনের নিজেরও ঘুরাফিরি বেশি করা সম্ভব নয়। তাহার নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা সম্ভবত নাই; কিন্তু পুলিশ তাহাকেও খোঁজ করিতেছে। কিছুদিন বাড়িতে না থাকাই তপনের পক্ষে ঠিক। সে কলেজে যায়, সন্ধ্যায় মিলের নিকটস্থ মজুর বস্তিতে গিয়া বসে। কারণ হরতালটাও চালু রাখিতে হইবে ত—পুলিশের দাপটে ত্রাসগ্রস্ত হইয়া যেন মজুরেরা না ভাঙিয়া পড়ে।

মালিক-মজুরের সংগ্রাম যথা-নিয়মে মজুর আর পুলিশ-রাজের সংগ্রাম এখন।

তপনকে গোয়েন্দা আপিসে দেখিয়া অমিত তাই বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই—তপন কি করিয়া কলিকাতায় আসিল ও এখানে ধরা পড়িল। কলিকাতায় সে আসিয়াছিল কবে? দেশলক্ষ্মী মিলের সমস্ত সংগ্রাম, তপনের এই কয় বৎসরের ক্ষ্যাপামি-ভরা অক্লান্ত প্রয়াস, ছবির মত তাহার মনে ভাসিয়া উঠিতেছিল। কোথায় সেই বিলাসপুরীয়া মংগলী? দুর্বার প্রাণলীলা

যাহার দেহের তটে তটে খেলিয়া বেড়ায়, দুঃসাহসের ঐশ্বর্যে যাহা মূর্তি না পাইলে আছাড়িয়া মরে সুরার পিপাসায়, দৈহিক কামনার সংকোচহীন নির্লজ্জতায়। কোথায় বা পার্বতী—'সাত চড়ে মুখে কথা ফুটিত না' যেই বাঙালী মেয়ের? যে কাজ করে, আর গর্বও বোধ করে কাজ করিতে। কোথায় বা কেষ্ট মল্লিক, আর সেই রশিদ—স্পষ্টভাষী, বুদ্ধিমান, মুসলমান যুবক—যে পড়াশুনার নতুন আস্বাদন পাইয়া উৎসাহিত, কথায় কাজে বিচারশীল কিন্তু দৃঢ় সংকল্প, পৃথিবীকে নতুন চোখে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে।—এ সকলকে ফেলিয়া—দেশলক্ষ্মীর হয়তালের সমস্ত দায়িত্ব মাথায় যখন তপনের—সে ধরা পড়িল?

তপন, ধরা পড়লে কি করে?—অমিত জিজ্ঞাসা করিল।

তপন জানাইল, কারখানার কাছে যেখানে রাত্রিতে থাকতাম সন্ধ্যায় সেখানে কাল সংবাদ এল—থানার লোকেরা সাজছে, রাত্রিতে হানা দেবে নানা জায়গায়। বুঝলাম হয়ত এ অঞ্চলটা ঘিরে খোঁজাখুঁজি করবে মল্লিক আর মংগলীর জন্য। মল্লিক তখনি চলল অন্যত্র। মংগলীর ভাবনাই নেই—সে ওপারে চলে যাচ্ছে। কাল আবার হোলির রাত্রি। তার ত রাত্রি কাটবে হল্লায় সেখানে। আমি ভাবলাম বাড়ি গিয়ে ঘুমোই। বাড়িতে গিয়েছিলামও; কিন্তু কেমন ভালো লাগল না। দোলের রাত্রিতে বাড়িতে একটু উৎসবও আছে। পুলিশ অনেক খোঁজ করে গিয়েছে দু'দিন আগে। তপন আজ বাড়ি ফিরেছে, তা নিশ্চয় জানবে, সকালেই এসে হয়ত পুলিশ হানা দেবে।...বাড়ি থেকে তাই না খেয়েই চলে এলাম, রাতটা কলকাতা গিয়ে থাকব। আপনাদের ওখানে গিয়ে দেখি আপনি বাড়ি নেই। সংবাপত্রের আপিসে প্রথম খোঁজ নিলাম—রশিদের কোনো সংবাদ পাওয়া গিয়েছে কিনা, হাসপাতালের কোনো খবর আছে কিনা। কিছু জানা গেল না। বললাম, কাল বোধ হয় আমাদের কারখানা অঞ্চলে পুলিশের একটা তোড়জোড় চলবে। কে একজন বললে, এ রকম কত গল্পই শোনা যায়। ট্রেড ইউনিয়ন আপিসে গেলাম না আর। কাগজের আপিসও তখন বন্ধ হচ্ছে। বারান্দায় অগত্যা তখন ঘুমিয়ে

পড়লাম। শুনলাম—আপনারা নাকি আগেই জেনেছিলেন আজ কলকাতায় এত বড় একটা হানা হবে।

আমরা জানতাম ? কে বললে তোমাকে ?

শুনলাম। সকালবেলা কাগজ আপিসের এদের কানাঘুষো—কারা কারা নেই, কারা রাত্রেই সরে গিয়েছে।

কথাটা অমিতও এখানে আসিয়া বার কয় শুনিয়াছে। যাহারা কাল সন্ধ্যায় ওসব আপিসে গিয়াছিল তাহারা কোনোরূপ আভাস সংগ্রহ করিয়াছিল। তাই রাত্রিতে নিজ নিজ স্থানে তাহাদের থাকিবার কথা নয়—হয়ত তাহারা গ্রেপ্তার হইবে না।

আমি যে কাল এদিকে আসিইনি, তপন। বলিল অমিত…হোলির দিন। দোকান ত নেই, দেরীও হয়ে গেল যেখানে গেছলাম। ভাবলাম বরাবর বাড়ি চলে যাই।…

কে জানিত ভাগ্যের এমন চক্রান্ত ? জানিত কি তাহা ইন্দ্রাণী, জানিত কি অমিত ? জানিলে আজ হয়ত তুমিও ধরা পড়িতেনা, অমিত।

তপনও বুঝি ইহাই ভাবিতেছিল। হাসিল, বলিল, দেখুন, ভাগ্য মানবেন ত ? কি মানবেন—'লাক্' ? না, 'ফেট্' ? দৈব, না, নিয়তি ?

অমিতও হাসিল।—সবই মানি। আরও বেশি মানি—মঘ, অশ্লেষা, বারবেলা, দিক্‌শূল, হাঁচি, টিক্‌টিকি, মাকুন্দোচোপা।—আর মনে মনে বলিল, আসলে মানি—ইন্দ্রাণী, সত্যই নিয়তির মত যার আবির্ভাব। নিয়তিই যেন। কে জানিত ? এতদিন পরে দেখা, গল্পতর্ক ত হইবেই। আর কে জানিত গল্পে তর্কে আমার জন্যই এই বন্ধন-রজ্জু রচনা করিতেছিল বসিয়া ইন্দ্রাণী। কিন্তু শুধু ইন্দ্রাণী কেন ? অমিতও। তর্ক ছাড়িয়া, গল্প ছাড়িয়া উঠিতে সেও চাহে নাই কাল সন্ধ্যায়। অমিতের অন্য কাহারও সঙ্গে দেখা হইল না আর একেবারেই।

কার মুখ দেখেছিলেন আজ সকালে ?

সকালে আর কাকে দেখব ? এস-বি সাব্-ইনস্পেকটারকে। সুদর্শন যুবক ইনটেলিজেন্ট, কালচারড্ ম্যান, সোভিয়েট সর্টষ্টোরিজ-পড়া স্ত্রী!

তপন হাসিয়া উঠিল : এত খবর জানলেন কি করে ?

না জানিয়ে পারেন নি তিনি। ভদ্রলোক ভদ্রলোককে ধরতে এসেছেন, একটা কালচার আছে ত আমারও।—একই শ্রেণীর একই শ্রেণী-কালচারের আঁতাত। আমিই কি তা জানতে পেরে খুশী না হয়ে পারি? 'না, লোকটা ভদ্রলোক।—স্ত্রী অণ্ডার গ্র্যাজুয়েট্।'

তপন হাসিল। কিন্তু কেমন উদ্‌ভ্রান্ত হইল এবার দৃষ্টি।

অন্যদিকে আলোচনা চলিতেছিল, যাই বলো অমন লাইব্রেরিটা! কত কষ্টের বই, কত যত্নে সংগ্রহীত। কত দুষ্প্রাপ্য বই রয়েছে যা এদেশে আর পাওয়া যাবে না,—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রথম দিককার লুণ্ঠনের কত প্রমাণ-পত্র, আর সংগ্রহ করা সম্ভব নয় এই সব। মঞ্জু অমিতকে বলিল, বইগুলি ওরা কোনো পাবলিক লাইব্রেরীতে দিয়ে দিলেও পারে ত? নয় রাখত ন্যাশন্যাল লাইব্রেরাতে—···

অমিত হাসিল, বলিল, বলে ছাখো না।

···এক একটা বইএর সঙ্গেও এক একটা ইতিহাস জড়িত। সে ইতিগাসই কি ভুলিতে পারি কেহ আমরা? ভাবো সেই 'সী কাষ্টমস্ এ্যাকট্' ফাঁকি দিয়া আনা পামে দত্তের 'ইণ্ডিয়া টুডের' কথা। খান দুই কপি মাত্র আসে তখন কলিকাতায়। দুই জন বিলাতের ছাত্র জাহাজ হইতে তাহা হাতে করিয়া নামে-যেন ডিটেকটিব্ উপন্যাস।···ভাবো—সেই মাকিন সৈনিক বন্ধুদের দেওয়া মার্কিনী সেট্ লেলিনের সিলেক্‌টেড্ ওয়ার্কস্।···পিটার-বিন-এর দেওয়া কড্‌ওয়েল-এর 'ক্রাইসিস্ ইন ফিজিক্‌স্'···স্পেনের গৃহযুদ্ধে যোগ দিতে না দিতেই মারা গেলেন কড্‌ওয়েল। আর পিটার এখান হইতে আরাকানে পৌছতে না পৌছতেই জাপানী বোমায় ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইলেন। দীর্ঘদেহ, সুপুরুষ, একহারা চেহারা পিটার—একটা নিজস্ব আত্মসচেতনতা ছিল তাহার চেহারায়—সম্ভ্রম হইত সকলের, সম্ভ্রমও ছিল সকলের প্রতি। ওয়াভল্ ভুল করিয়াছিলেন সে অভিযান পরিকল্পনায়। কিন্তু কর্ণেল ভুল করেন ন'ই পিটারকে উহাতে মনোনয়নে। কমিশন না লইয়া যে লোক সাধারণ সৈনিক থাকে আর ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে, ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহাদের সাহিত্য

পড়ে, আর শিল্পকলা বুঝে, তাহাকে তাড়াতাড়ি যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাইয়া দেওয়াই কর্ণেলের পক্ষে উচিত। সেই লাইব্রেরীতে পিটারও কত সময় কাটাইয়াছে। গুদামের মত ঠাসা বই—উহার মধ্যে বসিয়া দেখিয়াছে এই দেশের নানা রিপোর্ট, নানা তথ্য ও নানা গ্রন্থ। 'ক্রাইসিস্ ইন্ ফিজিকস্' তখন দুর্লভ গ্রন্থ। তাই সাধ করিয়া তাহা উপহার দেয় পিটার বিদায় লইবার দিনের সন্ধ্যায়। সাত দিনের মধ্যে বুথিডং-এর সীমানায় তার দেহ খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া যায়।

দীর্ঘ দেহ, শান্ত চক্ষু আশ্চর্য মানবীয়তায় বলিষ্ঠ মন পিটার!

চিন্তাস্রোত হইতে জাগিয়া অমিত শুনিল…অত কষ্টের প্রেস্, অত গর্বের কাগজ…গরীবের চাঁদায় গড়িয়া তোলা গরীবের সম্পদ…

কিছু যায় আসে না ;—তপনের শক্ত কণ্ঠ শোনা যায়,—দি প্রোলিটেরিয়েট হ্যাভ নাথিং টু লুজ্ বাট্ দেয়ার চেনস্। শিকল ছিঁড়তে গেলে এ সব হারাতেই হবে অনেক কিছু।

কিন্তু সেই শিকল কি ছিঁড়িতেছে? একদিনের জন্যও বন্ধ করিবে কি প্রোলিটেরিয়েট তাহার সব কাজ—তাহার নিজের পার্টির নামে? আর ইহার যদি প্রতিবাদ না হয়—মজুরদের পক্ষ হইতে, ছাত্রদের পক্ষ হইতে…

কেমন সংশয় ফুটিয়া উঠে সূর্যনাথের কথায়।

লাফাইয়া উঠে তপন,—তাহলে বুঝবে এসব জিনিস সত্যই শিকল হয়েছিল প্রোলিটেরিয়েটের পার্টির পক্ষে। এ মোহ ভঙ্গ না হলে আমাদের সর্বনাশ হত—আমরা কাগজ আর লাইব্রেরী আর নিম্নমধ্যবিত্তের রাজনীতিতে ডুবে যাচ্ছিলাম।

…দীর্ঘদেহ, শান্তচক্ষু, পিটর,—মহাযুদ্ধের অসংখ্য বীরপ্রাণের মধ্যেও ছিল মানবীয়তায় বলিষ্ঠ বীর। কিন্তু কে মনে রাখিয়াছে তোমাকে যুদ্ধের শেষে? প্রোলিটেরিয়াটের এই সংগ্রাম না বাধিতেই আমরাও তোমাকে ভুলিতে বসিয়াছি—বিদেশী বন্ধু ভারতীয় স্বাধীনতাবাদীদের…পীটার…

অমিত ভাবনায় ডুবিয়া গিয়াছিল। হঠাৎ সে শুনিল তপন জিজ্ঞাসা করিতেছে, 'দেশলক্ষ্মীর' ওরা জেনে যাবে নিশ্চয় আমি ধরা পড়েছি, কি বলেন? কিন্তু সংবাদটা 'কলেজে' দিতে পারা যাবে কি?

তাকাইয়া দেখিল অলোচনা অন্যপ্রান্তে চলিয়া গিয়াছে। আড্ডা-ও-আমোদপ্রিয় সৈয়দ আলীকে ঘিরিয়া বসিয়াছে সকলে। গল্প জমিতেছে। উগারই এই প্রান্তভাগে বসিয়া তাহারা দুইজনেই উন্মনা, অমিত আর তপন। তপনের কথা শুনিয়া অমিত বলিল: শক্ত কথা। কেন? কামাই-এর কথা ভাবছ? দ্যাখা যাক না—কতদিন রাখে কি করে ওরা আমাদের নিয়ে!—

তপন চুপ করিয়া রহিল। পরে বলিল, বাড়িতে ওরা বুঝে নেবে দু-একদিন পরেই। অবশ্য, কলেজে খবর দিলে ভাস্কর তা জেনে যেত, বাড়িতেও আর ভাবত না বেশি।

একটা নূতন বাতায়ন খুলিতেছে, তাহারই যেন আভাস পাইতেছে অমিত। দেশলক্ষ্মীর হরতালের যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে নয়। যেখানে খড়দহ-পেনেটির অধ্যাপক ব্রাহ্মণ গোলোক ভট্টাচার্যের স্নেহ-সদাচার-ঘেরা সাধারণ সংসার—সেই একান্ত পরিচিত আর অমিতের অতি-সামান্য পরিজ্ঞাত জীবন-যাত্রার দিকে এবার বুঝি তপনের মনের বাতায়নটি খুলিয়া যাইতেছে—এখানে, এখন, প্রেলিটেরিয়েটের সংগ্রাম যখন বাধিতেছে—এই গোয়েন্দা আপিসের নতুন করাঘাতে। সচকিত সহজ কৌতুকের সঙ্গেই এই অ-সহজ প্রসঙ্গটাকে স্বাভাবিক, সহজ, করিয়া তুলিতে হইবে অমিতের।

অমিত বলিল, একটু ভাবুনই না ওঁরা।

তপন ক্ষীণ হাসি হাসিল। কথা বলিল না।

অমিত বলিল, কে বেশি ভাববেন বলে তোমার এত ভাবনা, তপন?

এবার তপনও সলজ্জ স্নিগ্ধ হাস্যে হাসিল। অমিতের নূতন লাগিল সেই কর্মোন্মাদ তপনের মুখে এই সলজ হাস্য! কোথায় যেন নিজেকেও মনে হইল ইহার সহিত অপরিচিত—আর অংশীদার। জোর করিয়াই কৌতুকের কণ্ঠে আবার তপন বলিল, সংসারে আমাদের ভাববার লোক আছে, অমিত দা'। আমরা ত বাউণ্ডুলে লক্ষ্মী-ছাড়া নই। স্ত্রী আছে, পুত্র আছে, মা আছেন, বাবা আছেন, চাই কি বাড়িতে গাইগরু পর্যন্ত আছে—না নয় গোবিন্দ-মূর্তির কথা ছেড়েই দিলাম—তিনি ভাবনার অতীত বলে।

অমিত যেন একটা বহু পরিচিত পৃথিবীর রসোপভোগ করিতেছে শত অভিজ্ঞতার কৌতুকে।—হাঁ, গোবিন্দ ঠাকুরের কথা ছেড়ে দাও। তাঁর ভাবনা নেই, তুমি না থাকলেও তাঁর পুজো নৈবেদ্য ঠিক চলবে—যতদিন অন্যেরা আছেন। দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্র-বিপ্লবে তাঁর যাবে-আসবে না। বরং তুমি থাকলেই তাঁর অসুবিধা হবার কথা। গরুটারও জুটবে কিছু; কারণ, তিনিত গো-মাতা। মুসকিল হবে আর তাই ভাবনাও বাড়বে বরং স্ব-মাতার; এবং পিতার; আর যখন মূর্খের মত নিজের দাসখত লিখে দিয়েছ তখন তোমার শ্রীচরণের দাসীই বা ছাড়বেন কেন? তারপরে ছেলে আছে একটী? না, ইতি মধ্যে সেদিকে আরও সৌভাগ্য লাভ ঘটেছে?

কোথায় আর সে সম্ভাবনা হল? পড়ে গেলাম এসব পাল্লায়, আর না হল ধন-লাভ, না হল জন-লাভ।

ধন-লাভের ত্রুটিটাই কিন্তু বড় ত্রুটি। সেই বিচ্যুতিটা কত দূর গড়িয়েছে?

অমিতের কৌতুকের সুরেও এবার একটু উদ্বেগের রেশ আসিয়া লাগিয়াছে। তেমনি ভাবনার রেশ ফুটিয়া উঠিতে চাহে তপনেরও উত্তরে।

…এইরূপই নিয়ম। হাল্‌কা কথায় কতটুকু হালকা করিতে পারি আমরা মনের গভীর চিন্তাকে? পারি না, কিছুতেই পারি না। নিতান্ত স্থূল-প্রকৃতি ছাড়া কেহ ভুল করিবে না আমার কথা, তপনের কথা। তবু হাল্‌কা সুরেই বলা ভালো এই গভীর কথা। হাঁ হালকা সুরেই বলা চলে গভীর সত্য। কিন্তু সত্যই বলা যায় কি তাহা? লিয়ারের সামনে ফুলের কথা কি পরিহাস? জাকুস্‌এর কথাই কি হাল্‌কা? না, ভোগ-শ্রান্ত জীবনের তা বিরাগ? কিংবা ফলষ্টাফই শেষ পরিচয় সেক্‌সপীয়রের? হ্যমলেটে নয়? প্রোসপেরোতে নয়? এইত দেখিতে না-দেখিতে তোমার চিন্তা কেমন গম্ভীর হইতেছে। কেমন গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে তপনের কথা।…

তপন বলিতেছিল, একটু বিচ্যুতি ঘটেছে বৈকি? মা ভেবেছিলেন—ছেলে হাকিম হবে। বাবা জোর করলেন—হবে অধ্যাপক। শ্বশুর মশায় এসে সিদ্ধেসিস্‌ করলেন—'ডি, এস-সি' হোক, সরকারী কলেজে ভালো মাইনের

প্রোফেসর হতে পারবে। হাঁ, তখন গবেষণায় নেমেছি ; অনেক ছিল তাঁদের স্বপ্ন। আমারও তাই অদৃষ্টে পত্নীলাভ তখনি ঘট্‌ল। শ্বশুর মশায় আমাদের সমাজের ; তবে প্রোফেসারি ছেড়ে ইনস্পেক্‌টরি লাইনে গিয়েছেন। বরাবরই বিদেশে থেকেছেন। কাজেই, দেশের বাড়িতে তিনি অর্থোড্‌কস্‌ 'ব্রাহ্মণ মহাসভা', বিদেশের জীবন-যাত্রায় 'লিবারল' হিন্দু, মানে, একালের 'হিন্দুমহাসভা।' বিদেশেই মানুষ হয়েছে গৌরী। হাঁ, তিনিই শ্বশুর মহাশয়ের কন্যা। বিদেশে সে ইস্কুলে পড়েছে, কিন্তু কলেজে যায়নি। পাশও করেনি,—পাছে আমাদের সমাজে বিবাহে অসুবিধা ঘটে। জুতো পায়ে দেয় না আমাদের বাড়িতে। তুলে রাখে বাক্‌সে—ট্রেণ ছাড়লেই পরবে বাপের কাছে যেতে। আজকাল কোন্‌ ভদ্রলোকের মেয়ে খালি পায়ে চলে পথেঘাটে? সকালে উঠে আমাদের বাড়িতে স্নান সারে, চা খায় না, ঠাকুরের ভোগ সাজায়। কিন্তু গোবর ছুঁতে তার হাতের আঙুল কেমন রি রি করে। অন্তত সেমিজ পেটিকোট না হলেই তার নয়। এদিনে তা একটু ব্যয় সাধ্য ; কিন্তু শ্বশুই মশাই তা চালিয়ে দিতেন প্রথম দিকে। আর এত দিনে ব্রাহ্মণ সমাজেও ওসব পোষাক আর অচল নেই। না, আমাদের বাড়িতে তা নিয়ে কোনো কথাই ওঠে নি। উঠবে কেন? মায়ের বরং একটু গর্বও ছিল—তাঁর ছেলে ইংরেজি শিখে বড় লোক হচ্ছে ; বউমা বিদেশে মানুষ হয়েছে ; চালে-চলনে সভ্যভব্য ; ছেলের উপযুক্ত সে বউ না হলে হবে কেন? বাবার আপত্তি হয়ত ছিলই না। তা ভাঙতে শুরু করেছিল আমাদের যখন ইংরেজি পড়তে দিলেন তখনই। শ্বশুর মশায়কে বলেছিলেন, 'ও সব কিছু থাকবে না, জানি। সবই পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে, কালে। তা'ই নিয়ম।' তবু তাঁর কালের যতটুকু নিয়ম বাড়িতে চলছে গৌরীর তা পালন করতে হত। পালন করতে গৌরীর কষ্টও হয়নি। কয়দিনই বা এঁরা? আর কয়দিনই বা সেও এই গৃহে? আমি ডি,এস্‌-সি হব—শ্বশুর মশায়ের ধারণা,—কলকাতায় বা অন্যখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি চাকরি নিয়ে চলে যাব ; কোনো একটা শহরে থাকব,—গৌরীও পাবে আপনার অভ্যস্ত জীবন যাপন করবার মত সুযোগ। আপনার মন-মতো করে ঘর

সাজাবে, বিদেশে সংসার করবে,—সেই যা বলে 'মনে ছিল আশা'। আশাটা আমারও ছিল। 'অন্যায় নয়?'···তারপর, ওলট-পালট। জন্মাল স্বপন। আর, স্বপন জন্মাবার পর থেকেই গৌরীর শরীর খারাপ, কি সব অসুখ-বিসুখ জুটেছে। আমার সময়ও নেই, পারিও না। মা রাগ করেন। শ্বশুর মশায়ই একবার গৌরীকে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করালেনও কয়েকমাস। কিন্তু চিকিৎসার কথা ত নয়; টাকা-কড়ি অভাব-অনটনের কথাও শুধু নয়। অভাব-অনটন আছে। কিন্তু একটা বড় কথা—বাড়িতে এমন একজনও লোক নেই যার সঙ্গে গৌরী মন খুলে কথা বলে। গৌরী বলে, 'বড় একা-একা'। অথচ আমিই বা করি কি? বললে বুঝবে না,—কলেজ আছে, দশটা কাজ আছে। বরং এসব শুনলে রাগ করে। ভাবে আমি ওকে উপেক্ষা করছি— 'কাজটাই বড়, আমি কিছু নই'। কেমন হয়ে যাচ্ছে দিন দিন; মেজাজও ক্রমশই বিগড়ে যাচ্ছে। ছেলেটাও একটা প্রোবলেম্ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। মা কেন অমন করে থাকে, সে বোঝে না। যত এখন বড় হচ্ছে তত দাদা-দিদির কাছে ঠাঁই নিচ্ছে; মাকে এখন কেমন ভয়-ভয় করে। হাঁ, আমাকে অবশ্য পসন্দ করে। কিন্তু আমি বাড়ি থাকি কখন? করিই বা কি? এই ত দু'দিন বাড়ি যাই নি। কাল গিয়েছি সন্ধ্যায়, দেখলাম গৌরীও দু'দিনে এমন গুম হয়ে রয়েছে যে, তাকে দেখলে আমারই ভয় হয়। স্বপন বললে চুপে চুপে, 'তুমি থাকবে না, বাবা? মা বড় রাগ করছেন।' ওদিকে বাবাও দেখা হতেই ব্যথার সঙ্গে বললেন, 'পুলিশ তোমার খোঁজ করছে। তুমি বাড়ি নেই, বৌমারও বাড়াবাড়ি হচ্ছে।' মায়ের সঙ্গে ত শেষে ঝগড়াই করে চলে এলাম। মা রাগ করছিলেন, কী পেয়েছি আমি? 'সংসারের কথা ভাবতে চাও না। বেশ, ত না হয় না ভাবলে।' তাঁদের দিন গিয়েছে; দিন যাক। কিন্তু স্ত্রী-পুত্রের উপর এমন অত্যাচার কেন আমার? পরের মেয়ে, শেষটা আমার জন্য পাগল হবে নাকি?···

অনেক দূরে, অনেক দূরে সরিয়া যাইতেছে-গোয়েন্দা আপিসের সেই প্রহরী-পরিবৃত গৃহের এই বন্ধু-বান্ধবেরা, সেই তর্ক-আলোচনা, অতীত ও ভবিষ্যতের পরিকল্পনা। সরিয়া গিয়াছে 'দেশলক্ষ্মীর' সেই মজদুর আন্দোলনের উদ্বেগ

তরঙ্গ, সেই জন-তরঙ্গের শিখর-বাহী তপন ও কেষ্ট মল্লিক, রশিদ ও সুখারী ; মংগলী ও পার্বতী। উন্মুক্ত একটি দুয়ারের মধ্য দিয়া দেখা যায় ছায়া-পরিবৃত বৃক্ষ-সমাচ্ছন্ন মধ্যাহ্নের লর্ড সিংহ রোডের আঙিনা ও প্রাচীর। তাহা ছাপাইয়া, তাহা আচ্ছাদিত করিয়া উদিতা হইয়াছে এক স্বল্প পরিচিত সংসারের কোনো একটি তরুণী বধূ গৌরী—যাহাকে অমিত চক্ষে দেখে নাই, হয়ত দেখিবেও না ; যাহাকে তপনের সহকর্মীরা কেহ জানে না, গণনার মধ্যেও আনে না ; আর যাহাকে ফিজিক্‌সের ফার্ষ্ট'ক্লাশ, ফিলজফি-পড়া ভাবোন্মাদ তপনের উন্মত্ত জীবন-সাধনার মধ্যখানে কেহ স্থান দেয় নাই, দিবেও না —অসংলগ্না।

…'কাব্যের উপেক্ষিতা নও তুমি, তুমি জীবনের উপেক্ষিতা। ইতিহাসের ট্রাজিডি তুমি নারী, বাঙালী মধ্যবিত্তের, বিদ্রোহীর মাতা ভগ্নী, জায়া। তোমারই প্রতিনিধি যেন এই সামান্য বাঙালী বধূ, তপনের তরুণী পত্নী।…হয়ত সত্যই গৌরী সে, গৌরবর্ণা, সুন্দর মুখশ্রী ‥অমিত তাহাকে কখনো চক্ষে না দেখিলেও এখন দেখিতেছে। দেখিতেছে—তাহার চোখেও আহত অভিমানের ব্যথা, নিষ্ফল স্বপ্নের ক্ষোভ জ্বলিতেছে ; জ্বলিতেছে অবজ্ঞাত যৌবনের হাহাকার। কিন্তু তাহা কি শোনে নাই তপন ? না শুনিলে উহার প্রতিধ্বনি অমিতের কানে এ মুহূর্তে বহন করিয়া আনিল কে, গৌরী ?…কাহার মুখের হাসির ওপারেও আমি অমিত দেখিলাম চোখের ওই ব্যথিত অনুশোচনা ? দেখিলাম; আর উহার মধ্য হইতেও পাঠ করিলাম তোমার কাহিনী, তোমার মুখচ্ছবি, ওগো তরুণী বধূ গৌরী। দেখিলাম, আর জানিলাম ইতিহাসের ট্র্যাজিডি। সেই ট্রাজিডি তুমি নও, সেই ট্রাজিডি বরং তপনই ; ইতিহাসের সৃষ্টি-শতদলে যাহার হৃদয়-নিংড়ানো রক্তের ছোপ লাগিতেছে, লাগিবে, আরও লাগিবে। আর তোমার অশ্রুতে, তোমার দীর্ঘশ্বাসে, তোমার উচ্চারিত সাধ ও অনুচ্চারিত অভিশাপে মিলিয়া যাহার সেই সৃষ্টির একাগ্র পরম তপস্যা বারে বারে ব্যাহত হইবে, বারে বারে বিক্ষিপ্ত হইবে, বরাবর যাঁহার আত্মদান থাকিবে অসম্পূর্ণ।

তপনের উপেক্ষিতা গৌরী, তুমিই কি তপনের জীবনেরও অসম্পূর্ণতা নও ?

একালের জীবনের উপেক্ষিতারা, তোমরাই কি সহিতে পার একালের জীবনের সম্পূর্ণতা ?...

অমিত বলিল, তাই ত তপন, ভাবনার লোক শুধু জোটাওনি, ভাবনাও জুটিয়ে নিয়ে এসেছে।

সত্যই মাথা খারাপ না হয়ে গেলে হয় গৌরীর!

তপন করুণ দৃষ্টিতে তাকাইল। তারপর কি ভাবিল; নিজের মন হইতে কি চিন্তা যেন ঝাড়িয়া ফেলিল। টান হইয়া বসিয়া বলিল, 'মিছে সেই ভাবনা।' দেখলাম ত 'দেশলক্ষীর' অতগুলো মজুরের হরতাল; তাদেরই কি ঘরে স্ত্রী পুত্র নেই? রশিদেরও পাকিস্তানের বাড়িতে আছে তার গরীব মুসলমান ঘরের অসহায় জেনানা,—একটি ছেলে হয়েছে, আবার ছেলে মেয়ে হবে। আর পার্বতীরও ঘরে রয়েছে তার অচল স্বামী, আর অসহায় ছেলেমেয়ে। কিন্তু কোথায়, ভাবনায় তাদের কর্মশক্তি পরাস্ত হল না ত?

অমিত বুঝাইয়া বলিল, তারা মজুর—হু-হ্যাভ্-নাথিং টু লুজ বাট্ দি চেন্স্। আমরা মধ্যবিত্ত, মজদুর পার্টির হলেও মজুর নই—হু হ্যাভ এভ্রিথিং টু লুজ্, ইভ্ন্ দিস্ গিল্টেড্ চেন্,—মধবিত্তের ফ্যামিলি লাইফ্ এণ্ড ফ্যামিলি লভ্! মোটা বাঁধনের থেকেও অনেক বেশি শক্ত এই মমতার বাঁধন। দ্যাখো না গৌরার দশা। তাকে কি রশিদের কথা বলে বুঝতে পারবে? না, পার্বতীর কথাই সে শুনে বুঝবে?

অমিত সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে বলিল, না সে মুক্তিতে তুমি তপনই পারছ গৌরীর ভাবনা মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে? বলছ 'মিছে সেই ভাবনা?' কিন্তু জানছ কত মিছে তোমার সেই কথাটাও।

তপন একটু ক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া স্বচ্ছন্দ স্বরে বলিল, সয়ে যাবে। প্রথম প্রথম খুব লাগবে ওদের। তারপর সয়ে যাবে।—না?

একটা ভরসা চায় তপন, ভরসা চায় অমিতদা'র নিকটে।

সম্ভবত,—বলিল অমিত। আর মনে মনে বলিল, সত্যই যদি তাহা হয়, তাহাই যদি হয়? কিন্তু তখনো যদি তুমি আবদ্ধ থাকো তপন, যদি তোমাকে জেলে বসিয়া

বসিয়া দিন গুণিতে হয় মাসের পর মাস ? তখন—তখন সব চাইতে বেশি লাগিবে তোমার মনে এই স্বাভাবিক সত্যটাই—'গৌরীর সব সয়ে গিয়েছে'—সহিয়া উঠিয়াছে গৌরী তোমার অদর্শন ও তোমার বিরহ, সহিয়া উঠিয়াছে তোমার শিশু পুত্রও তোমার অনুপস্থিতি, সহজ হইয়া গিয়াছে তোমার আপন জনের জীবন-যাত্রায় তোমার এই অনুপস্থিতি ও অনস্তিত্ব। তখন কি তোমার সমস্ত আগ্রহ, উদ্যম, উদ্যোগের মধ্যখানটা হঠাৎ ফাঁকা হইয়া যাইবে না, তপন ?...

জীবনের উপেক্ষিতা তুমি গৌরী ?...কিন্তু জানো কি তপনের অসম্পূর্ণ জীবনের বেদনা, তাহার অসহায়তা ?

না, মধ্যবিত্তের এই জীবন যাত্রায় শুধু সুর'দের জীবন শীর্ণ শুষ্ক হয় নাই। গৌরীকেও শত বন্ধনে ঘিরিয়া ধরিয়া এই জীবনযাত্রা তপনদের জীবনকেও রাখিতেছে অসম্পূর্ণ। জীবনের উপেক্ষিতা তোমরা ? জীবন যে অসম্পূর্ণতা সহিতে পারে না কাহারও হাতে। তাই তোমরা এদেশের মেয়েরা জীবনে উপেক্ষিতা ; আর তপনেরা, এদশের পুরুষেরা, অসম্পূর্ণ।...

চার

ধৃত বন্দী আর আসিবে না হয়ত কেহ। বেলা বারোটা বাজিয়াছে। এতক্ষণে নিশ্চয়ই আসিয়া গিয়াছে যাহারা আসিবার। খাবার ব্যবস্থা হয় নাই এখনো। হইবেও না—যদি চেঁচামেচি না করা যায়।

অমিত বলিল, উদ্যোগী হও দিলীপ, যদি খেতে চাও। মঞ্জু, আধ ঘণ্টার বেড়ানো ত শেষ হয়েছে। এখন যদি উপোষ থাকতে না চাও তা হলে একটু চেঁচামেচি করো।

স্লোগান দোব ? তা হলে শুরু করো, দিলীপ—

মঞ্জু স্লোগানের জন্য উদ্যোগী হইল—"খাদ্য চাই, বস্ত্র চাই।"

তাস আনাইয়াছেন এক জোড়া সৈয়দ আলী সাহেব। সিগারেটও কয়েক প্যাকেট সঙ্গে আনিয়াছেন। জানেন জেলে ওবস্তু দুর্লভ। প্রাণ ভরিয়া এখানেই তবে সেবন করা যাক্। জন আটেক লোক আসিয়া খেলার চারিদিকে একত্র হইয়াছে। বসিবার জায়গাও নাই। আপিসের লোকেরা খোঁজ খবরও কেহ বিশেষ করিতেছে না। সিপাহীরা পাহারায় দাঁড়াইয়া আছে। শ্রান্ত, ঝিমন্ত, বিরক্তি তাহাদের চোখে মুখে। কাল রাত্রি হইতেই তাহারা অনেক ডিউটিতে রহিয়াছে। এখনো দ্বিতীয় সিপাহী দল আসিতেছে না কেন?

একবার সৈয়দ আলী হাঁক-ডাক করিলেন দিলীপকে লইয়া। খেলা রাখিয়া উঠিয়া গেলেন বাহিরে—একজন কাহাকেও তাড়া দিতে হয়। স্নান নাই, আহার নাই, দুপুর হইয়াছে, বসিয়া বসিয়া বিরক্তি আসিয়া যাইতেছে। অমিতকেও টানিয়া সঙ্গে লইলেন সৈয়দ আলী। কিন্তু কর্তৃপক্ষের কাহারও দেখা পাওয়া গেল না। পুলিশের বড় কর্তারা সেক্রেটারিয়েটে। ব্যবস্থা করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া কোনোরূপে সরিয়া পড়িল একজন মাঝারি গোছের কর্মচারী।

অমিত ফিরিয়া আসিয়া নিজস্থানে বসিল। ব্রিজে জমিয়া গিয়াছে ততক্ষণে অন্যেরা। সৈয়দ আলী স্থানচ্যুত হইয়াছেন, তাঁহার স্থান দখল করিয়া বসিয়া গিয়াছে এখন জন দুই তিন। তাহাতে কি? এখনো সৈয়দ আলীর স্থান হইবে। তাঁহাকে না হইলে খেলা চলে নাকি? খেলা কেন, পার্টিও জমে না; আড্ডা না জমিলে এদেশে পার্টি জমে? আর সৈয়দ আলী না হইলে আড্ডা জমে? খেলোয়াড়দের ঘিরিয়া অনেক বড় আরও এক দল খেলার উমেদার, দর্শক, পারিষদ। ইহাদের কলরব ও কলহে ঘর সরগরম। খেলোয়াড়দের অপেক্ষাও ইহারাই খেলায় বেশি মত্ত। কেহ কেহ চুপ করিয়া বসিয়া আছে অন্য দিকে। দুই একজন স্বতন্ত্র বসিয়া গল্প করিতেছে, আলোচনাও করিতেছে—তাহা হইলে সত্যসত্যই বে-আইনী হইয়াছে পার্টি। সে কি শুধু ভারত সরকারের মতানুযায়ীই হইয়াছে? আসলে হইয়াছে ইংরেজ ও মার্কিন প্রভুদের ইঙ্গিতেই। কিন্তু ভাগ্য তবু ভালো, সত্য সত্যই নেতৃস্থানীয়রা অনেকেই ধরা পড়ে নাই। আশ্চর্য রকমে সাবধান হইতে পারিয়াছে অনেকে। আর

নিতান্তই ভাগ্যবশে দুই একজনকে সাবধান করাও যায় নাই। আবার, দুই একজন শেষ মুহূর্তেও পুলিশ পার্টিকে ফাঁকি দিয়া তাহাদের চোখের উপর দিয়াই সরিয়া পড়িয়াছে। পুলিশও তাহার শোধ তুলিবার জন্য সদর আপিসে, এপাড়ার ওপাড়ার দপ্তরে, ছাপাখানায়, ট্রেড ইউনিয়নের আপিসে, কৃষক সভার ঘরে, যাহাকে পাইয়াছে তাহাকেই লইয়া আসিয়াছে।

·

অনেকক্ষণ খেলাটা দেখিয়া-দেখিয়া তথাপি বুঝিতে না পারিয়া কানাই হাজরা আসিয়া বসিল লম্বা বেঞ্চটায়। না, একটু ঘুমাইবার চেষ্টাই করা যাক্।

মাষ্টার সাহেবের সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করিয়াছে কানাই হাজরা। তারপরে আবার ভুলুবাবুর সঙ্গেও গল্প করিয়াছে। শেষে দাঁড়াইয়াছিল খেলার নিকটে। ক্ষুধা পাইয়াছে। পেট জ্বলিতেছে। শোয়া যাক্ বরং কিছুক্ষণ।

অমিত বলিল: কি হল হাজরা দা'? ঘুমুবার জায়গা পাচ্ছেন না?

লজ্জিত হইল কানাই হাজরা। বলিল, আপনাদের বিলিতী খেলা, কিছু বুঝতে পারলাম না।

এবার তাহা হইলে অমি'দা'র সঙ্গেই গল্প করা যাক্। পুরাণো একটা চেনা লোক অমিত কানাই হাজরার।

বছর চল্লিশ বয়স কানাই হাজরার। কানাই দক্ষিণের লোক। দরিদ্র কৃষকের ঘরে সে জন্মিয়াছে। নিজের জমি বলিতে তবু কম ছিল না তাহার বা তাহার বাপ মহিম হাজরার। খানিকটা বন্ধক পাইয়া জমিদারের গোমস্তা-মহাজন হাত করিয়া বসিয়াছিল। কবে তাহা পুনরুদ্ধার হইবে তাহার ঠিকানা নাই। কখনো নিজের জমিতে চাষ করিত মহিম, কখনো অন্যের জমিতে হইত সে ভাগ-চাষী। কখনো মথুরাপুরের দিকে ষ্টেশনে ট্রেনে চাপাইয়া দিত ব্যাপারী ব্যবসায়ী ফড়িয়াদের জন্য জমির শাক-সব্জী, ক্ষেতের ফসল, গাছের ফল। দরিদ্র কৃষকের সেই জীবন। কিন্তু তাই বলিয়া ভূমিহীন নয় মহিম হিসাব সে মুখে মুখে বলিয়া দিবে—কয় বিঘা খাসে আছে,—অবশ্য উহার পাঁচ বিঘায় চাষ করা চলে না। বর্ষায় ভাসিয়া যায়। গুয়াখালির নিচেকার

খালটা গাঙের সহিত মিলাইয়া না দিলে এই জমির এই দশাই হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া জমিটা ত মহিম হাজরার হাতছাড়া হয় নাই; মহিমেরই রহিয়াছে। আরও পুরো সাত বিঘা জমি সিংহ বাবুরা ভেড়ি কাটিয়া দেওয়ায় জলে ডুবিয়া যায়। উহাতে মাছের ইজারা লইয়াছে হাফিজ নিকারী। বহু টাকায় সিংহবাবুরা জমা দিয়াছে, আরও বহুটাকা হাফিজ লাভ করে। কলিকাতা যায় তাহার মাছের চালান। মহিম হাজরাই কতবার সেই মাছের চুপড়ি তুলিয়া দিয়াছে ষ্টেশনে—তাহারই জমির মাছ, কিন্তু জ'ল ত তাহার নয়, মাছও তাই তাহার নয়। ওখানকার পাঁচ-সাতশ বিঘা জমির এই অবস্থা। এই জমিটা তাই মহিম ছাড়িয়া দিতে চায়; মিথ্যা খাজনা গণিয়া আর লাভ কি? বাকী খাজনাতেই হয়ত উহা চলিয়া যাইত। কিন্তু সত্যই কি সিংহবাবুরা বরাবর ভেড়ি কাটিয়া দিবেন? মহিম আশা করে তাঁহারা একাজ করিবেন না। তাই এখনো সে জমি মহিমের আছে। খাজনাপত্র দিয়া মহিম সে জমিও রাখিয়াছে।—ভাগচাষী বা ক্ষেতের মজুর তাহাকে বলিলে সে তবে রাগ করিবে না কেন? বারো বিঘা জমির মালিক সে—মহিম হাজরা।

বাপের সহিত কাজ করিয়া করিয়া কানাইও বড় হইয়াছে। ভাগ্যক্রমে কাজ পাইল সে মণ্ডল বাড়িতে। মণ্ডলেরা বড় গৃহস্থ। খাশে জমি অনেক। গোলায় ধান আছে, পুকুরেও মাছ আছে কিছু, আর গোয়ালে গরু আছে অনেক। গরুর সেবা মেয়েরাই করে, মাঠে চরাইতে লইয়া যাইত কানাই। চাষের কাজেও কানাই ক্ষেত মজুরদের জলপান আনিয়া দিত। নিজেও এক-আধটুকু চাষে সাহায্য করিত। কিন্তু মণ্ডল কর্তারা ভালোবাসিত ছোকরা কানাইকে। বাড়ির পাঠশালার ছোটখাটো কাজও তাই দিল কানাইকে। সেখানে তাহার দুই এক মাসে অক্ষরও শিক্ষা হইয়া গেল; নামতা, কড়াকিয়া, গণ্ডাকিয়া সহজেই মুখস্থ হ'ল। তাই বিদ্যালয়ে পরিদর্শক আসিলে কানাই কোনো কোনো দিন ছাত্র সাজিয়াও বসিত; আবার তাহা ছাড়াও কোনো কোনো দিন হইত সর্দার পড়ুয়া। অক্ষর জ্ঞান, সংখ্যা জ্ঞান, কানাইর

সেখানেই হইল। তারপর মহিম হাজরা অসুখে পড়িল, কানাই তখন চলিয়া গেল ক্ষেতের কাজে। আজ ক্ষেতে কাজ করে, কাল বোঝা বহিয়া লইয়া যায় মণ্ডলদের বরোজের পান, কিংবা কলার দেয় চালান। ভালোই শিখিয়া উঠিল কানাই কলার চাষ, উহাতেই তাহার হাত খুলিয়া গেল। কানাই'রও কদর বাড়িয়া গেল। বুদ্ধি আছে, কাজেও কুড়েমি নাই।

জোয়ান ছেলে, বড় হইতেছে—মহিমের অসুখ, কানাইর মাও চায় ছেলের বিবাহ দিবে। কিন্তু টাকা পাইবে কোথায়? শত খানেক টাকা না হইলে মেয়েই মিলিবে না; তারপর খরচ-পত্রও আছে। সময় পাইলে অবশ্য বাপ-ব্যাটায় পরিশ্রম করিয়া টাকাটা তুলিয়া ফেলিতে পারিত। কিন্তু মহিমের ব্যারাম বাড়িয়া যায়, সে কাজ করিতে পারে না, একা কানাই করিবেই বা কি? তবু বিবাহ ত করিতেই হইবে;—জোয়ান ছেলে বিবাহ করিবে না? সেই সাত বিঘা মহিম বন্ধক রাখিল বিহারী ঘোষের কাছে—খাই-খালাসী বন্ধক। সুদটা চড়া, কিন্তু টাকা বেশি নয়। আর ধান চালের বাজার এখন বেশ গরম; এরকম দর থাকিলে চাষীর তত ভয় কি? জমি থাকিলে আয় হইবে, আর বন্ধকী জমি সুদে-আসলে খালাস করিতে কয় বৎসর দেরী? তিনশালে বন্ধক শেষ হইবার কথা, দুই শালেও হইতে পারিবে। ততদিন কানাই না হয় একটু বেশি খাটিবে মণ্ডলদের ক্ষেতেই, মজুরী পাইবে, খোরাকী পাইবে। কলার চাষে মুনাফা ভালো দাঁড়াইলে মণ্ডলেরাও কি কানাইকে বঞ্চিত করিবে? দরকার মত হিসাব পত্রও কানাই রাখিতে শিখিয়াছে তাহাদেরই কৃপায় পাঠশালায়। ব্যাপারীদের সঙ্গে কাজে কারবারে, বোঝা-পড়ায় মণ্ডলেরা কানাইকে পাঠাইবে। অতএব, ভাবনা কি?

বিবাহ হইল। শত দুই ছাড়াইয়া খরচাটা শত আড়াইতে উঠিয়া গেল। আসিল কানাইর নয় বৎসরের বউ গঙ্গা—নারাণীর মা। নারাণী জন্মিল অবশ্য অনেক পরে—ছ' সাত সাল পরে। কিন্তু তাহার আগে কত কাণ্ড ঘটিয়া গেল। সেই ছত্রিশ সাল গিয়া সাঁইত্রিশ সাল। ভাখ না-ভাখ কি হইল

ধান চালের বাজারের? দুই টাকা মণ দর নামিল ধানের; তারপর সাত-শিকা; তারপর দেড় টাকা; শেষ এক টাকায়ও ঠেকে না। তিন সালে সমস্ত ওলট-পালট। আসল ছাড়িয়া সুদও মিটেনো যায় না বিহারী ঘোষের। আগেকার বন্ধকী জমি ত কানাইর হাতছাড়া হইয়াছেই, এই জমিও যায়-যায়। বাকী জমিও এবার বন্ধক দিতে হইল; মহিম যে তখন মরিতে বসিয়াছে—তাহার চিকিৎসা-পত্র দরকার। কিন্তু আগে মরিল তবু কানাইর মা। আরও মাস দুই তিন পরে মরিল মহিম হাজরা। তখন খাশে জমি রহিবে কি করিয়া কানাই'র? টাকা ধার করিতে হইল, সুদের হার এখন বেশিই হইবে। টাকা কি চাষী সহজে ধার পায় এইরূপ দুঃসময়ে? তবু এক বছর বাজারে সাচ্চা দাম পাইলে কানাইর ভাবনা আবার কি? এই ফসলটা দাম পাইল না, আগামী ফসলটা দাম নিশ্চয়ই পাইবে:—ভাবিল কানাই হাজরা।

পৃথিবীর কোথায় কোন চক্রান্তর ফলে কি ঘটিল কানাইর তাহা বুঝিবার সাধ্য নাই। সালটা বাঙ্গলা সাঁইত্রিশ—বণিক-শাস্ত্র মতে হয়ত ১৯২৯এর শেষদিক কিংবা ত্রিশেরই প্রারম্ভ। দুনিয়ার ডলার-পতিদের তখন চক্ষুস্থির। সত্য সত্যই কি তবে ধনিক-তন্ত্রের সপ্তডিঙ্গা পড়িয়া গেল আর্থিক সংকটের ও বাজার-বিপর্যয়ের কালীয় দহে? এবং বাজার মন্দার এই ডুবাচরে আটকাইয়া পড়িবে বাড়তি-মালের বোঝাই নৌকা? ডলারের দেশে লাগিল বিশ্বের আর্থিক সংকটের অনিবার্য আঘাত। ওয়াল ষ্ট্রীটের কোটিপতিদের ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটিতেছে। এক-এক ফুঁয়ে সাত রাজার ঐশ্বর্য্য উড়িয়া গিয়াছে। জমি আর ফসলশুদ্ধ ভরা-ডুবি হইতে লাগিল মার্কিন কৃষকের ভাগ্য। মন্দা, মন্দা, মন্দা। বাজারে মাল আছে, ক্রেতা নাই; ফসল আছে, চাহিদা নাই। ক্রেতা নাই যখন, তখন ডুবাইয়া দেও, চাহিদা নাই ত পুড়াইয়া ফেল গম, তুলা ক্ষেতের ফসল; আগুনে-জলে নষ্ট করিয়া দাও কফি; সমুদ্রে ডুবাইয়া দাও কমলালেবু। পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ কানাই'র মত; না পাইতেছে খাইতে, না পাইতেছে পরিতে। তাহারা হয়ত গম পাইলে বাঁচে, তুলা পাইলে পরিতে

পায় কাপড়, কফি কমলানেবু পাইলে হাতে পায় স্বর্গ। কিন্তু মালিকের মুনাফা জোগাইয়া উহারা এই সব জিনিস কিনিবে কি করিয়া? মুনাফা ছাড়া জিনিস ছাড়িলে যে মালিকের পক্ষে বাজারটাই মাটি হইবে। অতএব জিনিসই নষ্ট করিয়া ফেলা উচিত; মুনাফার হার না হইলে এই মাত্রায় বজায় থাকিবে না। তারপরই, ক্রেতা যখন নাই তখন মাল উৎপাদন কমাও; উৎপন্ন মালও নষ্ট করিয়া বাজারের ভার কমাও; ফসল চাষ করো কম, আর যাহাও ফলে সেই উৎপন্ন ফসল পুড়াইয়া ফেলিয়া বাজার খালি করো। শেষে, দেশ বিদেশের মাল আমদানীও কমাও, কাঁচা মালের চাহিদাও কমাও। কমাও ব্যবসা-পত্রের সমস্ত লেনদেন, কাজ করবার।...কোথা দিয়া তাই চটের চাহিদা কমিল, কোথা দিয়া কাঁচামালের রপ্তানি কমিল, কেন দেখিতে দেখিতে ধান-চাল গম তিসি সমস্ত কৃষিজাতের দাম নামিয়া গেল; নামিল ত নামিল তাহা আর কেন চড়ে না;—দেবতার দয়ার অভাব নাই,—মাঠভরা ধান, ক্ষেতভরা ফসল সবই আছে!—কিন্তু বাঙলা দেশের চব্বিশ পরগনার কানাই হাজরা ইহা কেমন করিয়া জানিবে—তাহার ভাগ্য শত লক্ষ নর-নারীর ভাগ্যের সঙ্গে জড়াইয়া গিয়াছে, হইয়া উঠিয়াছে জন কয় ধনপতি সওদাগরের ব্যবসায়ের সওদা; তাহাদের মুনাফাদারীর খেলার কাঁচা মাল,—আর সে—কানাই হাজরা—না চাহিলেও হইয়া উঠিয়াছে ইতিহাসের বঞ্চিত-বিদ্রোহের এক ভাগীদার!

কানাইর মনে হইল এমন আকাল দেশে আর আসে নাই। এক কানাকড়ি তাহার হাতে আসে না, ধান চালের দাম আর বাড়ে না। দিন মজুরী করিবে নাকি কানাই? গরীব চাষীর ছেলে কানাই; ভাগচাষীর কাজ করিতেছে, মণ্ডলদের কলার চাষে মজুরী পাইয়াই খাটে; কিন্তু তাই বলিয়া জনমজুর হইবে নাকি শেষ পর্যন্ত? তাহার জমি আছে; খাইখালাসী বন্ধক মুক্ত হইয়া তাহা এই চার সালে তাহার হাতে আসিবারও কথা। কিন্তু বিহারী ঘোষ তাহা মানিবে না। হিসাব করিতে জানে বুঝি কানাই? খুব লায়েক হইয়াছে বুঝি—দুই দিন পাঠশালায় গিয়া! বেশ দেখুক কানাই কত ধান এই কয় বৎসরে উৎপন্ন হইয়াছে; কত হইয়াছে এই দুই বৎসরে কানাই'র কর্জের

আসল, আর কত কানাই'র সুদ, তস্য সুদ। ধানের এই দামে সুদ আর তস্য সুদই এখন শোধ হয় না; তাহাতে আবার মূল। বিহারী ঘোষ ঠিক করিয়াছে জমিটা আর কানাই'র নিকট ভাগচাষে দিবে না; সে নিজেই চাষবাস করিবে—মুনিষ খাটাইয়া চাষ করিলে ধানও উৎপন্ন হইবে বেশি। নিজের গোলায় ধান উঠিলে সে ধান লইয়া ব্যাপারীরাও যাহা খুসী করিতে পারিবেনা। তখন উচিত দর দিতে হইবে; না দিলে গোলার ধান ছাড়িবে কেন বিহারী ঘোষ? অর্থাৎ, কানাই'র পক্ষে জমিটা হাতছাড়া হইয়া যায়-যায়। একটা কিছু করা উচিত। খোশামুদি বৃথা হইল। কাঁদা-কাটা করিতে কানাই জানে না; করিলেও বিহারী ঘোষ গলিত না। মণ্ডল বাড়ির লোকেরাও কানাই'র হইয়া বিহারী বাবুকে বলিয়া কহিয়া দেখিয়াছে; ফল হয় নাই। মামলা করিবার জন্য কানাই দুই-একবার লাফ ঝাঁপ দিল, কিন্তু সে টাকাই বা কোথায়? আইনের জোরই বা কই? মণ্ডলবাবুদের কাণ্ডজ্ঞান আছে; কানাইর বাড়াবাড়িতে বেশি উৎসাহ তাহারা দিতে চাহে না। তাহাদেরও দুই একঘর চাষীর সঙ্গে এইরূপ গোলমাল বাধিয়াছিল। তবে মণ্ডলেরা ভালো লোক, স্বচ্ছল গৃহস্থ, ধর্মভীরু; কাহাকেও প্রাণে মারিতে চাহেনা। পরের জমি আত্মসাৎ করিতে তাহাদের ইচ্ছা নাই। ন্যায্য টাকা পাইলে মণ্ডলেরা কৃষকদের জমি ছাড়িয়া দেয়। এই মন্দার দিনে কি সে-দিনের ধার আর কেহ পুরাপুরি সুদে-আসলে শোধ দিতে পারে? না, বন্ধকী জমি আর সেই ভাবে উদ্ধার করিবার আশা করিতে পারে? মণ্ডলেরা তাহা বুঝে। তাই দুই একজন খাতককে উল্টা কিছু টাকাও তাহারা দিয়া দিয়াছে, খাতকেরাও জমি মণ্ডল বাবুদের নিকট বিক্রয় করিল বলিয়া লিখিয়া দিল। বিহারী ঘোষ অবশ্য মণ্ডলদের এই পরামর্শ কানে তুলিবে না। কিন্তু তাই বলিয়া কানাইর বাড়াবাড়িই কি ভালো? 'মামলা করিব': না, মণ্ডলেরা তাহা ভালো মনে করেন না।

এমনি সময়ে,—সে বোধ হয় বাঙালা বিয়াল্লিশ সালে,—বাধিয়া গেল কৃষক সমিতির আন্দোলন। বিহারী ঘোষের বিরুদ্ধে সে অঞ্চলে একটা জোট পাকিয়া উঠিল। সিংহবাবুরা ভেড়ি কাটিয়া জমি ডুবাইয়া দেয়, উহা লইয়াই প্রজাদের আপত্তি শুরু হয়। আর মণ্ডল বাড়িরই একটি ছেলে নতুন কলেজে

পড়িত, সে কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইল—তাহাদের স্বজাতিরই অনেক গরীব চাষী সিংহবাবুদের এই লোভের দায়ে বছরের পর বছর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। জমি ইস্তফা দিয়া কেহ কেহ দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে 'লাটে'। গণেশ মণ্ডল সামনে পাইল হেমন্ত বাবুকে। হেমন্ত মাইতিও সেবার লবণ আন্দোলনে জেল হইতে ফিরিয়া ঠিক করিয়াছে—এখন গঠনমূলক কাজ করিবে। অর্থাৎ সে ল' কলেজে পড়িতে গেল; উকীল হইবে ঠিক করিল; এবং গ্রামের পাঠশালায় গরীব চাষা-ভূষাদের ডাকিয়া তালগাছ কাটিবার প্রয়োজনীয়তা, চরকা কাটিবার উপকারিতা ও অহিংসার মাহাত্ম্য বুঝাইতে লাগিল। আর সঙ্গে সঙ্গে এখন ঠিক করিল সিংহবাবুদের দৌরাত্ম্য হইতে প্রজাদের উদ্ধার করিবে—গণেশ মণ্ডলও আছে সঙ্গে। জেলে হেমন্ত সহকারী পাইয়াছিলেন মণ্ডলদের এই মধ্যম ছেলেকে। গণেশকে তিনিই লাগাইয়া দিলেন তাহার গ্রামের কাজে, আর তাহাকে রাজী করিয়াছিলেন কলেজে আবার আই-এ পড়িতে।

গণেশ মণ্ডল তাই কলেজে ভর্তি হইল। কাজে লাগিতে লাগিতে সে ঝুঁকিয়া পড়িল সিংহ বাবুদের বিরুদ্ধে প্রজার কাজে। চাষীদের মজুরদের 'সংগঠন' করিতে না পারাতেই যে স্বরাজ সম্ভব হইতেছেনা, জেলে বসিয়া গণেশ এই আলোচনা অনেকের নিকট শুনিয়াছে। চাষীরাইত দেশের শতকরা আশীজন। তাহাদের লইয়াইত দেশ। কিন্তু এই সংগঠনটা কি ভাবে করিবে গণেশ তাহা তবু বুঝিল না। জানিত, সকলকে কংগ্রেস সভ্য করিতে হইবে, আর বলিতে হইবে চরকা কাটিতে। কলেজে এখন শ্যামলের সঙ্গে নতুন পরিচয় হইল। তাহারা তর্ক করিল, বলিল, কৃষক সমিতি গঠন করো। দুই একবার সিংহদের বিরুদ্ধে কথা বলিতেই মণ্ডলদের এই মধ্যম বাবুর জন্য কৃষকেরা নিজেরাই আসিয়া খোঁজ করিল। জেল-খাটা মানুষ, অনেকের জন্য অনেক কিছু করিবেন তাঁহারা,—এই গরীবদের জন্য কি করিলেন? 'সমিতি' করিতে হইবে? বেশ 'সমিতি' না হয় করিল কৃষকেরা। হাঁ, সভ্যও হইল কংগ্রেসের। চাঁদা দিতে হইবে? বেশ, পঞ্চায়েতের ট্যাক্স্ যখন তাহারা দিবে, তখন না হয় গণেশ মণ্ডল দুই পয়সা করিয়া প্রজাদের জন্য 'সমিতির' ট্যাকস্ বেশি গ্রহণ করিবে। কিন্তু কাজটা

তাহাদের করিতে হইবে কি? গণেশও তাহা জানে না। কলিকাতার বন্ধুদের বলিল, 'চলো'।

মণ্ডল বাড়িতে সভা হইবে। কলিকাতার লোকদের মুখে নতুন কথা শুনিয়া কৃষকেরা অবাক। এই কথাই বুঝি শুনিতে চাহিতেছিল, কিন্তু কেহ তবু শুনাইতেও আসে নাই। তাহাদের আশা হইল, এবার একটা কিছু হইবে।

প্রশ্ন করিল, এখন করা যায় কি?

শ্যামল বলিয়া বসিল, কেন? ভেড়ি কাটতে দেবেন না।

আরও অবাক প্রজারা: সে কি করে হবে? দারোয়ান পাইক আছে না বাবুদের কাছারিতে!

তারা ক'জন? আপনারা পনেরটা গাঁয়ের চাষী—এরা দু'জন কি চারজন। আপনাদেরও ত হাত পা আছে।

মারামারি বাধবে যে!

বাধলে বাধবে।—সহজ কণ্ঠে বলেন সৈয়দ আলী।

ফৌজদারী হবে, থানা পুলিশ হবে।

নইলে দেওয়ানী করে জমি পাবেন নাকি? না, কাঁদা-কাটা করে এখন তা পাচ্ছেন?—বুঝাইয়া বলিতে চাহেন মাষ্টার সাহেব।

কথাগুলি নূতন শ্যামলদের পক্ষে—পুঁথিতে পড়া। অসম্ভব রকমের নূতন কৃষকদের পক্ষে। কিন্তু অনেকে বৎসরের অভিজ্ঞতা, বৃথা কাঁদাকাটা, হাঁটাহাঁটি, প্রভৃতির ফলে কথাটা সেই গরীব কৃষকদের মনে ইহার অনেকদিন আগেই ঠাঁই পাইয়াছিল। তাই ইহার যাথার্থ্য ও যুক্তিযুক্ততা সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ ছিল না। বরং নিজেদের মনের কথাটা তাহারা বলিতে পারিতেছিল না, এবার শুনিতে পাইয়া উহাকে নিজেদের কথারূপে চিনিয়া লইতে পারিল।

আর,—অমিত জেল হইতে ফিরিয়া দেখিল,—আগামী দিনের সত্য যেন বর্ত্তমানের গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইতেছে।

অবশ্য তখনো সে সত্য অপরিচিত, দুর্ব্বল, অনিশ্চিত-গতি। জন্ম যে লইতেছে তাহাই বা জানিবে কে? জানিবে তাহারা, যাহাদের মধ্যে সে সত্য জন্মিল,

সিংহ বাবুদের হতভাগ্য প্রজারা; তারপর জমিদারের গোমস্তা বিহারী ঘোষের খাতকেরা, শোষিত-চাষীরা।

সেবার ভেড়ি-কাটা লইয়া দাঙ্গা বাধিতে-বাধিতে তবু বাধিল না। কিন্তু প্রজারা একজোট হইয়া দাঁড়াইল। সিংহবাবুরা প্রথম ভাবেই নাই—এত সাহস হইবে তাহাদের। যখন জানিল, তখন নায়েব গোমস্তা থানায় গেল। দারোগাকে সঙ্গে আনিল। সব স্থির করিয়া যখন সে প্রস্তুত, তখন গণেশ মণ্ডল হেমন্তবাবুকে গিয়া ধরিল—লইয়া আসিল ইনজাংশন। দেওয়ানীর জোরে সাময়িক ভাবে ভেরি-কাটা বন্ধ রহিল। দাঙ্গা বাধিল না। কিন্তু প্রজাদের বুকের সাহস উহাতেই তিনগুণ হইয়া গেল। চারিদিককার গ্রামের চাষীরা ভিড় করিয়া আসিল। গণেশ মণ্ডলের বাড়িতে তাহাদের দরবার লাগিয়াই আছে।—কলিকাতার বাবুদের ডাকিয়া একটা ব্যবস্থা করুন 'মেঝ কর্তা' এই সব গাঁয়ের চাষীদেরও।

মণ্ডল বাড়ির সেই বৈঠকে প্রথম হইতেই কানাই উপস্থিত হইত, মেঝবাবুর হইয়া সে বাঁশ বাধিয়াছে, চেয়ার টানিয়াছে,—সভা হইবে। কানাইরও উদ্যোগ উৎসাহ বাড়িয়া গেল।·· মনে আছে অমিতের সেই কানাইকে প্রথম দেখা।

বর্ষা কাটিয়া পৌষ মাসে পৌছিতে পৌছিতে কানাই হাজরা গণেশের পাকা সাকরেদ হইয়া উঠিল। কলিকাতার বাবুরা বলিয়াছেন—জমির ধান তাহাদের। বিহারী ঘোষের বিরুদ্ধেও জোট বাঁধিয়া দাঁড়াইল তাহারা বঞ্চিত কৃষকেরা। কিন্তু বিহারী ঘোষ ত শহর-বাসী সিংহবাবু নয়, পাকা লোক। সে ভালোকরিয়া ব্যবস্থা করিল, থানা আগেই হাত করিয়া আসিল। জন-মজুরও ঠিক করিল, দারোয়ান-পাইকের অভাবও হইল না। তাই ছোটখাটো দুই একটা গোলমাল বাধিতেই থানার দারোগা মারপিট করিয়া দাঙ্গা ফ্যাসাদ থামাইতে গেল। কানাইও তাহাতে ধরা পড়িল; একসঙ্গে জন সাতেক তাহারা মহকুমার হাজতে বন্ধ হইল।

ধান-কাটার ব্যাপারে প্রজারা শান্তি-ভঙ্গ করিতে যাইতেছে, অতএব শান্তি-ভঙ্গের দায়ে কানাইর বিরুদ্ধে মামলা হইবে। ঘরে তখন স্ত্রী অন্তঃস্বত্ত্বা; শ্বশুর-

বাড়িতে তাহাকে লইয়া যাইবার কথা। কি যে হইল, জেল হাজতে বসিয়া কানাই বুঝিতে পারে না। জামিন পাইলে হয়, কিন্তু মহকুমার হাকিম তাহাদের তিন জনের জামিনের দরখাস্ত নামঞ্জুর করিয়া দিলেন। বাকী-চার জনকে জামিন দিলেন। অনেক করিয়া কানাই মেঝবাবুকে বলিয়া পাঠাইল। গণেশও কম চেষ্টা করিল না। মোক্তার লইয়া জেলে সে দেখা করিল! কাগজ পত্র স্বাক্ষর করাইয়া লইল, সদরে আপীল করিবে জামিনের জন্য। এবং সংবাদটা গণেশই দিয়া গেল—কানাই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে, তাহার একটি মেয়ে জন্মিয়াছে, ভালো আছে কানাইর স্ত্রী ও শিশুকন্যা। সে-ই কাতুর জন্ম।

আরও মাস খানেক পরে যখন জামিন পাইয়া কানাই ও তাহার বন্ধুরা জেল হাজত হইতে বাহির হইল তখন তাহাদের উল্লাসের সীমা নাই। জেলের যাতনা কষ্ট শেষ হইল ভাবিতেই যেন তাহারা উৎফুল্ল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা কথা তাহারা বুঝিল—বিহারী ঘোষ আর করিবে কি? 'কথায় কথায় থানা—পুলিশের ভয় দেখায় উহারা। কিন্তু দেখলাম ত উহার সব খানিই। ঘরে অন্তঃসত্ত্বা বউ, একা-ফেলে তাকে আসতে হল। এর বেশি আর কিই বা করবে জেলে?—দেখলাম ত তোমাদের জেলখানা।' কষ্টের স্মৃতিটা দিনে দিনে ঝাপসা হইয়া গেল, ভয়-ভাবনাও সঙ্গে সঙ্গে উবিয়া গেল—জেলের ভয়ই বা অত কি?

ঘরে ফিরিয়া কানাই দেখিল মেয়েকে—অতটুকু একটা নতুন মানুষ তাহার সংসারে। কেমন সে আশ্চর্য হইল, তাহার মজা লাগিল। বউ বলিল,—'মেয়েটা অপয়া। জন্মিল যখন বাপ তখন জেলে,—ঘৃণা লজ্জার কথা।' কানাই বলিল—'অপয়া ত তুই-আমি। তুইও পারলি না আমাকে ধরে রাখতে, আমিও পারলাম না পুলিশকে ফাঁকি দিতে। কিন্তু, দ্যাখ, মেয়েটা জন্মাল—আর জেলের ফটক খুলে গেল। এই কংস-কারাগার থেকে আমাদের সকলকে মুক্ত করলে ত ও-ই। ওই ত কাত্যায়নী।'

কাতুকে কানাই ছাড়িতে চাহে না আর। মামলা মোকর্দ্দমার হাঁকাহাঁকি আছে। কাজকর্মের জন্যও এদিকে ডাকে মণ্ডলের বাড়ির লোকেরা। গণেশ অতটা সাহায্য করিল কানাইদের; অন্তত মণ্ডলদের কলার চাষটায় কানাই

একটু নজর দিক,—হাত লাগাক জন-মজুরদের সঙ্গে। হাঁ, নিজের ক্ষেত তাহার আছে, চাষ-বাস আছে, কিন্তু তাহাতে কানাইর বৎসরের খোরাক ত হইবে না। আর ভাগচাষেও তাহাকে এখন বিহারী ঘোষ বা অন্য কেহ কোনো জমি দিবে না। বাঁচিতে হইলে তাহাকে মণ্ডলদের নিকটই অনুগ্রহ গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা অগৌরবেরও নয়। মণ্ডলেরা স্বজাতি; বরাবরই তাহারা কানাইর মুরুব্বি। কানাই'ত তাহাদেরই কৃপায় মানুষ। আর এখনো গণেশ কি কম করিল তাহার জন্য? কী দৌড়াদৌড়ি, ছুটোছুটি! পয়সাই কি খরচ করে নাই? সে খরচপত্র দিতে হইবে বৈকি কানাইদের এবার ক্রমশঃ।

কিন্তু কোথায় তাহাদের সে টাকা? কলিকাতার বাবুরা বলিতেছেন, সমিতি দিবে। কৃষকদের সংঘ করো, তাহারাই চাঁদা তুলিবে, নিজেদের মামলা মোকর্দমার খরচ দিবে।

গণেশ বলে, ওনারা বোঝেন না। সমিতি কই? পুলিশের এই জবর-দস্তির মুখে কেউ সভ্য হবে না। সব দূরে দূরে থাকে। অবশ্য গোপনে গোপনে সবাই আবার বৈঠকও করে।—জেলের ফেরত কানাইদের দেখিয়াই ভরসা তাহারা পাইয়াছে 'এইত কানাইরা ফিরে এসেছে। জেলে কষ্ট দিয়েছে?'

কানাই বলে, কষ্ট আর বিশেষ কি? খাটুনি আছে; কিন্তু খেতে দিয়েছে—দু'বেলা ভাত, নেহাৎ কমও নয়, তবে আবার কি চাই চাষীর? এক কষ্ট আছে, বিড়ি তামাক কিছু নেই। যেমন তেমন তাড়িও এক ভাঁড় পাওয়া যায় না।

কিন্তু আর সমিতি করিয়া সভ্য হইয়া কি হইবে?

উৎসাহ লইয়া কানাই গ্রামে বাড়ি ফিরিয়াছিল। কিন্তু মেয়েটার মায়াও তাহাকে কেমন পাইয়া বসিতে লাগিল। বউও এবার বারণ করে। একলা মেয়ে মানুষ সে; এভাবে সংসার আগলাইতে সে পারিবে কেন? তিন মাস কানাই ছিল না, তাহার মধ্যে দেখুক না কত কি ঘটিয়া গেল। এদিকে জামিন মুচলিকার হুকুম হইয়াছে; কানাইও তারপরে বেশি বাড়াবাড়ি করিবে কি করিয়া?

বাড়াবাড়ি থাকুক, কানাই'র কাজের ঝোঁকই কমিয়া গেল। ক্ষেতে যায়,

জোগান দেয় কোনো কাজে; মণ্ডলদের পীড়াপীড়িতে কলার চাষেও হাত লাগাইতে হয়। কিন্তু ছুটিয়া আসিয়া সে ঘরে দেখে তাহার সেই ছোট্ট, কয়েক মাসের কাতুকে। ঘরের দাওয়ায় মাদুরে-কাঁথায় সেই এক রত্তি মেয়েটাকে দেখিতে বসিয়া কানাই আর উঠিতে চাহে না। কাজকর্মে কেমন মন লাগে না। জমিটা হাত-ছাড়া হইয়া যাইতেছে, ফসল তাহার ভাগে কম পড়িবে না? এই ক'মাস মণ্ডলেরা ধান ধার দিয়াছিল; ফসল উঠিলে তাহা কাটিয়া লইবে সুদ শুদ্ধ। এই সব কথা যেন ভাবিতে ইচ্ছা করে না। কিন্তু না ভাবিয়া পথ কোথায়? সংসার চলিবে কিরূপে? আগে দুইজন ছিল, তাহাতেই চলিত না। এখন আবার এই আশ্চর্য ছোট্ট মেয়েটা আসিয়াছে। অবশ্য উহার জন্য এখনো বিশেষ কিছু দরকার নাই, কিন্তু দরকার হইবে একদিন। কানাই উঠিয়া পড়ে দাওয়া হইতে, কই কি কাজ আছে মণ্ডলদের বাড়িতে? চৈতালি ফসলের দিন গিয়াছে, বৈশাখের দিন আসিয়াছে। কানাই ক্ষেতের কাজে লাগিল মহা উৎসাহে। কিছু দিন কাজ করিয়াই কানাই আবার কিন্তু ঢিলা দেয়। সিংহদের ভেড়ি লইয়া আবার একটা গোলমাল পাকাইতেছে। গণেশ মণ্ডল তাহাকে ডাকিয়া পাঠায়। কানাইও বোঝে কাজটা জরুরী। কিন্তু তবু বৈঠকে বেশিক্ষণ বসিয়া থাকিতে উৎসাহ পায় না। সেই ছোট্ট মেয়েটা করিতেছে কি? হয়ত ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া হাসিতেছে। অদ্ভুত সেই দেয়ালি! কানাই আর বসিতে পারে না। পালাইয়া আসে বৈঠক হইতে। গণেশ বিরক্ত হয়। মেঝ কর্তার নিকট হইতেও কানাই পলাইয়া পলাইয়া ফিরে।

বৎসর ঘুরিয়া আসিল। আবার বিহারী ঘোষের সঙ্গে ফসল-কাটা লইয়া কৃষকদের গোল বাধিতেছে। এবার কানাই না গিয়া পারে না। বিহারী ঘোষ তাহার জমিটা গিলিয়া খাইয়া বসিয়া আছে, উহা উদ্ধার করা চাই। কিন্তু সকলের আগে গিয়া দাঁড়াইতে সে আর উৎসাহ পায় না। জামিন মুচলিকার মেয়াদ এখনো শেষ হয় নাই; ইহারই মধ্যে আবার ফৌজদারীতে জড়াইয়া পড়া কি ঠিক? তাহা ছাড়া আবার ছোট্ট মেয়েটার মুখ মনে

পড়ে। হাঁটিতে শিখিয়াছে সে, কথা বলে আধ-আধ, বলে 'বাব্বা'। উহাকে ছাড়িয়া আবার জেলে যাইতে হইলে—পারিবে না তাহা কানাই।

আন্দোলন এবার জোর ধরিল না; তবু গোলমাল হইল। শেষ পর্যন্ত তাই হেমন্ত বাবুকে মধ্যস্থ করিয়া একটা আপোষ করিয়া ফেলিল চাষীরা। কি করিবে আর? গণেশ মণ্ডলদের যে খাতকেরা তাহাদের বন্ধকী জমি নিজেরা লিখিয়া পড়িয়া দিয়া এতদিন খুশী ছিল, এখন তাহারাও সেই সব জমি দাবী করিতেছে—মণ্ডলেরা তাহাদের জমির মালিক কি করিয়া হয়? এ বড় বেয়াড়া আব্দার—বে-আইনী কথা। হেমন্ত মাইতিও বিরক্ত হন।

বিহারী ঘোষ অত্যাচারী মুনিব, জমিদারের সে গোমস্তা, আবার সে-ই মহাজনও। সেই সুযোগেই সে অত্যাচার করে, কৃষকদের জমি সে আত্মসাৎ করে। সেও ত বলে—'আইনতই কাজ করি, বে-আইনী কাজ করি কোনটা?' মণ্ডলেরা নিজেরাও চাষী, হাল-বলদ, গোলা-পুকুরে তাহারা বিহারী ঘোষের অপেক্ষা বেশি ছাড়া কম ভাগ্যবান নয়। মহাজনীও তাহাদের যথেষ্ট, বন্ধকী জমি তাহারাও সেই সূত্রে কম আত্মসাৎ করে নাই। তাহারাও বলিতেছে, 'আইনতই কাজ করি। বে-আইনী কাজ করিলে লক্ষ্মী সহ্য করবেন না।'

এতদিন লোকে তাহা শুনিয়াছে, তাহাতে বিশ্বাসও করিয়াছে।

কিন্তু অভাব বড় জ্বালা। সেই তাড়নাতেই প্রথম চাষীরা দাঁড়াইতে চাহিল বিহারী ঘোষের বিরুদ্ধে। দাঁড়াইতে চেষ্টা করিতেই কৃষকেরা দাঁড়াইতে গিয়া বুঝিল—'জমির মালিক যদি আমরা চাষীরাই, তবে আমার জমি মণ্ডলেরাই বা হাত করে কোন নিয়মে?' প্রশ্নটা উঠিল, ক্রমে তাহা কানেও পৌছিল মণ্ডলদের। দুই একটা চাষী ধারে ডুবিতেছে। জমির ফসল উঠিলে এতদিনে বরাবর সুদের কিছুটা শোধ তাহারা করিতে আসিত। এবার আর তাহারা মণ্ডল বাড়ির দিকে মুখ ফিরায় না। খবর পাঠাইলে বলে—'বাড়ি নেই'। পথে দেখা হইলে বলে—বাড়ি আসিয়া দেখা করিবে। তারপর পীড়াপীড়ি করিলে বলে—'ফসলের দামটা কি এখন যে সুদ

দিব? ভালো দিন পড়লে সুদ নিজেরাই গিয়ে দিয়ে আসি। তা বলতে হয় না।' অর্থাৎ সময় মন্দ, এখন বলিলেও সুদ দিবে না।

মণ্ডলেরা বলে—জমিটা বেচিয়া ফেলুক না তাহা হইলে? না হয় মণ্ডলেরা মোকদ্দমা করিলে ত সুদে আসলে সবই যাইবে।

চাষীরা উত্তর দেয়, বললেই হয়? নিজের জমি নিজে চাষ করি, অন্যে তার মালিক হবে কোন ধর্মে?

বিহারী ঘোষের মত আইনের হুমকি দিলেই বা কি? মণ্ডলেরা বুঝিতেছিল, এখন দেখিলও—বিহারী ঘোষকে ছাড়াইয়া কৃষকদের কথাবার্তা আগাইয়া আসিতেছে, মণ্ডলদেরও বিরুদ্ধে প্রজারা দাঁড়াইতেছে। গণেশের নির্বুদ্ধিতায় কি যে হইতেছে তাহা কর্তাদের আগেও বুঝিতে বাকী ছিল না। গণেশের উপর কর্তাদের কড়া হুকুম হইল—এসব উস্‌কানি আর নয়। সে কলেজে পড়িতে হয় পড়ুক; কলিকাতায় গিয়া থাকুক। এখানকার কৃষকদের লইয়া এইসব বিরোধ পাকাইলে বড় কর্তারা তাহা আর সহিবেন না।

গণেশ তাই হেমন্ত বাবুর শরণ লইল। হেমন্তবাবু এখন উকিল; তিনি বুঝিলেন বাড়াবাড়ি করিয়া ফেলিয়াছে গণেশ। এসব কৃষক লইয়া আন্দোলন এভাবে করিতে গেলে দেশে অরাজকতা আসিবে; মহাজন জমিদারেরাই কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একত্র হইবে। হেমন্ত মাইতি নিজেই তাই বিহারী ঘোষকে খবর পাঠাইলেন, সহজেই তিনি মধ্যস্থ হইয়া বসিলেন। তারপর দুই পক্ষের অনেক সওয়াল শুনিয়া রায় দিয়া দিলেন—আইনজ্ঞ মানুষ, বে-আইনী কথা তিনিই বা বলিবেন কেন?—বন্ধকী জমি জোত যাহা আইনত যে পাইয়াছে সে পাইবেই। তবে চক্রবৃদ্ধি সুদটা বেশ কিছু মাফ করিবেন মহাজনেরা। আর জমি? পুরোনো চাষীকে আবার ভাগচাষে যেন তাঁহারা জমি বন্দোবস্ত দেন। অবশ্য এটা আইনের কথা নয়, ধর্মের কথা। ধর্ম হইল অনেক বড় জিনিস। ধর্ম না মানিলে থাকিবে কি?

মণ্ডলেরা কথাটায় সায় দিল—অধর্ম তাহারা করিবে না। বিহারী ঘোষও কথাটা মানিয়া লইল—বে-আইনী কাজ সেও করিবে না। কৃষকদের হইয়াও

সায় দিল অনেকে—বাবুরা যখন বলিতেছেন। কেবল মুসলমান কৃষকেরা চুপ করিয়া রহিল। তাহাদের একজন বলিল, চাষীর ধর্মই হল চাষ। যতক্ষণ চাষ করি ততক্ষণ ত খোদার হুকুম মত ধর্মপালনই করি। অভাবে পড়ি, ধার নিই;—মহাজন ফসল নেয়, গরু নেয়, মালক্রোক আনে,—না নেয় কি? কিন্তু যাই নিক্ জমি নেয় কোন ধর্ম মতে?

ব্যাটাদের মাথায় এসব ঢুকাইয়াছে কে? সৈয়দ আলী বুঝি? আরও বিশদ করিয়া হেমন্তবাবুকে তাই ধর্মের ব্যাখ্যা করিতে হয়। কলিযুগে ধর্মের বড় দুরবস্থা। তাই ভালো ভালো লোকে বুঝিতে পারে না ধর্ম কি, অধর্মই বা কিসে? স্বয়ং যুধিষ্ঠিরকে পর্যন্ত বকরূপী ধর্ম বুঝাইতে পারেন নাই ধর্মের তত্ব। বুদ্ধিমান লোকদেরই একালে ভুল হয়, চাষীদের ত ভুল হইতেই পারে। ভুল যতটা সম্ভব তিনি তাহা দূর করিলেন। কিন্তু তাহা সত্বেও মুসলমানেরা সম্পূর্ণ বুঝিল কিনা সন্দেহ। চুপ করিয়া রহিল, নিজ নিজ গৃহে চলিয়া গেল।

কানাইও চুপ করিয়া শুনিয়াছিল, চুপ করিয়াই গৃহে ফিরিয়া আসিল। একটু নিঃশ্বাস ফেলিয়া বরং বাঁচিল—এই বৎসর আর দাঙ্গা হাঙ্গামার ব্যাপার নাই। আবার জেলে যাইতে হইবে না কানাইকে,—মেয়েটাকে ফেলিয়া আবার এখন জেলে যাইতে সে পারিত না। বাঁচা গেল; কিন্তু সে খাইবে কি? পরিবে কি? আর এত যে বরাবর বলিয়া আসিয়াছে—'আমাদের জমি আমাদের, কিছুতেই মহাজনের হবে না।'—তাহা কি তবে মিথ্যা? এইটাই কি ধর্মসঙ্গত কাজ হইল তাহাদের? কী ধর্ম? না, বাবুদের কথাই থাকুক। এক বৎসরও হয় নাই—কত চেষ্টা করিয়া গণেশবাবু জজ আদালতে তাহাদের জামিন আদায় করিলেন। অন্যায় কথা বলিবার মত মানুষ তাঁহারা নন। করুক গজ-গজ রহমৎ। কানাই এখন অতশত তর্ক করিতে চাহে না। বেশত, দেখাই যাউক—অন্তত আর একটা শাল আরও।

সেই শালে অভাব বাড়িয়া গেল। গোলমাল রহমতদের গাঁয়ে লাগিয়া ছিল,

অন্যান্য গাঁয়েও ছড়াইয়া পড়িল। সমস্ত থানায় একটা অসন্তোষ। চাষীরাই বা করিবে কি? অভাবের তাড়নায় প্রাণ যে তাহাদের আর টিঁকে না।

অভিযোগ শুনিয়া এবার গণেশ রাগ করিল। একটা আপোষ-রফা হেমন্তবাবু করিয়া দিয়াছেন। এক শাল যাইতে না যাইতেই কৃষকেরা তাহা ভাঙিতে চায়? এমন অধর্ম কাজে সে নাই। রাগ করিয়া গণেশ চলিয়া গেল বৈঠক হইতে। কানাইরও যাইতে ইচ্ছা করিল—গণেশ নাই, হেমন্ত নাই, কে তবে তাহাদের দেখিবে? কলিকাতার বন্ধুদের খোঁজ নাই। কিন্তু গণেশ গেলেও কানাই যাইবে কোথায়? খাইবে কি সে? কেবলি যে ধার করিতে হয়। মণ্ডলেরা তাহাকে যে ধার দেয়, যে হারে সুদে-আসলে তাহা আবার আদায় করে, তাহাতে কানাইর ঘরে কমই ফসল আসে। ওদিকে আপোষ সত্ত্বেও বিহারী ঘোষ তাহাকে ভাগচাষী বলিয়াও আর জমিতে ঢুকিতে দিতে রাজী হয় নাই। বলিয়াছে, 'কানাই বড় বজ্জাত, জমিতে একবার ঢুকলেই আবার বল্‌বে জমি তার।' তথাপি কানাই সহিয়া আছে—তাহার বিশ্বাস গণেশ বাবুরা তাহাকে দেখিবেন; চক্রবৃদ্ধি সুদটা মাফ করিয়া দিবেন, আপোষের চুক্তি মত জমিটাও ভাগ চাষে তাহাকে দেওয়াইবেন। যদি তাহা না হয়?—কানাই ভাবিয়া পায় না তাহা হইলে কি হইবে? কে তাহাকে দেখিবে? কে তাহাকে বাঁচাইবে? শুধু তাহাকে নয়—সেই ছোট কাতুও তো আছে। এখন সে চলিতে শিখিয়াছে, বেশ কথা বলিতে পারে—একটা খেলার ঝুমঝুমিও তাহার চাই। তাহা না পাইলে কাঁদে। পাইলে ভাঙিয়া ফেলে। নতুন একটার জন্য আবার কান্না জুড়িয়া দেয়।

অঘ্রানের প্রথম হিম পড়িতেই কিন্তু কেমন করিয়া কাতুর কাশি হইল, জ্বর হইল। জ্বরে বেহুঁস সেই মেয়ে। তিন দিনের জ্বরে সে মরিয়া গেল। ওদিকে তখন ঘন ঘন বৈঠক বসিতেছে, এখন আর মণ্ডল বাড়িতে নয়,—ভিন্ন গ্রামে, চাষীদের পাড়ায়। রুখিয়া দাঁড়াইবে এবার চাষীরা। কিছুতেই আর সুদের নামে ফসল আদায় নয়, কোনো কথা আর শোনা নয়, কোনো

দেনা আর তাহারা দিবে না। কানাই বৈঠকের ডাক শুনিত, যাইত; কিন্তু একটু পরেই পলাইয়া আসিত। বাড়ি ফিরিয়া ভয়ে ভয়ে থাকিত, কাজটা ভালো করিতেছে না। দশজনের বৈঠক, সে তাহা ফাঁকি দিতেছে। কে জানে কি হইবে? কেমন অপরাধী মনে হইত নিজেকে। অথচ সাহসও পায় না যেন। যেই কাতু মরিতে বসিল সে যেন বুঝিল সত্যই তাহার অধর্ম হইয়াছে। মেয়ে তাহাদের মুক্তি দিতে আসিয়াছিল, সে যখন জেলে ছিল ; জেলকে কানাই যেই ভয় করিতে আরম্ভ করিল, সেই মেয়েও তাহাকে অমনি ছাড়িয়া গেল। যাইবে না? সে যে স্বয়ং দেবী ছিলেন—কাত্যায়নী। এতগুলি গ্রামের এত গুলি মানুষের কাজ হইতে পালাইয়া ফিরিতেছে কানাই, আর দেবী থাকিবেন তাহার ঘরে?

অমিত জানে, এবার বুদ্ধি সাফ হইয়া গেল কানাই হাজরার। আর শুধু কানাই হাজরার কেন? কাতুর মায়েরও। দশজনকে ফাঁকি দিলে ধর্ম সয়? সয় না। তাই ত কাতু তাহাদের ছাড়িয়া গেল। তাহার পরে অনেক কিছু ঘটিল—দু'বৎসর পরে নারাণী জন্মিল। কিন্তু তাহার পূর্বে কানাই তেতাল্লিশজন চাষীর সঙ্গে মাসের পর মাস মহকুমার হাজতে কাটাইয়া আসিয়াছে, জামিন মিলে নাই। পরের সালে বিনা জামিনে তাহার বউ ও আর দু'জন চাষীর বউ ও চাষীর মায়ের সঙ্গে দাঙ্গার দায়ে সেই জেলে এক মাস কাটাইয়া আসিল—তখনি নারাণী তাহার পেটে আসিয়াছে। জন্মিল সেই নারাণী। কিন্তু তাই বলিয়া কানাই হাজরার আর ভুল হইল না। নারাণীর মায়ের পক্ষে আর বেশি জেল-ফৌজদারীর ধকলে যাওয়া সম্ভব হয় নাই। কাজ করিয়াছে, ধান ভানিয়াছে, সিদ্ধ করিয়াছে, ব্যাপারীদের কাছেও চাষীর বউ নিজে বহিয়া লইয়া গিয়াছে দরকারের মত চিঁড়া, মুড়ি। তারপর যুদ্ধের দিনে বহু কষ্টে দিন কাটাইয়াছে। নারাণীকে মানুষ করিয়াছে। মোটামুটি অবস্থা দেখিয়া মধুর সঙ্গে বিবাহ স্থির করিয়াছিল—বিবাহের পূর্বেই সেবারকার জ্বরে নারাণীর মা মরিয়া গেল। নারাণীকে বিবাহ দিল কানাই। এখন মধুদের বাড়িতেই নারাণী আছে। জামাই-শ্বশুরে জমিদার-মহাজনের সঙ্গে লড়াই

করিতে করিতে এই কয় বৎসরে ঝানু 'সমিতিওয়ালা' হইয়া উঠিয়াছে। কোন খালের জলে কোন ক্ষেত ভাসে, স্লুইস গেট হইলে কতটা জমি রক্ষা পায় কোন ইউনিয়নের, ভেড়ি কাটিয়া কোন জমিদার কতটা মাছের ব্যবসা ফলাইতেছে, তাহাদের গোমস্তা-মহাজনরা কেমন করিয়া কৃষকদের লুঠ করিয়া নিঃশেষ করিল, দুর্ভিক্ষে মন্বন্তরে কেমন জমি বিক্রী হইয়া গেল, কত ভাবে মরিল কতজনা, বাঁচিয়াই বা মরিয়া আছে কত ; ফুড্ কমিটির ও প্রোকিউরিং-এর নামে গরীবের উপর লুঠ চলিয়াছে কিরূপ ;—হেমন্ত মাইতি এম, এল, এ, কতটা চোরা-কারবারের মালিক, গণেশ মণ্ডল হয়ত বা কোন্‌দিন মন্ত্রীই হইয়া বসিবে ; —তাহার ব্যবসা এখন চালে ডালে কাপড়ে কেরোসিনে কত বড় ; গাঁয়ে গাঁয়ে জমিহারা কৃষকের সংখ্যা কত বাড়িয়াছে ; ভাগচাষীদের 'আধি' নানা ওজুহাতে কাটা পড়িতে পড়িতে শেষ অবধি কত সিকেয় গিয়া দাঁড়ায় ; জমিদারের খোলায় ধান তুলিলে আর সে ধানের কয় আঁটি যাইবে কৃষকদের ঘরে,—এক কথায় সমস্ত দক্ষিণ অঞ্চলের ছবিটা কানাই হাজরা আপনার নখাগ্রে বহিয়া বেড়ায়। কত বার অমিতও তাহা শুনিয়াছে।

হাঁ, সে 'কমরেড' হইয়াছে। সম্মেলন করিতে করিতে নেত্রকোণা গিয়াছে, হাজংদের দেখিয়াছে। দিনাজপুরে গিয়াছে, সেখানকার কমরেডদের সঙ্গে গল্প করিয়াছে। খুলনা যশোর,—কোন কৃষক এলাকায় সে যায় নাই? তারপর আসিল 'তেভাগা'। গোটাতিনেক দাঙ্গার দায়ে তেভাগার সময়ে কানাই মাস কয় জেল খাটিয়াছে। এখনো সে প্রায় আধা-ফেরারী। গ্রামে গ্রামে গোপনে ঘুরিয়া বেড়ায়। শহরে আসে প্রকাশ্যেই কৃষক সভার আপিসে। উকিল পাকড়ায়, মামলা মোকর্দমায় জামিনের ব্যবস্থা করে, ইশতেহার লেখায়, ছাপা কাগজ বহিয়া গ্রামে নেয় ; নিজে পড়ে, দশজনকে পড়িয়া শোনায় ; 'কম্যুনিস্ট' কাগজের পাতা খুলিয়া গলদ্‌ঘর্ম হইয়া তাহা পড়ে ; না বুঝিলে সমিতির আপিসের কাহাকেও ধরিয়া গলদ্‌ঘর্ম করিয়া ছাড়ে। ময়লা রংএর বেটে-খাটো এই মানুষটা এখন বোধ হয় চল্লিশের দিকে আসিয়াছে,—কৃষক সমিতির পরিচিত লোকদের সে

'হাজরা দা'।' সভায় মিছিলে তাহার মোটা ভাঙা-গলা সকলে চিনে। তাহার খাঁদা নাক, ছোট চোখের তীব্র চাহনি সকলের পরিচিত। কতবার অমিত তাহাকে কতখানে দেখিয়াছে গত দশ বৎসরে। আর শুনিয়াছে তাহার কথা, তাহার মোটা গলার স্লোগান। কিন্তু কলিকাতা আসিয়াছিল কেন এই সময়ে হাজরাদা'? তাহা না হইলে নিশ্চয়ই ধরা পড়িত না। হয়ত গ্রামের কৃষক নেতারা কেহই এখনো গ্রেফতার হয় নাই।

অমিত বলিল, এখানে এসেছিলেন কোথায়, হাজরা'দা?

আমরা আবার কোথায় আসব? আমাদের আপিসে।

কৃষক সভায়?

হাঁ, জেলা কৃষক-সভার আপিসে। তিনবার খবর পাঠালে ফর্ম পাঠায় না সম্পাদক। ওদিকে মেম্বর করবার দিন যায়। ইউনিয়ন কৃষক-সভায় লোকেরা বলে, 'হাজরা'দা', থাক্ তোমাদের ফর্ম। আমরা এমনিই ত মেম্বর আছি। এখন বরং এসো কাজটা কি, তাই বলো।' কাজের কি অভাব রে, বাবা, যে আমায় তা বলতে হবে? কিন্তু সভা করবে না, মেম্বর করবে না, তবে সমিতির কাজ চলবে কি করে? কাল এসে তাই সেক্রেটারিকে পাকড়ালাম। 'ওসব শুনব না—কাগজ পাই না, ছাপা হয় না। যেখান থেকে পার দাও মেম্বর-শিপের ফর্ম।'

তারপর?

সেক্রেটারি বললে—আজ ফর্ম আসবে ছাপাখানা থেকে। ছাপা হলে পার্টিরও ইশ্‌তেহার নিয়ে যাব আজ। তাই রয়ে গেলাম একটা দিন। রাত্রিতে শুয়েছি, ভোর না হতেই ধাক্কাধাক্কি। 'ওঠ, 'ওঠ, পুলিশ এসেছে। তারপরে ত এখানে বসে আছি। আপনারা ত বেশ গল্প জমিয়েছেন; কিন্তু আমরা চাষারা করি কি?

কেন? আসুন না, একটু ঝিমিয়ে নিই—খাবার যতক্ষণ না আসে।

খাবার দিবে—এ সম্ভাবনায় কানাই হাজরা একটু আশান্বিত হইল। ক্ষুধা পাইয়াছে। কৃষক মানুষ না খাইয়া পারে? কিন্তু ধরিল কেন তাহাকে?

অমিত একটু ব্যাখ্যা করিল। আটক বন্দী হিসাবে জেলে ধরিয়া রাখিলে কি-কি আইনত সুযোগ পাওয়া যায়, তাহাও জানাইল। হাজরাদা' শুনিল, শুনিয়া মনে মনে বেশ প্রলুব্ধই হইল।

তাই ত, দিন তাহা হইলে মন্দ কাটিবে না। কিন্তু কত দিন? সে জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু কতদিন ধরে রাখবে?

ঠিক নেই। যতদিন সরকারের খুসী!

হাজরা চমকিত হইল।—তার অর্থ? তাহলে এই যে, বৈশাখ জ্যৈষ্ঠে লড়াই'র আয়োজন করছিলাম, তার কি হবে?

কি আর হবে, করবে ওরা যেমন করে পারে।

আমি যোগ দোব না তাতে?

কি করে দেবেন—ধরে রাখলে?

জামিনও পাব না?

জামিন এ আইনে হয় না, হাজরাদা'।

সত্য বলছেন, অমিতবাবু?

নইলে এই আইনের বিরুদ্ধে এত আমরা আন্দোলন করছিলাম কেন?

কানাই চিন্তাগ্রস্ত হইল। মুখে কথা নাই, কিছুক্ষণ পরে কহিল, তা হবে না, অমিতবাবু।

কি হবে না?

ও সময়ে জেলে বসে থাকা চলবে না। সবাই লড়বে, আর কানাই হাজরা বসে থাকবে জেলে? সে হবে না।

করবেন কি ধরে রাখলে?—অমিত উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে।

সে আমি কি জানি? আপনারা তা ভেবে ঠিক করুন। কিন্তু জেলে বসে থাকব কি করে? কত কাজ পড়ে রয়েছে।

অমিত বলিল, কাজ আছে? তা জামাই দেখবে না?

হাজরা উত্তর দিল, সে ত দেখবে তার কাজ,—তা' বলছি না।

কি কাজের কথা আবার তাহা হইলে?—কি মুশকিল্ কানাইর, অমিত

বাবুকে বুঝাইয়া বলিতে হইবে তাহাও? হাঁ, মধু ক্ষেত দেখিবে, অবশ্য নারায়ণীর ছেলে-মেয়ে হইবে। না, প্রথম পোয়াতী নয়। শাশুড়ী আছে শ্বশুরও আছে; বউকে তাহারাই দেখিবেও। তবু বাপকে নারায়ণী এখন ছাড়িয়া থাকিতে চায় না। মা নাই, তাই বাপের উপরই তাহার সকল মমতা। ভাবিতে মনটা হাজরারও কেমন করিয়া উঠে—নারাণী না জানি তাহার পিতার গ্রেপ্তারের সংবাদ পাইয়া কি করিবে? কোনো একটা বিপদ না ঘটিলেই হয়। এখনো দেরী আছে নারাণীর প্রসবের, সামলাইয়া উঠিবে নারাণী। আর না হইলেই বা কি? নারাণীত তাহার মাতার মুখে, পিতার নিকট কতবার শুনিয়াছে—কেমন করিয়া তাহার বোন কাতু জন্মিয়াছিল যখন কানাই জেলে, আর কেমন করিয়া সে বোন কাতু চলিয়া গেল তাহাদের চোখের সামনে দিয়া। জেলে যায় নাই তখন কানাই, যাইতে চাহেও নাই; কিন্তু রাখিতে পারিয়াছিল কি কাতুকে ধরিয়া? এমনিই ব্যাপার! চাষীর ঘরের মেয়ে নারাণী, চাষীর ঘরের বউ। হাঁ, মধুও জামাই ভালো; দরকার হইলে সব করিবে। শ্বশুরের জমি-জমা যাহা আছে সে দেখিবে না ত দেখিবে কে? তাহা ছাড়া, দরকার মত সমিতির কাজও মধু করিবে। সে ভাগচাষী নয়, 'তেভাগাতে'ও পড়ে না। নিজের জমি নিজে চাষ করে। ধানী জমি নয়, নানা শাক-সব্জীর, নাউ কুমড়ো রবিশস্য নানা ফসলের। তারপরে এক আধটুকু কলার চাষও আছে; জন-মুনিষ তাহারও লইতে হয়, মজুরী দেয়, মজুর খাটায়। তবে ক্ষেতের ফসল নিজেই মধু গোড়ের হাটে বহিয়া লইয়া যায়, বিক্রয় করে।—স্বচ্ছল চাষী, গরীব চাষী বা ভাগচাষী নয়। তবু 'তেভাগায়' সেবার মধু সকলের সঙ্গে লড়াই করিয়াছে। এবারও করিবে।—অবশ্য নারাণী পারিবে না। না, সে পারিবে না এখন। তাহার মা থাকিলে দেখিত অমিতবাবুরা। সেবার দশ গ্রামের মেয়েদের সে-ই জড়ো করিল—নারাণীর মা। সেই দিনাজপুরের চাষী মেয়েদের মত—তাহারাও নামিত যুদ্ধে। এখনো লড়াই করিবে অন্যেরা। চাষীর বউ, চাষীর মেয়ে, তাহারা বসিয়া থাকিবে নাকি? ইহা ত জানা কথাই—লড়িলে মরিতে হইবে। দেখিবে অমিতবাবু, দেখিবে চাষীর বউদের, চাষীর মেয়েদের সাহস…

অমিত কৌতুক বোধ করিতেছিল। হাজরাদা'র মুখ খুলিয়াছে, এবার আর থামিবে না সহজে। যথা নিয়মে বলিবে—কেবল দিনাজপুরেই কি মেয়েরা 'তেভাগায়' সাহস দেখাইয়াছে? সাহস দেখায় নাই চব্বিশ পরগণার চাষী-মেয়েরা? বাঙলা সেই বিয়াল্লিশ হইতে কত জেলে গেল, ঝাঁটা লইয়া, ঠ্যাঙা লইয়া, ধান ভাঙিবার কাঠের ডাণ্ডা লইয়া কতবার তাহারা তখনি পুলিশকে, জমিদারের পাইককে তাড়া করিয়াছে। 'নারাণীর মা'—অমিত তাহার কথা জানে? জানে বৈকি—সহজ কথা ত নয়। শুনুক তবু তাহা আবার।

আবার শুনিল অমিত তাহা—'নারাণীর মা' তের সাল আগে কেমন লড়াই করিয়াছিল:—ভেড়ির ওদিক থেকে আস্‌ছে ছোট দারোগা—পুলিশ তার সঙ্গে তিন জন। নারাণীর মা বলে—'তোরা আয়।' ধান ভানবার কাঠটা নিলে হাতে। মনুর মা, কানুর পিসি বলে, 'তুই থাক্ বউ পিছনে, আমরা যাই সাম্‌নে ;—আমাদের বয়স হয়েছে। তুই এখনো সোমত্ত বউ।' নারাণীর মা বলে, 'হুঁ। তুমরা গতরে পার না, চক্ষে দ্যাখো না; আর আমি বসে থাক্‌ব?'—তারপর 'হেঁই' বলে ছুটে বেরুল নারানীর মা—হাতে সেই কাঠটা। ছোট দারোগা বলে—'ওমা! কে এল!' তিন তিনটা পুলিশ বলে—'আর যাব না।' নারাণীর মা বলে 'আয় নারে ডেকরারা'—

কানাই হাজরা থামিবে না। যাহা শতবার শতজনকে শুনাইয়াছে, তাহাই আবার শুনাইবে আরও শতবার আরও শতজনকে—নারাণীর মায়ের সেই বীরত্বকাহিনী।

অমিতও আবার শুনিতে লাগিল: শুনিল। আর শুনিতে শুনিতে তাহার মনে পড়িল—সেই কৃষক মা বউদের কথা, অনেক মহিলা কংগ্রেসের কর্মীদের কথা, আর অনুর কথা, মঞ্জুর কথা। ভাবিতে লাগিল—সত্যইত, লড়াইত করিয়াছিল তাহারা,—করিয়াছে এই চাষীর ঘরের মেয়েরাও। ইস্কুলে কলেজে পড়া মেয়ে নয়; ভদ্র শিক্ষিত সমাজের মেয়ে নয়; গান্ধীজীর কংগ্রেসের ডাকেও আসে নাই। সাধারণ চাষীর ঘরের মেয়ে তাহারা, লড়াই করিয়াছে

নিজেদের জমি জমার দাবীতে, নিজেদের দুঃখের জ্বালায়,—পুরুষের সঙ্গে দাঁড়াইয়া। হাঁ, মেয়ে তাহারা কেউ বা ভালো, কেউ বা মন্দ,—যেমন পার্বতী, বিলাসপুরীয়া মংগলী; পৃথিবীতে কংগ্রেসের রাজনৈতিক নেত্রী বা কর্মীরাই বা কে তাহা ছাড়া অন্যরূপ? কেহ বা ভালো, কেহ বা মন্দ। পৃথিবীর কোন্ দেশেই বা ইহা ছাড়া অন্য রকম মেয়েরা? কিংবা পুরুষরা? তবু সত্য যাহা তাহা এই:—পৃথিবীর এই বিপ্লবের আগুনে মেয়েরাও ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে। ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে রুশ দেশে, চীনে, স্পেনে, তাহা জানি আমরা সকলে। কিন্তু জানি কি তবু সকলে—ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে বাঙলা দেশের চাষীর ঘরের মেয়েরাও?—এ সত্যটা কি আমরা বুঝিয়া দেখিতেছি? তাহারা শিক্ষিতা নয়, বিদুষী নয়, দেশের নামে বড় কথা বলিতে পারে না। হয়ত নিজেদের কথা নিজেরাও তাহারা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। জানে না—দুনিয়া-জোড়া বিপ্লবের মহামহীয়ান সাধনার মধ্যে বাঙলা দেশের অখ্যাত গ্রামের অবজ্ঞাত নির্যাতিত নারী-জীবনের মধ্য হইতে এই যে দুঃসাহসের স্ফুলিঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল—কোথায় মথুরাপুরের কোন্ গাঁয়ের ভেড়ির কাছে, তারপর দিনাজপুরের কোন গ্রামে, না, হাজংদের কোন পাড়ায়, আর কাকদ্বীপ-তমলুকের কোন্ কোন্ অজ্ঞাতনামা গ্রামে—কী ইহার অর্থ—কী ইহার ইঙ্গিত? কোন সমাগত-প্রায় ভূকম্পনের প্রথম অগ্নিগর্ভ, আভ্যন্তরীণ থর-থরি ইহা? আগামী দিনের কোন মুক্ত, আত্ম-মর্যাদাময় নারী-জীবনের প্রথম উদ্বোধন? ইহারা তাহা জানে না—জানি কি আমরাই?—কানাই হাজরার মুখে সেই 'নারানীর মা'দের গল্প যাহারা শুনি সকৌতুকে—একটু অবজ্ঞার সহিত, একটু অবিশ্বাসের সহিত, হয়ত বা একটু ভদ্র-বর্গীয় কৃপা ও কৌতুকের সহিত? বুঝি কি আমরা কী তাহার অর্থ?...বোঝ কি তাহা তোমরা, মঞ্জু?...বোঝে না কি অনু?—আর বুঝিতে যদি তুমি বিদ্রোহিণী ইন্দ্রাণী...

অমিত বলিল, কিন্তু নারায়ণীত এখন পারবে না এসব কাজ, হাজরাদা'।

কানাই হাজরা থামিয়া গেল। বলিল, আহা, আজ না পারুক কাল করবে। তা বলে চুপ করে বসে থাকবে নাকি চিরকাল?—

কি মনে পড়িল কানাইর। একটু পরে আবার বলিল, না, এটা কি বসে থাকার সময় আমাদের চাষীদের? আপনারা শহরে থাকেন, কত লোকজন, কত কর্মী এখানে! কিন্তু আমাদের ওখানে লোক কোথা? কে ইশতেহার বাঁটবে, কে মেম্বর করবে, কে বৈঠক ডাকবে? আর, এসব এখন না করলে লড়াই হবে কি করে বৈশাখে—সরকারী চাল ডালের ব্যবসাদার পুলিসের সঙ্গে? এসব এখন থেকে তৈরী না করলে এবারকার 'তে-ভাগার' লড়াই কি আর ঠিক মত আরম্ভ করা যাবে? সেবার বেঁচে গিয়েছে জমিদাররা জোতদাররা। শুনেছে, তেভাগা আইন হবে, আগে থাকতেই তাই ভাগ দিয়ে দিলে অনেকে। এ শাল আমরা দোমনা হলাম—আপনারাও পরিষ্কার করে কিছু বল্‌লেন না। বললেন, 'যে-গ্রামে তেভাগা চায়, সে গ্রামে তেভাগা হোক; যারা চায় না তারা তা করবে না।' কোন গ্রামে আবার কোন চাষী জোতদারকে সাধ করে ধান তুলে দেয়? তেভাগা চায় না তা হলে কে? কিন্তু সমিতির একটা নির্দেশ চাই। একবার যখন তেভাগার লড়াই শুরুই করেছি,—এক শাল তা আদায়ও করেছি, তখন আবার অন্য কথা কেন? অমন লড়াই গিয়েছে সে শালে হাজংদের, দিনাজপুরের কৃষকদের; কিন্তু এ সালে আপনারা চুপ করে রইলেন। ভাবলেন, 'কংগ্রেস রাজা হয়েছে, দেখি কি করে।' তাই জমিদাররা এ সাল জোর পেয়েছে। কংগ্রেসের মন্ত্রীরা ওদেরই লোক। পোয়া বারো এবার জমিদার-জোতদারের। এসব বুঝেই ত এখন থেকে আমাদেরও জোর প্রচার চালাতে হবে, জোর সংগঠন করতে হবে—এবারের শীত কালে যেন আর জমিদারের খোলানে চাষীরা একজনও ধান না তোলে।

কানাই হাজরার মুখ আবার খুলিয়া গিয়াছে—এবারের শীতের পূর্বেই কি কি করিয়া ফেলিতে হইবে, তাহা সে কল্পনা করিয়া বলিয়া যাইতেছে। বসিয়া থাকা চলিবে না জেলে। এখনি কাজে লাগিতে হইবে তাহাকে। অমিত তাহার

সঙ্গে আলোচনা করিতে লাগিল। ভাবিতে লাগিল···কানাই হাজরা ভুলিয়া গিয়াছে এ তাহার গ্রাম নয়; এটা তাহার জেলা কৃষক সভার আপিসও নয়; কলিকাতার গোয়েন্দা আপিসের প্রায়-অন্ধকার গৃহ। কানাইর কল্পনা আগামী দিনের লড়াইর নামে এখনি ছুটিয়া চলিতেছে—সেখানে বিলম্বের কারণ নাই, সংশয়ের অবকাশ নাই···চাষীর সংগ্রাম আজ আরম্ভ হইয়াছে, আরম্ভ যখন হইয়াছে তখন আবার দ্বিধা কোথায়, মীমাংসা কোথায়? সময় নাই, সময় নাই চাষীর।···

পাঁচ

কিন্তু সত্যই খাবার আসিয়াছে। আর কানাই হাজরার চোখ-মুখ এক নিমেষে আনন্দোজ্জল হইয়া উঠিল। চাষীর ক্ষুধা!

কিন্তু কী খাদ্য? প্রত্যেকের জন্য শুকনো খান চারেক্ ছোট ছোট পুরী ও কিছু তরকারী; 'ওয়ার-ইকোনমির' ছোট একটী রসগোল্লা। কানাই হাজরা যেন বিমূঢ় হইয়া গেল—এক থালা ভাত-নুন-লঙ্কাও নাই!

একটু একটু বাঁটিয়া খাইয়া জলের অভাবে পড়িতে হইল। জল নাই, গেলাসও নাই। জল যদি পান করিতে হয় তাহা হইলে পথের একটা টিউব ওয়েলে চারজন-চারজন করিয়া গিয়া তৃষ্ণা নিবৃত্তি করিতে পারিবে, অনুমতি হইয়াছে। তাহাতে পাহারাদের কাজ বাড়িবে অবশ্য; কিন্তু কি করা? এতগুলি ভদ্রসন্তান এবং 'লেডিজও'। কিন্তু আপিসের এমন ব্যবস্থা যে জলও তাঁহারা পাইতেছেন না—জানাইলেন দপ্তরের সেই অপ্রতিভ কর্মচারীটি। সঙ্গে সঙ্গে, বলিলেন: চা আসছে স্যর, একটু পরে।

টিউব্ ওয়েলে জলপান করাটা যেন একটা উৎসব মজুর কাছে। পারিলে সে স্নানে বসিয়া যায়। বেলা আড়াইটা বাজিয়া গিয়াছে, স্নান নাই, হাতমুখ

ধোয়া নাই, এই চৈত্রের গরমে একটা ঘরে এতগুলি লোক চার-পাঁচ ঘণ্টা যে কি ভাবে কাটাইল, এতক্ষণ তাহা যেন তবু মঞ্জুর মনেই হয় নাই! উড়িয়া গিয়াছে গল্পে তর্কে, আলোচনায়—সকলকার সঙ্গে অবিশ্রান্ত কথায়। আহার আসিতে এবার মঞ্জুর তাহা মনে পড়িল। তাই হউক রাস্তা, আর থাকুক পাহারা, মঞ্জুর স্বতোচ্ছ্বসিত প্রাণলীলা কোনো পাহারা মানিয়া চলিতে চাহিল না। জল ছুঁইতে পাইয়া তাহার আনন্দ, আঁজলা ভরিয়া পান করিতে আনন্দ, মুখ ধুইতে শাড়ী কাপড় ভিজাইয়া আনন্দ, আর সে আনন্দ ছাপাইয়া গেল বিজয়, দিলীপ, কান্তি ও তাহার বন্ধুদের জল ছিটাইয়া ভিজাইয়া দিতে দিতে। একটা খেলা জমিয়া যায় সেখানেই।

অমিত বুঝিল মঞ্জুর নিকট সব কিছুই এখনো একটা খেলা—জলও জেলও।...

অমিত ফিরিয়া আসিয়া বসিল একটা কেদারায়। এবার তাস লইয়া বসিল আর একদল। কেহ কেহ লম্বা বেঞ্চে এবার একটু ঝিমাইয়া লইবার সুবিধা খুঁজিতে লাগিল। অমিত কেদারায় বসিয়াই ঝিমাইতে পারিবে।

ই ঠিক নেহি হ্যায়।

অমিত দেখিল তাহার পার্শ্বে বুল্‌কন্। তাহাকেই কি বলিতেছে বুল্‌কন্?

কি ঠিক নেহি হ্যায়, কমরেড্ বুলকন্?

বুল্‌কন্ জানাইল—সকলে আবার তাস খেলিতেছে কেন? খেলিতেছে ত কেবল ইংরাজী খেলা খেলিতেছে কেন? ইহা ঠিক নয়। দেশী খেলা হইলে বিস্তি টুয়ানটি-নাইন,—হাঁ সে খেলিত এক-আধটুকু। কিন্তু তাই বলিয়া সারাক্ষণ তাস খেলা? 'ই ঠিক নেহি হ্যায়।'

গোরখপুর কিংবা আজমগড় জিলায় বুল্‌কনের ঘর। কিন্তু 'বঙ্গালী' বলিয়া সে নিজের পরিচয় দিলে তাহাতে আপত্তি করে কেন লোকে? বিশ সাল সে বঙ্গলা দেশে আছে—এই বঙ্গলা মুলুকে আপনার রুটি কামাই করিয়াছে। সে বাঙলায় কথা বলিতে পারে, জরুরৎ হইলে বঙ্গলায় ভাষণ ভি দিতে পারে।

বুল্‌কন বলিত—'ঘর কাঁহা?' যাঁহা মেরা কাম, উহা মেরা ধাম।—মজদুরের আবার অন্য 'ঘর' আছে নাকি?

অমিত বুল্‌কন্‌কে দেখিয়াছে সেই যুদ্ধের প্রথম দিকটায়; ট্রামের ইউনিয়ন তখন গড়িয়া তুলিতেছে ইহারা। ট্রাফিকের লোকেরা তখনো ইউনিয়নে আসিতে প্রায় চাহে না। ইউনিয়ন চলিত ওয়ার্কশপের মজুরদের লইয়া। তখনো ইউনিয়নের জীবনে জোয়ার লাগে নাই। বুলকনের মত ট্রাফিকের লোকেরা দুই-চারিদিন মাত্র তাহাতে যোগদান করিয়াছে; অন্যদের প্রাণপণ করিয়া বুঝাইয়া পড়িয়া ইউনিয়নে আনিতে চেষ্টা করিতেছে। সে কি কঠিন প্রাণান্তকর প্রয়াস তাহাদের। বুলক্‌নত তখনো ভালো করিয়া বাঙলা বুঝিতেও পারে না, বলা ত দূরের কথা। হিন্দীতেই কি কিছু বলিতে পারিত বুল্‌কন? কোথায়, মনে পড়ে না অমিতের বুলকনকে তখন কিছু বলিতে শুনিয়াছে।...

সে দিনের সেই ট্রাম ইউনিয়নের ছোট ঘরে ট্রাম মজুরদের ছোট সভায় 'ডিউটি' শেষে আসিত তাহারা ছোট ছোট দলে। শ্রান্তমুখ, ঘর্মাক্ত কলেবর, খাকীর ইউনিফর্ম ও মাথার টুপি ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে। তবু তাহারা আসিয়াছে ডিউটির শেষে বিশ্রাম না করিয়া। মেসে গিয়া স্নানও সারিয়া লয় নাই, সরাসরি ইউনিয়ন আপিসে আসিয়াছে। সাড়ে পাঁচটায় মিটিং, ছয়টায় অন্তত আরম্ভ করিতেই হইবে। ট্রাফিকের কোন এক সেকসনের লোকদের আসিবার কথা। তাহাদের বুঝাইতে হইবে, ইউনিয়নে আনিতে হইবে; তাহারা যেন আসিয়া না দেখে বুলকনেরা নাই। কত করিয়া বুঝাইতে হইবে উহাদের। ভাঙা হিন্দীতে, ভাঙা বাঙলায় গলদঘর্ম হইত ইউনিয়নের ইংরেজী পড়া বাঙালী কর্মীরা। তাহারা জেল খাটিয়াছে; কালাপানি গিয়াছে। কিন্তু হায়, হিন্দী কেন শিখিল না? ইহারই মধ্যে উঠিয়া দাঁড়াইত দুর্গা দত্ত, অবধপ্রসাদ বা ইয়াকুব। তাহারা ট্রাফিকের লেখাপড়া জানা শ্রমিক। কিন্তু বক্তৃতা করিতে শিখে নাই, শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসও জানে না। রাজনীতির কথাও অতি অল্পই

শুনিয়াছে ইতিপূর্বে। গান্ধীজীর কথা জানে সবাই; শুনিয়াছে, দেখিয়াছে, মনে মনে প্রেরণাও অনুভব করিয়াছে কংগ্রেসের আন্দোলনে। সঙ্গে সঙ্গে শুনিয়াছে—ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের শোষণেরই একটা অঙ্গ এই ইংরেজ ট্রাম-মালিকদের শোষণ, এই অত্যাচার, এই অপমান। কথাটা মনে লাগিয়াছে বুলকনের। সাম্রাজ্যবাদ কি, কে জানে? সে দেখে এই ট্রাম মালিকদের রাজত্ব। ম্যানেজার ডুর্ণ সাহেবের অত্যাচার, ফিরিঙ্গি সুপারিণ্টেণ্ডেটের জুলুম—তবে ইহাই সাম্রাজ্যবাদ? আর ইহারই মধ্যে কম্‌রেড্‌ কালীর মুখে সে শুনিয়াছে 'শ্রমিকের এমন দেশ আছে যেখানে মালিকের শোষণ নাই, আছে শ্রমিক-কৃষকের স্বাধীনতা;—যেখানে বেকারী ও ছাঁটাই নাই, আছে কাজ-পাইবার স্বাধীনতা, আছে তাই রুটির স্বাধীনতা, রুজির স্বাধীনতা, স্বাধীনতা মজুরদের রাষ্ট্র-পরিচালনার।' কিন্তু যাহাই শুনুক, বুঝিয়াছে একটা সত্য—নিজেদের অভিজ্ঞতা দিয়া বুঝিয়াছে তাহারা কয়জনেই দুর্গাদত্ত, ইয়াকুব ও বুলকন—শ্রমিকের 'একাই' চাই, ট্রাম শ্রমিককে 'একট্টা' করিতে হইবে, মজবুত করিয়া ইউনিয়নকে বানাইতে হইবে। তাহা ছাড়া বাঁচিবার পথ নাই তাহাদের—বাঁচিবার পথ নাই ৭১৩নং কনডাক্‌টার বাঙালী দুর্গা দত্তের, "১১৭৭ নং," ইউ-পী'র ব্রাহ্মণ অবধপ্রসাদ পাণ্ডের, '৯৫৬ নং, ড্রাইভার শাহাবাদের মুসলমান মহম্মদ ইয়াকুবের, আর বাঁচিবার পথ নাই, '১৩০২ নং' কণ্ডাকটার আজমগড়ের বুল্‌কন লোহারের। ট্রামের কোনো শ্রমিকেরই বাঁচিবার পথ নাই,—'ওয়ার্কশপের' শ্রমিকের নাই, 'ট্রাফিকের শ্রমিকের নাই, 'মিনিয়ালের' শ্রমিকেরও নাই।

কথাটা বলিতে বলিতে ইয়াকুবের উর্দু জবান যেন ধারাল হইয়া উঠিল। অমিত কান পাতিয়া শুনিয়াছে পার্শ্বের ঘর হইতে, মুখ বাড়াইয়া দেখিয়াছে দুয়ারের বাহির হইতে সসংকোচে,—হয়ত তাহাকে দেখিলে বাধা পাইবেন বক্তা, মনোযোগ ভাঙিয়া যাইবে অন্যদের। তবু এমন চমৎকার যে ভাষা তাহারই কানে ঠেকিতেছে কী তাহার প্রভাব ঘরের উপস্থিত মজুরদের উপর?... কিন্তু তাহা বুঝিবার উপায় নাই। শ্রান্ত অবসন্ন দেহে কেহ শুধু চোখ মেলিয়া

তাকাইয়া আছে। কেহ বা ঘুমে ঢুলিতেছে। কিন্তু তবু কাহারও কাহারও চোখ চক্-চক্ করিয়া উঠিতেছে। একঘর পরিশ্রান্ত, ক্লান্ত মানুষের সেই ভিড়-বহুল ঘরের মধ্যে সেই মুখগুলি—একটা বৈশিষ্ট্যহীন দৃশ্যই অমিতের চক্ষে বেশি জাগে! ইহার মধ্যে কখন দাঁড়াইত পাণ্ডে সাচ্চা হিন্দীতে নিজের ভাষা তখন সে খুঁজিয়া লইতেছে। নিজের কানে অমিত শুনিত দূরের পদক্ষেপ। ...আশ্চর্য, মানুষের এই আপন ভাষাকে আবিষ্কার!...

অমিতের জানিতে আগ্রহ জাগিত। বসিয়া বসিয়া অমিত কয়েকদিন যদি পাণ্ডের এই আত্মাবিষ্কারের প্রয়াসকে লক্ষ্য করিতে পারিত! ইহা ত পাণ্ডের পক্ষে শুধু ভাষা আবিষ্কার নয়, আসলে পাণ্ডের আপনাকেই আবিষ্কার; শ্রম-শিল্পের অভিজ্ঞতার মধ্যে তাহার বুদ্ধি-সতেজ সাধারণ মানুষের সত্তার জাগরণ,—ভাষার মধ্য দিয়া আবার সেই জাগ্রত চেতনাকে তাহার মেলিয়া ধরা; দশজনের সামনে সেই ভাষা রাখিয়া নিজেকে আবার গড়িয়া লওয়া সচেতন শ্রমিকরূপে।

...এক-একটা মানুষের এই জ্ঞাত-অজ্ঞাত সাধনাও পৃথিবীতে কত বড় এক বিস্ময়, কত তাহার বৈচিত্র্য আর কত তাহার অভিনবত্ব! ইহারও মধ্যে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে কতখানি মহাকাব্যিক বীর চরিত্রের মহত্ত্ব, ইতিহাসের এক একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ সিলেবল্!...অমিত মাঝে মাঝে তাহাই দেখিয়া চমকিত হইত। দেখিত আবার দুর্গা দত্তের বিপন্ন অসহায় অবস্থা। কথা বলিতে হয়, বক্তৃতা করিতেও জানে। তবু সে জানে, সে বাঙলায় যাহা বলিল, তাহা বাঙলায় বলায় তাহার অধিকাংশ সহকর্মীরা উহার বিশেষ মর্ম গ্রহণ করিতে পারিল না। তাহারা বাঙালী নয়। অথচ দুর্গা দত্ত বাঙলা ছাড়া কিসে বলিবে? ফরিদপুর-ঢাকার লোক তাহারা, হিন্দীর এক বর্ণও বলিতে পারে না তাহারা। অথচ বাঙলা দেশে বাঙলা ভাষী মজুর কোথায়? অবশ্য, আসিতেছে তাহারাও রবারের কারখানায়, ইঞ্জিনের ঘরে; আসিতেছে কাপড়ের কলে, রেলওয়েতে; আসিতেছে আয়রন স্টিলে, আসিতেছে ট্রামে ট্রান্সপোর্ট। ভিড় করিয়া আসিতেছে এখন পূর্ব বাংলার মুসলমান, আসিতেছে পূর্ব বাংলার

গ্রাম ছাড়িয়া শহরের দিকে না আসিয়া আর উপায় নাই গ্রামের কারিগর মিস্ত্রির, নিম্ন মধ্যবিত্ত দোকানী পশারীর, গরীব কৃষকের। কৃষিজীবীর সন্তানেরা তাই দলে দলে আসিতেছে। তবু এখনো গ্রামের মধ্যেই যেন বাঙালীর শিকড়; গৃহ সে ছাড়িতে চায় না। অবশ্য, অমিত জানে, ভারতের প্রোলিটেরিয়ান্ যুগের আয়োজন বাঙলায়ও চলিয়াছে—আর এই সেই প্রোলিটেরিয়ান্!

…এই কি প্রোলেটেরিয়ান?…না। এখানে দশমাস কাজ করে ইহারা; গৃহের দিকে থাকে চোখ। ছুটিতে দেশে যায়—জমি কেনে, গরু কেনে, বলদ কেনে, ক্ষেতের কাজে ভাই-বন্ধুর সাহায্যে ব্যবস্থা করে; আবার ফিরিয়া আসে কলে;—মাসে মাসে পাঠায় গ্রামে টাকা। উপবাস করে, কষ্ট করে, দেশে বাড়ায় সম্পত্তি। জমিজমার অভাবে গাঁও ছাড়িয়া আসিয়াছিল—এখান হইতে টাকা কুড়াইয়া সেই জমিজমা বাড়ায়। তাই শেষে আবার সেই গ্রামে ফিরিয়া যায়, আবার 'ক্ষেতি' করে, আবার কৃষক হয়, হয়ত বা হয় 'কুলক', পশ্চিমের ক্ষুদে 'জমিদার,' ক্ষুদে সাউকার,—বাঙলায় যাহারা ছোট জোতদার,—মজুর খাটাইয়া জমি চাষ করে। কলের রোজগারের অর্থে স্বচ্ছল হইয়া ক্ষেতে মজুর খাটায়, গ্রামে টাকা খাটায়। গ্রামের মজুর কিংবা ক্ষুদে খাতকের ইহারাই হয় আবার কঠিনতম শোষক। কি করে ইহাদের বলি প্রোলেটেরিয়ান্?…

কিন্তু সত্যই সম্ভব কি এমন করিয়া ট্রাম মজুরের পক্ষে এই সৌভাগ্যলাভ? সম্ভব এদেশেও আর?…অমিত হিসাব করিয়া দেখিয়াছে এদেশে গ্রাম-জোড়া অগণিত দরিদ্রের জীবনযাত্রা কত নিকৃষ্ট। কলের যে-কোন মজুরের মজুরীই উহার তুলনায় একটা ঐশ্বর্য। কিন্তু এই দেশেও আর তবু মজুরের পক্ষে সম্ভব নয় খাটিয়া খাইয়া মজুরী বাঁচানো; হপ্তার মজুরী হইতে দেশে জমি কেনা। অসম্ভব তাহা ত্রিশের বাণিজ্য-সংকট ও মজুরী-কাটার পরে। তথাপি সম্ভব যদি হয় ত কয়জনের পক্ষে তাহা সম্ভব? হয়ত যত জনের সম্ভব মার্কিন মুলুকে মজুর হইতে ম্যানেজার-মালিকের স্তরে উন্নতি-লাভের, যত জনের সম্ভব

ইংলণ্ডে টমাস বা বেভিন্ হইবার,—মাত্র তত জনের। অর্থাৎ লক্ষে একজনের।—ইয়াকুব, পাণ্ডে বা বুলকন্, ইহারাই কি সেই ম্যাক্-ডোনালড্-টমাসের ভারতীয় বংশধর? না, আগামী দিনের ভারতীয় বলশেভিকদের অগ্রদূত ইহারা?…

অমিত তখনো বুঝিয়া উঠিতে পারিত না কাহাদের সে দেখিতেছে সেই ট্রেড্ ইউনিয়নের অন্ধকার ঘরে। কিন্তু দেখিতেছে একটা নতুন দৃশ্য, একটা নতুন জাতি, একটা সম্ভাবনা…শুধুই সম্ভাবনা যাহা এখনো। হাঁ, সম্ভাবনাই। দুর্গা দত্ত বাংলায় বক্তৃতা করিলে তাহা কেহই বুঝে না। এখনো দুর্গা দত্ত নিজেও বাংলায় ভালো বলিতে শিখে নাই। বলিতে গিয়াও দুর্গা দত্তের নিজেরই মনে পড়ে, সে শরৎ গাঙ্গুলীর মত বাগ্মী নয়। সে মোতাহেরের মত ক্ষুরধার বাক্যে কাটিয়া টুকরা টুকরা করিতে পারে না মালিকের যুক্তি। নিজের কাছেই দুর্গা দত্তের নিজের কথা মনে হয় যেন দুর্ব্বল, এলোমেলো। মার্কস-লেনিনের কথা তুলিয়া কালী বাবুরা যখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাহাদের শ্রমিক রাজনীতির কথা বুঝাইতে থাকেন—তখন সে, দুর্গা দত্ত,—ট্রামের শ্রমিকদের '১১৪নং'—কালী ঘোষ, মোতাহেরদের কাছে যে 'দুর্গাবাবু'—সেই জটিল তর্ক-যুক্তিতে যেন দিশাহারা হইয়া যায়। বড় অযোগ্য শিশু তাহারা তখনো। অবধপ্রসাদ ও ইয়াকুবও জানে এখনো তাহারা এক বর্ণও পড়িতে পারেনা মার্কস বা লেনিনের বই। আর তাহা না পড়িতে কি বুঝিবে তাহারা শ্রমিক রাজনীতির? শিশু তাহারা—কি করিয়া চালনা করিবে নিজেদের সামান্য ইউনিয়ন? হিসাব পত্র রাখিবে, চিঠি পত্র লিখিবে, দাবী দাওয়া প্রণয়ন করিবে, প্রচার-পত্র তৈয়ারী করিবে; তারপর লড়াই ঘোষণা করিবে, লড়াই চালাইবে; আর মুখামুখি হইবে মালিকের ও ম্যানেজারের—সাদা আর কালা বড় বড় সব 'বাঘা-বাঘা' মানুষের—ইহা কি তাহাদের দ্বারা সাধ্য কোনো কালে?

অমিতেরও এক-একবার সংশয় হইত। তবু সে দেখিত, সেই ঘর্মাক্ত, শ্রান্ত ট্রাম শ্রমিকের সাগ্রহ প্রয়াসের মধ্যেই একটা 'সম্ভাবনা'…দেখিত তাহা ইয়াকুবের

মুখে, পাণ্ডে ও দুর্গা দত্তের মুখে, দেখিত বুলকনের মধ্যেও। কিন্তু বুলকন্ তখনো বক্তৃতা করিত না, করিবার কথাও ভাবিত না। সভার শেষে শুধু পুরুষালি সবল কণ্ঠে অন্যদের সঙ্গে তর্ক করিত—স্বল্প ভাষায় সহজ বুদ্ধিতে।

বছর পঁচিশের যুবক ছিল তখন সম্ভবত বুল্‌কন্। একটু বেশি দেখাইত বয়স। কারণ, অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝা বুলকন ইতিমধ্যেই অতিবাহিত করিয়া আসিয়াছে। তবু সে তুলনায় বয়স বেশি দেখাইত না। কারণ বুলকনের গায়ে আঁচড় পড়িলেও তাহার দেহ সে ঝড়-ঝঞ্ঝায় কিছুমাত্র টলে নাই! লোহারের ঘরের ছেলে সে। হাতুড়ী পিটাইতে পিটাইতে হাত শক্ত হইতেছিল, কিন্তু দেহ আরও শক্ত হইয়া গেল কুস্তীর আখড়ায় লড়িতে লড়িতে। পুরুষানুক্রমে তাহারা লোহা পিটিয়াছে, আর কুস্তীও করিয়াছে আখ্‌ড়ায়। কিন্তু ভাগ্যক্রমে গ্রামে আর দিন গুজরানো যায় না। কালাইটিকেরি লোহারদের মধ্যে বুলকনে-এর বাপই প্রথম গেল নিকটের শহরতলীতে এক বড় লোহার সর্দারের সাকরেদি করিতে। সকালের দিকে ঘর হইতে খাইয়া সে চলিয়া যাইত, সন্ধ্যায় ঘরে ফিরিত। ইতিমধ্যে যখন বুলকন বড় হইয়া উঠিল তাহার দৌরাত্ম্যে তখন বাড়ির লোক অস্থির। ছত্রি ঠাকুরদের ছেলেকে পর্যন্ত সে উপহাস করিল। কুস্তীতে হারিয়া ঠাকুরের ছেলের অপমান বোধ হইয়াছিল। সেদিনে হইলে ঠাকুরেরা বুল্‌কনের রক্ত চাহিত। এদিনে লোহারেরা মাপি মাঙ্গিয়াই রেহাই পাইল। আর তাই বদমায়েস ও বেতরিবৎ বুলকনের শাস্তি হইল—বাপের সঙ্গে শহরতলীর একটা ইস্কুলে গিয়া বসা; সারাদিন আবদ্ধ থাকা সেখানকার ক্লাশে। বেত খাইয়া, মারপিট সহিয়া ও মারপিট করিয়া তবু সেখানে বুলকন সামান্য কিছু লিখিতে পড়িতে শিখিল। হাঁ, অংকও শিখিল, ইংরাজিতে নাম লিখিতে, নাম পড়িতেও পারিল। এক কথায় 'স্বাক্ষর' নয় শুধু, বুলকন্ 'ইংরেজি-জানাও' হইল। লোহারের ছেলে তখন বাপের সঙ্গে শহরতলীর লোহার দোকানের কাজে সাক্‌রেদি করিতে লাগিল।

কিন্তু তাহা বেশিদিন নয়। তখন পনের বছরের জোয়ান লেড়কা বুলকন্। একদিন আবার ঠাকুরদের এক ছেলের সঙ্গেই লাগিল লড়াইতে। নতুন ইংরেজি-

শেখা ঠাকুরের ছেলে তাহাকে গাল দিয়াছিল 'র‍্যাসকেল' বলিয়া! ইংরেজি জ্ঞানে বুলকন্ তাহার অপেক্ষা হীন নহে। সেও পাল্টা গাল দিল 'র‍্যাসকেল' বলিয়া। তারপর যুদ্ধ। এবং যুদ্ধে ক্ষত্রিয় সন্তানের পরাজয় হইল। এবার বুলকনের রক্তই ঠাকুরেরা চাহিলেন—সে ইংরেজিতে গাল দিয়া বেইজ্জত করিয়াছে ছত্রির ছেলেকে। আর, এবার বুলকনের রক্তপাত করিবার ও তাহাকে নাকে-খত দেওয়াইবার প্রতিজ্ঞা করিল বাপ।

কিন্তু বুলকনকে পাওয়া গেল না।

বুলকন পলাইল। শহর নয়, বনারস, কানপুর নয়, একেবারে কলকাতা। 'ই হামরা মুলুক তব্‌সে'—বুলকন বলে।

বড বাজারে কাজ করিয়াছে বুল্‌কন্—মাল তুলিয়াছে, মাল নামাইয়াছে, বেশিদিন তাহাতেও কাটে নাই। তারপরে গিয়াছে লোহাপট্টিতে সেই কাজে। সেখান হইতে মল্লিক বাজারে। আর তাহার পর মোটরের কারখানায়। সেখান হইতে যায় সাহেবদের এক ছাপাখানায় কাজ লইয়া। শক্ত শরীর, ভারী মাল নামাইতে সে ভয় পায় না। যেমন কাজ, তেমন ছিল তাহাদের মজুরী; কোথাও অনিয়ম ঘটে না। একদিন দেরী হইলে মজুরী কাটা যাইবে; তেমনি আবার তলব দিতেও একদিন দেরী হইবে না। বেশ কয়েক বৎসর এই চাকরি চলে।—ছাপা-কাগজ পড়িবার অভ্যাসও এখানেই বুলকনের পাকা হয়। ইংরেজি অক্ষর ছাড়িয়া ইংরেজি শব্দও সে পড়িতে শিখে। তাই কাজে ফাঁক পড়িত। সে ফাঁকি চোখে পড়িল একটা সাহেব ফোরম্যানের। আর তাই সে একদিন গাল পাড়িল। দ্বিতীয় দিন দিয়া বসিল বুল্‌কনকে এক লাথি। তাহার পর যাহা হইবার তাহা হইল। বুলকন হয়ত খুনই করিয়া ফেলিত,—অবশ্য খুন করিবার মতলব ছিল না। কিন্তু তাহার কুস্তি-গড়া দেহ, হাত, থাবা, বক্‌সিং-করা সাহেববাচ্চাকে এমন করিয়া ঘায়েল করিল যে, ভূলুণ্ঠিত সেই সাহেব পুঙ্গবের যে-নাক ও মুখ দিয়া রক্ত পড়িতেছে, তাহা বুলকানের খেয়ালই হয় নাই। সময়টা তখন খারাপ। বাঙালী বাবুরা সাহেবদিগকে গুলি করিয়া মারে। তাই ছাপাখানার ফটকে তখন মোতায়েন থাকিত পাঠান পাহারা। নিশ্চয়ই

সেদিন সে গুলি চালাইত, কেবল হুকুম পায় নাই। আর কাণ্ডটা নিজের সামনেই ঘটিতে সে দেখিয়াছিল। তাই সে মোটের উপর হৃষ্টচিত্তে সমস্ত ঘটনাটা দেখিল। অন্যেরা যখন বুল্‌কন্‌কে ছাড়াইয়া দিল তখন পাঠান দরওয়ান ফিরিয়া গিয়া ফটকে নিজের আসনে বসিল। বুলকন্ তখন ছাপাখানার বাহিরে চলিয়া গেল। কিন্তু পরক্ষণেই জানিতে পারিল—সাহেবরা তাহাকে ধরিবার হুকুম দিয়াছে, তাহার মত ভয়ংকর আততায়ীকে ধরিবার জন্য থানায়ও সংবাদ প্রেরণ করিয়াছে। এবার বুলকন গৃহে ফিরিল।

আজমগড়ের গাঁও। মাত্র সাত আট মাস রহিল ঘরে। বিবাহও করিল ইতিমধ্যে। ঠিক হইল কাজ করিবে নিকটের শহরে। কী কাজ সে না জানে? লোহারের, মুটের, মোটরের ক্লিনারের, ছাপাখানার ছোট খাটো কল চালাইবার কাজ, আরও কত কী সে এই পাঁচ বছরে না করিয়াছে! বহু, বহু। মোটর বাস তখন ইউ-পীর পথে পথে শহরে গ্রামে ছুটিতে আরম্ভ করিয়াছে। বুলকনেরও মোটরের কাজ মিলিল এক বাসওয়ালার বাসের আড্ডায়। কিন্তু সেখানে কাজে মন বসিল না; ওই শহরে তাহার মন টিকিল না। সে কলিকাতার মানুষ—কলিকাতার মায়া তাহাকে আকর্ষণ করিল। হাঁ, কাজই যদি করিতে হয় তবে কলিকাতায়। বুলকন কলিকাতায় ফিরিল।

আজমগড়েরই আখড়ায় পরিচয় হইয়াছিল হরনন্দন সিংএর সঙ্গে; কলিকাতায় ট্রামে সে কাজ করে। হরনন্দনের সাহায্যে বুলকন প্রবেশ করিল ট্রামের কন্‌ডাক্টারের কাজে। বুলকন লেখাপড়া জানে, কিছু ঘুষ তবু তাহাকে দিতে হইয়াছিল। সেই-সব হরনন্দন ব্যবস্থা করে; বুলকন পরে শোধ করিয়াছে। ফিরিঙ্গি সাহেব দেখিয়াছিল তাহার জোয়ান চেহারা, চওড়া সিনা, লম্বা দেহ, শক্ত হাত, সবল পেশী, মোটা মোটা হাড়, চোয়ালের হাড়ে মুখের পেশিতে, সমস্ত মুখের গড়নে, একটা সুস্থ শক্তিমান মানুষ। হয়ত বুদ্ধি তত তীক্ষ্ণ নয়, কিন্তু স্বাস্থ্য-সুন্দর দেহে যে একটা তেজ ও মর্যাদাবোধের চিহ্ন আছে, তাহাতে ব্যক্তিত্বের একটা আভাস ফোটে নাই কি?…অগ্রাহ্য করিতে পারে নাই অমিতও তাই যখন সে প্রথম দেখিয়াছিল বুলকনকে।

সেদিনকার আরও কত পরিচিত মুখ স্মৃতির পট হইতে মুছিয়া গিয়াছে। তাহাদের কাহারও মুখে শান্ত শ্রী ছিল, কাহারও মুখে ছিল বুদ্ধির ঐশ্বর্য, কাহারও সাধারণ মানুষের সহজ সাধারণ মুখ—যাহার অন্তরালে থাকে কোনো না কোনো অসাধারণত্বের প্রচ্ছন্ন স্বাক্ষর,—কোথায় তাহারা চলিয়া গেল? অমিতের মনে বুলকন স্থান করিয়া রহিল কিরূপে?…

ইউনিয়নের আন্দোলনের মধ্য দিয়া সে দিনের পর দিন শ্রমিক আন্দোলনের উৎসাহী উদ্যমশীল কর্মী হইয়া উঠিল, শুধু এই বলিয়া কি? অনেকাংশে তাহা সত্য; নিশ্চয়ই সত্য। না হইলে আরও কত কত মানুষের মত চোখের অদর্শনে বুলকনও মনের অচেনা হইয়া উঠিত, জীবন যাত্রার সাধারণ নিয়মে অমিতের স্মৃতির পরিধি ছাড়িয়া বিস্মৃতির দিগন্ত-জোড়া শূন্যে গিয়া পড়িত বুলকন্। কিন্তু তাহা হয় নাই।

বুলকন পূর্বাপর আপনার কার্যবলে অমিতের মনের আশা-ঔৎসুক্যের ক্ষেত্রে ক্ষণে ক্ষণে আপনার অস্তিত্ব জানাইয়া দিয়া গিয়াছে। কত হরতালে কত আন্দোলনে, কত মিছিলে, ট্রাম-ইউনিয়নের কত উদ্যম আয়োজনে বুলকন স্বাভাবিক ভাবেই আগাইয়া আসিয়াছে। আর অমিতের কেন, এমন বহু দিকের বহু সুহৃদের নিকট পরিচিত-নামা, পরিচিত-কর্ম বন্ধু হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তবু অমিতের মনে পড়ে বুলকনকে প্রথম যখন সে দেখে সেই বৎসর দশেক পূর্বে—তখনো স্বল্পভাষী বুল্‌কন্ তাহার মনে একটা না একটা দাগ করিয়াছিল… ট্রামের উর্দিপরিধানে, দীর্ঘ ঋজু, দৃঢ় গঠিত দেহ; মুখে চোখে কপালে একটা স্বাস্থ্য-মার্জিত তেজ; আর চোয়ালে চিবুকে একটা শক্তি,—দৃঢ় প্রতিজ্ঞার আভাস। এ মানুষ বুদ্ধিমান না হউক চরিত্রবান।…হাঁ, চরিত্রবান্।—কী সেই চরিত্র? না, তাহা জানি না। বুলকন স্ত্রী মদ্য মাংস তৈল অলাবু সম্পর্কে এদেশীয় বিধি-নিষেধ মানিয়া কতটা সচ্চরিত্রতার আদর্শ রক্ষা করে জানি না। কিন্তু স্ত্রী মদ্য মাংস অলাবু প্রকৃতি ওই মহামূল্যবান উপাদানগুলি সব সমমূল্যের নয়। মানুষের চরিত্র-গঠনেও স্ত্রী মদ্য মাংসের সম্পর্ক বড় কথা নয়—নিশ্চয়ই প্রধান কথাও নয়। প্রধান কথা কি তবে, অমিত? সুস্থ

জীবন-বোধ আর সুস্থ জীবন-যাত্রা? অথবা, প্রথম সুস্থ জীবন-যাত্রা আর তারপর সুস্থ জীবন-বোধ—এ দেশের সমস্ত জীবন-দর্শনে কার্যত যাহা স্বীকৃত হয় নি। যা'ই হোক, স্ত্রী-মদ্য-মাংস-অলাবুর ভোগ দিয়া নয়, ত্যাগ দিয়াও নয়, অন্ততঃ ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করিয়া কিছুতেই নয় সচ্চরিত্রতা।......

সেদিন অমিত এত কথা ভাবিবার হেতু দেখে নাই। দেখিয়াছে কত জনের মত বুলকনকে এক ঘর ট্রাম শ্রমিকের মধ্যে একজন ট্রাম শ্রমিক। কিন্তু দেখিয়া মনে হইয়াছে, ইহার মধ্যে সম্ভাবনা আছে।...এমন কত জনকে দেখিয়াই অমিত ভুল করিয়াছে। কর্মক্ষেত্রের বিচারে তাহারা টিঁকে নাই—জীবন সকলকে ঝাড়াই-বাছাই করিয়া লয়—লইয়াছে যেমন ইন্দ্রাণীকে, অমিতকে। কিন্তু শ্রমিকের শ্রেণী-সংগ্রাম আরও কঠিন পরীক্ষা-ক্ষেত্র;—আরও কঠিন তাহার ঝাড়াই-বাছাই। কত জন কত দীর্ঘদিন টিঁকিয়াও আর শেষ পর্যন্ত টিঁকে নাই। কিংবা টিঁকিবে না। কারণ, চরিত্র যত দৃঢ় যত সুগঠিত হোক, তাহাও পরিবর্তনীয়। কী তাহার ফুটিবে কী তাহার ঝরিবে, কী তাহার থাকিবে চিরকালের মত, কেহ তাহা বলিতে পারে কি? কিছুটা হয়ত বুঝিতে পারা যায়,—কিন্তু সে আভাসও মিথ্যা হইয়া যাইতে পারে জীবনের বিচারে,—অথবা নিজের আলস্যে, আর নিজের চাতুর্য-বিলাসে, আত্ম-প্রতারণায়। কিন্তু তবু বুঝা যায় না কি একেবারে কিছু? যায়; বুঝা যায় যাহা তাহা সেই 'সম্ভাবনা'।...

সেই সম্ভাবনাই দেখিয়াছিল অমিত বুলকনের মধ্যে।—উহার বেশি কিছু নয়। সে সম্ভাবনা ফুটিতেও পারিত, ঝরিয়া যাইতেও পারিত। কিন্তু ঝরিয়া গেল না। যুদ্ধের প্রথম পর্বেই ট্রাম শ্রমিকেরা হঠাৎ একটা ধর্মঘটে নামিয়া পড়িল। জয় তাহাদের স্বীকৃত হইল—এই প্রথম জয় তাহাদের ইতিহাসে। তারপর, সপ্তাহ খানেক পরেই আসিল দ্বিতীয় ধর্মঘট।—dizzy with success. প্রথম জয়ের নেশায় মাথা উষ্ণ হইয়া উঠিয়াছিল কি? নিশ্চয়ই হইয়াছিল কতকটা। ইউনিয়নকে ভাঙিবার সুযোগে সেদিন 'ফুট' খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল কত রকমের লোক, কত রকমের 'দালাল' নেতা।

বুল্‌কন্‌ এই লড়াইতেও নামিয়াছিল উৎসাহে। হাঁ, ইয়াকুব কি অবধ প্রসাদের মত তাহার দ্বিধা ছিল না একটুও। না হয় না হইয়াছে বিজয়ের ফল-সংগ্রহ, না হইয়াছে ইউনিয়নের শক্তি সংহত; তবু লড়াই করিতে ভয় কি? কিন্তু ভয়টা বুঝিল সে ক্রমে 'দালালদের' কাণ্ড দেখিয়া। ইউনিয়নকে অগ্রাহ্য করিয়া তাহারা প্রত্যেকেই সাধারণ মজুরকে নিজ নিজ কাণ্ডজে ইউনিয়নের মধ্যে টানিয়া আনিতে চাহিতেছে, মালিকদের গোপনে-গোপনে প্রতিশ্রুতি দিয়াছে তাহারা ট্রাম ইউনিয়নকে এইভাবে বানচাল করিবে। মালিকেরাও অবশ্য তাই এই 'দালাল নেতাদিগকে' খানিকটা আপোষ করিবার মত সুবিধা করিয়া দিবে। তারপর মালিকেরই স্বপক্ষে, মালিকেরই বেনামীতে চলিবে দালাল-গড়া সেই নতুন ইউনিয়ন। দেখিয়া শুনিয়া বুলকনের নিকট সাফ্‌ হইয়া গেল অনেক বড় বড় বাবুর বড় বড় বুলি ও মতলব্‌। সাফ্‌ হইয়া গেল ধর্মঘটের পরীক্ষায় অনেক পলিটিকস্‌। বুলকন বুঝিল—পথ সীধা, রাহা এক। দ্বিতীয়-বারের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ট্রাম মজদুর তাই যখন যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্বের মধ্যে আবার দোদুল্যমান—তখন বুলকনের মনে আর কোন দ্বিধা নাই। হিট্‌লার তখন ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে মজদুর-কিসানের বিরুদ্ধে—অবধ প্রসাদ অনেক বিচার করিয়া মানিয়া লইয়াছে, হাঁ, এখন ধর্মঘট নয়, কংগ্রেস নেতারা বলিলেও নয়। কিন্তু মনে-মনে অবধপ্রসাদ গ্লানিবোধ করিয়াছে—স্বাধীনতার একটা সুযোগ হারাইতেছে দেশ—মজদুরদের এই যুদ্ধনীতিতে। হিন্দুস্থানের মজদুর হিন্দুস্থানের আজাদীর মওকা গ্রহণ করিল না। কিন্তু বুলকন্‌ তাহা মানে নাই। ধর্মঘটের স্বপক্ষে সে বরাবর, কিন্তু এখন এই ধর্মঘটের উস্কানি দিতেছে কে? সেই দালাল নেতারা। না, মজদুর-কিসান রাষ্ট্রে যখন ফ্যাশিস্ত দুষমন্‌ হানা দিয়াছে সকল মজদুরের তখন লড়াই করিতে হইবে ফ্যাশিস্তদের বিরুদ্ধেই,—লড়াই চালাইতে হইবে সেই মজুর-কিসান রাষ্ট্রের স্বপক্ষে।—

সাফ্‌ এই বাত্‌—সীধী বাত্‌।

অমিত সেই বুলকনকে দেখিল নতুন চক্ষে তখন। কথা এখনো বলিতে শিখে নাই বুলকন, কিন্তু চলিতে শিখিয়াছে আরও মাথা উঁচু করিয়া, আর চলে স্থির

পদে। ইউনিয়ন আপিসে যাহা-যাহা বলে, বলে আরও দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে। ঝাপসা নয় তাহার নিকট কোনো কথা—ধর্মঘট না হউক, লড়াই ত করিতেই হইবে ব্রিটিশ শাহান্‌শাহীর বিরুদ্ধে। "ছিন্" লইতে হইবে 'জাতীয় সরকার।'—কংগ্রেস না পারে, মজুরেরাই তাহা করিবে।

বোমা-বাজির ও আকালের দিন আসিল তারপর। একটার পর একটা প্রয়াসের মধ্য দিয়া সংগ্রামের চেতনা ও শ্রেণী-চেতনার ধার যেন কমিয়া আসিতেছিল···কাজের মধ্যেও যেন তখন কাজ পায় নাই বুলকন্।

তারপর যুদ্ধ থামিল। সঙ্গে সঙ্গে বাধিয়া গেল বড় হরতাল। এক মুহূর্তে বুলকনের শুষ্কপ্রায় তেজ যেন জীইয়া উঠিল। তখন খোঁজ রাখে নাই অমিত তাহার, রাখা হয়ত সহজ সাধ্যও হইত না। ঝড়ের মত তখন পাড়া হইতে পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়ায় বুলকনরা—অমিত দেখে ট্রাম-শূন্য পথ, এসপ্লানেডের ফাঁকা কেন্দ্র যেন খাঁ খাঁ করে। মরিচা পড়িতে শুরু করিল দেড় মাসে ট্রামের ঝক-ঝকে লাইনের উপর। তারপর বিজয়ী ট্রাম মজদুর বিজয় গৌরবে বাহির করে ট্রাম কলিকাতার পথে। যুদ্ধান্তের বিপ্লবী দিনের উদ্বোধন করিয়া দিল যেন ট্রামের মজদুর—বিপ্লবী আলোড়ন যখন পর্যন্ত আসিয়া লাগে নাই এদেশের আর-কোনো প্রতিষ্ঠানের চেতনায়। তারপর? ধর্মতলার হত্যা, রশিদ আলি দিনের বিদ্রোহী-অভিযান, উনত্রিশে জুলাই'র শ্রমিক মহোৎসব—'বাহাদুর ট্রামকা মজদুর।' কলিকাতায় কেন, সারা ভারতবর্ষে তাহারা আপনাদের এই প্রশংসাধ্বনি শুনিয়াছে—'বাহাদুর ট্রামকা মজদুর'। ছেচল্লিশের আগষ্টের হিন্দু-মুসলমান হত্যায় আত্মহত্যা করিল না তাহারা, কলিকাতার মজদুর শ্রেণী; মরিল না তাহারা দেশ-বিভাগের ঝড়েও। মরিতে বসিয়াছিল বরং পরে নিজেদের দ্বিধায় সংকোচে,—'দালালদের' সেই প্রথম দিন হইতে নির্মমভাবে ধ্বংস না করিয়া। ইউনিয়নের 'গল্‌তি' হইয়াছে সেখানে—কংগ্রেস আর সোশ্যালিষ্টদের দালাল ও গুণ্ডাদের প্রথমাবধিই কেন দূর করে নাই ট্রাম-এলেকা হইতে? তাহা করে নাই অবশ্য হেড্ আপিসের বাবু-মেম্বর আর ট্রাফিকের বিহারী-হিন্দুস্থানী মেম্বরদের জন্য। উহারা বাবু জয়প্রকাশ বা বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের নাম জপিয়া

উদ্ধার পাইতে চায়। কিন্তু এই 'বাবুদের' ভয়ে মজদুর ইউনিয়নও হাত গুটাইয়া থাকিল কেন? 'হিন্দুস্থানী-বাঙ্গালী', ও-সওয়াল তুলিলেই হইল? লীগও তো তুলিত মজহবের সওয়াল? তেমনি এভি বিলকুল ঝুটা—এই 'প্রান্তিক সওয়াল, 'হিন্দুস্থানী-বাঙ্গালী'।

কাঁহে কি,—বুলকন আপনার ভাষায় বলিতে থাকিত,—মজদুর কী কোই মুলুক নেহি হ্যায়—বিনা এক মুলুক,—হামারা সোভিয়েট-দেশ। 'আর যাঁহা মেরা কাম বঁহা মেরা ধাম।' হাম বাঙ্গাল কা মজদুর হুঁায়—ইউ-পী'কা কিসান, ইয়া লোহার নেহি হুঁায়। হামি বাঙ্গালী আছি।—মনে পড়িতেই আপনার বাঙ্গালীত্বের দাবী বুলকন-নিজস্ব বাঙলায় ততক্ষণাৎ পেশ করিতে লাগিল।—হামি বাঙ্গালী আছি—বাঙলা বুলি বলি, বাঙলায় কাজ করি—

হাসিয়া উঠিত কমরেডরা অমনি বুলকনের কথায়। বুলকন্‌ও হাসিত, বুঝিতে পারে অনেকখানি সদিচ্ছা রহিয়াছে অন্যদের হাসিতে। বলিষ্ঠ মুখের দৃঢ় পেশীতে তাই একটি স্নিগ্ধ আভা দেখা দিত—চোখে আসিত একটি শিশুর সলজ্জতা।

বাঙ্গালী বাবুরা বলিত, কমরেড্ বুলকন্, কেয়া, ঘরমে বলোগে ই বাত?

বেসক্।—পরক্ষণেই বুলকন বাঙ্গলায় জানায়,—বলেছি, হামি ঠিক বলেছি—হামি বঙ্গাল দেশে থাকি, বঙ্গাল ভাষা বলি, বঙ্গাল পার্টির মেম্বর,—হামি বঙ্গালী নহি তো কি?

এবার হাসিতে হাসিতে বন্ধুরা বলে, কিন্তু ঘরের লোকেরা কি জবাব দেয় বুলকন?—তোমার বাঙালা ভাষা শুনে।

লজ্জিত শিশুর হাসি পরিণত হয় যুবকের লজ্জায়, আর সকল দেহে জাগে কোমলতা। ঘরের লোকের কথা বলিতে এখনো লজ্জিত বোধ করে বুলকন। হাসিয়াই বলে, হামার ছোটভাই বলে :—'হামরা ভি আউধের আদমি, আবধী বলি, হিন্দুস্তানী পড়ি, হামরা তাই ইউ, পী'র হিন্দুস্তানী আছি।

হাসিয়া উঠে সকলে। কিন্তু উহারা হাসিলেও উপহাস মনে করে না বুলকন। বলে, সাচ্চী বাৎ!—ঠিক কথা। ওরা ক্ষেতি করে, গ্রামে থাকে, আজমগড়ের কৃষক লড়াইতে সামিল হয় ওরা; ওরা হিন্দুস্থানী ছাড়া কি হইবে?

যাহারা কিসান তাহাদের ঘর আছে, দেশ আছে; যাহারা মজদুর তাহাদের ঘর নাই, দেশ নাই—বুলকনের এই সহজ যুক্তি। অতএব বুলকন বাঙালার মানুষ; আর তাহার বাড়ির লোকেরা ইউ, পী'র হিন্দুস্থানী। বুলকন যদি দেশে ফিরিয়া যায়?—যাইবে কি? না, সে যাইবে না। সে এখানকার মজদুর আন্দোলনের মধ্যে আপনাকে চিনিয়াছে, সে ঘরে ফিরিয়া গিয়া কিসানী করিতে পারিবে না—তাহার ভাইয়ের মত; লোহারের কাজও করিতে পারিবে না—আত্মীয় কুটুম্বদের মত। তবু যদি কোনোদিন ফিরিতে হয় ইউ-পী'তে, ফিরিবে।—মজুরের দেশ নাই। সেখানকার মজদুর আন্দোলনে যোগদান করিবে, কানপুরের মজদুর আন্দোলনে গিয়া জুটিবে—ইউসুফ যেখানে নেতা, মজদুর পার্টির কাজে লাগিবে, লড়াই চালাইবে, বস্, মজদুর আপনা লড়াই হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে না।

অতি অল্প হইলেও অমিত শুনিয়াছে বুলকনের এই সব কথা। শুনিয়া হাসিয়াছে, আনন্দ জানাইয়াছে, আবার ভুলিয়াও গিয়াছে। ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত, বাঙলা বিভক্ত—অমিতের সেই ব্যথা কি বুলকনরা বুঝিবে? একটা কথাই শুধু বুলকন জানে—মজদুর লড়াই না করিলে মজদুর থাকে না; মজদুর মজদুর ছাড়া আর কিছু নয়, আর কিছু পরিচয় তাহার নাই।

সেক্‌সেনের সংগঠক হিসাবে বুলকন কাল রাত্রিতে ট্রাম-শ্রমিকের মেস্ হইতে খাইয়া আসিয়া ঘুমাইতেছিল পার্টির এই দক্ষিণ পাড়ার আপিসে—আপিস থাকে তাহার জিম্মায়। রাত্রি শেষ না হইতেই দুয়ারে ধাক্কা পড়িল। দুয়ার খুলিয়া বুলকন দেখে পুলিশ। তখন বুঝিতেই পারে নাই কি ব্যাপার। এখানে আসিয়া ক্রমশ বুঝিল—বড় রকমেরই একটা হামলা চালাইতেছে মালিকী সরকার। দেখিয়া কিন্তু সে আশ্বস্ত হইয়াছে—ট্রাম শ্রমিক আর কেহই গ্রেপ্তার হয় নাই। পূর্বেই কি করিয়া তাহারা বুঝিয়াছিল, রাত্রিতে একটা বড় রকমের পুলিশ আক্রমণের ব্যবস্থা হইয়াছে। তাই উল্লেখযোগ্য যাহারা সকলকেই তাহারা জানাইয়া দিয়াছে, তাহারা কেহ ধরা পড়ে নাই। শুনিয়া বুলকন উৎসাহিত হইয়াছে—'বাহাদুর ট্রামের মজদুর'। এবারও ঠকাইতে পারে নাই শত্রুরা তাহাদের।

তাহার পর বুলকনের মনে আপশোষ জাগিতেছে—সে কেন পালাইতে পারিল না! এক সে, ট্রামের একটিমাত্র মজদুর, না জানিয়া ধরা পড়িয়া গেল। না হইলে ট্রামের মান আরও কত বাড়িয়া যাইত। মোতাহেরের নিকট বসিয়া বসিয়া নিজের লজ্জায় অনুশোচনা জানাইয়াছে প্রথম তাই বুলকন। মাষ্টার সাহেবের নিকট জানাইয়াছে তাহার মনের বেদনা ও আপশোষ—শুধু একজন লোকের জন্ম ট্রামের বাহাদুর শ্রমিকেরা বলিতে পারিল না তাহারা সকলেই শত্রুকে ফাঁকি দিয়াছে। মাষ্টার সাহেবের সঙ্গে আলোচনা করিয়াছে—ট্রাম শ্রমিকের মধ্যে কে-কে এখন ভালো কাজ করিতে পারিবে। মোতাহেরর সঙ্গে আলোচনা করিয়াছে কি করিয়া তাহাদের ট্রাম ইউনিয়নকে জীয়াইয়া রাখা যায়—সব যখন বে-আইনী হইতেছে তখন কিছুইত আর সহজ ভাবে চলিবে না। কিন্তু মোতাহের ট্রামের প্রসঙ্গ এখন ভাবিতে চাহে না। তাহার ভাবনা—কি হইল আয়রন ষ্টিলে? কি হইল চটকলের ইউনিয়নের? নানা লোকের সঙ্গে কথা বলিতেছিল মোতাহের। কাহাকেও বুঝাইতেছে—দেখাই যাক না, সত্যই সকলকে ধরিয়া রাখে কিনা। খাবার খাইবার পর ফাঁক পাইয়া সে এখন নিজেও জুটিয়া গিয়াছে এই তাস খেলায়। আর ইংরেজি না-জানা বুলকন তাই বাধ্য হইয়া এখন একা বসিয়া আছে, খেলায় মোতাহের বা সৈয়দ-আলীর উৎসাহ দেখিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিতেছে, নিজে নিজেই বলিতেছে, 'ই ঠিক-নেহি হ্যায়।'

কি করিবে ইহারা তবে?—অমিত তাহার নিকটে আগাইয়া বসে, জিজ্ঞাসা করে। বুলকনও টান হইয়া বসে—কেন করিবার মত কি কাজ নাই? সবাই বলিতেছে পার্টি বে-আইনী করা হইয়াছে, আপিস তালাবন্ধ করিয়াছে; সংবাদ পত্র ছাপাখানা পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত করিবে। দুশমন্ ত তাহার আক্রমণ পুরাপুরি আরম্ভ করিয়াছে, আর আমাদেরই করিবার কিছু নাই? স্রেফ্ তাস খেলিব?—

করবার নাই কে বলে? অমিত বলিল, বরং করবার কাজ দশগুণ ছেড়ে শতগুণ বেড়ে গেল। কিন্তু এখানে বসে এখন আমরা কি করব?

পুছিয়ে,—বলিয়াই বুলকন আবার বাঙলায় শুরু করিল, সে বাঙালার মজদুর যে,—সবাইকে পুছুন।—কে কোথায় ধরা পড়িল, কি ভাবে ধরা পড়িল, কার সঙ্গে ধরা পড়িল, কি কি ফেলিয়া আসিল বাড়ি। কোথায় কি কাগজ পত্র ছিল; পুলিশ কি কাগজ পত্র পাইল,—মাষ্টার সাহেব ছাড়া একজন কমরেড্ও বুলকনকে এই সব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে নাই। এই সব তথ্য সংগ্রহ করুক না অমিতেরা। অমিত সবাইকে চিনে না। না, চিনে বটে, তবে এখন সে কর্মসূত্রে মজুরদের পরিচিত নয়। বই-এর দোকানের কাজে সে সাধারণত এই তিন বছর লেখকদের সঙ্গেই বেশি পরিচিত হইয়াছে। বেশ, অমিত সকলকে না জানুক, মোতাহের আছে। মোতাহের ট্রেড্ ইউনিয়নের পুরাতন কর্মী,—কাহাকে সে না চিনে? কিন্তু সে দিকে তাহাদের কোন লক্ষ্য নাই? কেহ সিগারেট পিতেছে, কেহ পান খাওয়াইতেছে। কিন্তু এইটা কি পান সিগারেট খাইবার জায়গা, না, এই তাহার সময়? সৈয়দ আলী সাহেব পুরাতন লোক, তিনি না হয় গল্প করিলেন। কিন্তু গল্প করিলে পুরানো দিনের গল্প করুন,—বাউরিয়া চট্কলের পুরানো ধর্মঘটের কথা, লিলুয়ার ছাব্বিশ সালের ধর্মঘটের কথা। বিনোদ দাদা আসিয়াছেন, মথুরা দাদা আসিয়াছেন,—পুরানা ক্রন্তিকারী আদমী তাহারা; কত জেল, কত কালা পানি পার হইয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট হইতে কি ভাবে জেলে থাকিতে হইবে, সেখানে লড়িতে হইবে, সেই সব কথাই বুঝিয়া লউক এবেলা সকলে। ইহার পরে কোনখানে কাহাকে চালান দিবে—তখন কি আর কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিবার মত লোক পাইবে বুলকনরা?

অমিত বলিল, তা পাবেন, কমরেড্ বুলকন। আপাততঃ হয়ত সকলকে লালবাজারের হাজতে কিংবা আলীপুরের জেলে পাঠাবে।

ক্যায়সে জানতা হ্যাঁয়?

অনুমান করিয়া বলিতেছে অমিত। কর্মচারীরা বলিল—এখনো ঠিক হয় নাই কিছু। কর্তারা ক্যাবিনেট মিটিং করিয়া ভাবিতেছে। ভাবিবে আর কি? তাহাদের বে-আইনী করিবার সিদ্ধান্ত যখন করিয়াছে ও গ্রেফতারের তালিকা

যখন প্রস্তুত হইয়াছে, তখনি নিশ্চয় এসব কথা আগেই ভাবিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু তখন হয়ত ভাবিয়া রাখে নাই যে, তালিকার লোক অনেকেই যদি জাল হইতে ফস্‌কাইয়া যায় আর জালে ঠেকিয়া ওঠে চুনাপুঁটি, তোমার আমার মত অপ্রত্যাশিত শামুকগুগ্‌লি, তাহা হইলে তাহাদের কি ব্যবস্থা করিবে। রুই কাতলার জন্য যে ব্যবস্থা ছিল, চুনাপুঁটিকেও কি সেই ব্যবস্থার গৌরব দান করা উচিত? প্রশ্নটা জটিল। ক্যাবিনেটে সপারিষদ হিজ একসেলেন্‌সি শ্রীচক্রবর্ত্তী রাজাগোপালাচারীর পক্ষে দিন পনের লাগিবে বৈ কি এই গভীর কথা ভাবিতে। ততদিন লালবাজার হাজতে, নয়, আলীপুর জেলে। এই সদ্য ব্যবস্থা ভাবিতেও সেক্রেটারিয়েটের ও ক্যাবিনেটের কম সময় লাগিবার কথা নয়। অন্তত, একটা পুরা 'লাঞ্চ' উদরস্থ না করিতে মাথা ঠাণ্ডা হইবে না ক্যাবিনেটের কর্ত্তাদের ও পুলিশ-রাজের।

আউর হামরা লিয়ে ইধার পানি ভি নেহি মিলেগী?—ক্রুদ্ধকণ্ঠে কহিল বুলকন্। আমাদের জন্য এক গ্লাস জলও হবে না।

অমিত জানিত, তাই বলিল, কাল হোলি গিয়েছে। ওদের আপিস আজও বন্ধ। তাই কিছু নেই, না হলে এখানে একটা 'টিফিন' ঘর আছে কর্মচারীদের, সেখানে চা ও জল পাওয়া যেত।

ছুটি আছে ত সে হামার কি? গিরিফতার করবার সময় ত ছুটি থাকে না। কেবল হামার রুটি-পানির বেলা ছুটি থাকে।—রীতিমত এইবার চটিয়াছে বুলকন্।

এই বুলকন্‌কেও অমিত দেখিয়াছে,—অবশ্য অল্পই দেখিয়াছে। ভোটের দিনে যখন কংগ্রেসের লাঠি ও ডাণ্ডার প্রহারে কমরেড্‌রা আহত হইয়া ফিরিতেছিল, বুলকন্ তখন অধৈর্য হইয়া উঠিতেছিল—গুণ্ডাশাহীর সঙ্গে মোকাবিলা না করিলে কিসের মজদুর তাহারা? কিন্তু 'মোকাবিলার' অনুমোদন সে তবু পায় নাই। তখন আপিসের বারান্দায় বাহির হইয়া গিয়া সে ক্ষুব্ধ নিম্ন স্বরে বার বার বলিয়াছে—'বাহা রে হুকুম। জিতনী অহিংসা উহী হামারা হাসিল করনা;—আর জিতনী গুণ্ডাবাজি উ মালিককা জাহির করনা।'

চোখে তাহার আগুণের ছটা ; মাংসপেশী ক্রোধে ঘৃণায় কুঞ্চিত ; রাগে গরগর করিতেছে। সে স্থির হইয়া দাঁড়াইতেও পারে না, কিন্তু সংযম হারাইয়া ফেলিবার মত আত্মবিস্মৃতিও তাহার নাই। ঘরের এক কোণে বসিয়া তখনো অমিত হাসিতে চেষ্টা করিতেছিল—এই অসঙ্গতিই বুঝি জীবনের কৌতুক।

অমিত বুলকন্‌কে খানিকটা ঠাণ্ডা করিবার জন্যই হাসিয়া একবার বলিতে গেল, তবু ত' রুটি-পানি এখন মিলিয়াছে, কমরেড্। সেদিনে ক্রান্তিবাদীদের এই এলিসিয়াম রোডে রুটি-পানি ত দূরের কথা, মিলিত অশ্রাব্য গালাগালি, ঘুসি, লাথি, ব্যাটারি শক্।—

বুলকন্ আরও ক্রুদ্ধ হইল, তা'ই এখনো সইতে হবে ? মজদুর শ্রেণীরও কি এই 'খেয়াল' ? এই রায় ?

অমিত বুঝিল আর হাসিয়া উড়াইবার পথ নাই। তাই যথাসম্ভব স্থিরভাবে অমিত বলিল, তা'নয়, কমরেড্। বিশ শাল পরে আমরা এসেছি। জনতার শক্তি আজ অনেক বেশি। সাধ্য কি তা করে—যদি হিটলারশাহী ভালো করে এদেশে জেঁকে না বসে। তবে আপনারা শুনতে চাইছিলেন পুরানো দিনের অবস্থা, তাই একটা কথা বললাম।

বুলকন্ শান্ত হইল।—ঠিক বাৎ! কমরেড্ আমি'দাদা। আবার ঐসা হোবে, কংগ্রেস রাজ ঐসাই কোরবে—যদি হামরা এখন থেকে বাধা না দিই, লড়াই না করি। দেখোনা, হল্লা করাতে খাবার আন্‌লে। কিন্তু আমরা চুপ করলে চার চারটে পুরি আর ওই ঐসা রসগোল্লা দিয়ে পালিয়ে গেল। আর তারপর কিনা, হামরা বহিন জী ওই রাস্তায় কল থেকে পানি পিয়ে আস্‌বেন— ইজ্জত থাকবে এইসা চল্‌লে ?

ঐ নাম করে ওরা একটু ঘরের বাইরে বেরুতে পারল—রাস্তা দেখল, ওদের ভালোই লাগল।

সে মানছি হামি, কিন্তু গেলাস মিলবে না, পিয়ালা মিলবে না,—কাঁহে ?

তালাবন্ধ রয়েছে যে ঘরে।

তবে তোড়ো তালা। বাহার করো কপাট ভেঙে গেলাস পেয়ালা—আবার সজোরে বলিল বুলকন্।

অমিত একটু নীরব রহিল। পরিষ্কার বুলকন্-এর সমাধান। তালা যদি বন্ধ থাকে ভাঙো তালা; কিন্তু গেলাস চাই, জল খাইতে হইবে। মজদুরের স্পষ্ট, স্বচ্ছ, সরল সমাধান। অথচ এক মিনিট আগেও কথাটা অমিতের মনে আসে নাই। সে ভাবিতেও পারে নাই। এখনি কি সম্পূর্ণ ভাবিতে পারিতেছে, মানিতেছে—ইহাই ঠিক সমাধান সেই সামান্য সমস্যাটার? না, ইহা হঠকারিতা?

অমিতের দ্বিধা বুলকন্ বুঝিল। মুখের হাসিতে তাহা গোপন করা যায় নাই, হয়ত সকৌতুক সম্মতিতেও তাহা গোপন করা চলিত না বুলকনের নিকট। কারণ কথা ও হাসির পিছনে মন ও মত দেখিবার মত দৃষ্টি বুলকন্ পাইয়াছে তাহার মজদুর জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে, এই সব রাজনৈতিক আন্দোলনের ঘাত-প্রতিঘাত হইতে। নিশ্চয়ই 'অমি'দাদার' কাছে তাহার কথাটা ঠিক মনে হয় নাই—তিনি তাই হাল্‌কা করিতে চাহিবেন কথাটাকে।

বুলকন শান্ত স্বরে তাই জিজ্ঞাসা করিল: কেয়া, ভুল বাত হোলো?

অমিত সামলাইয়া লইতেছিল নিজের বুদ্ধি।—ভুল বাৎ নয়, কমরেড্ বুলকন্। গেলাস, জল, সব চাই; চুপ করে থাকাও উচিত নয়। কিন্তু কথা হল কোথায় কতদূর যাব? এটা থানা,—থানারও বেশি, গোয়েন্দা অপিসের হেড্-কোয়ার্টার। এখানে আমরা ওদের কবলের মধ্যে। ওদের শক্তি বেশি, আমাদের শক্তি কম;—একটু থামিল অমিত। বুলকনের দৃষ্টিতে প্রতিবাদের লক্ষণ ফুটিয়া উঠিতেছে। অমিত বুঝিল, বলিল: কি? এ কি ঠিক কথা নয়?

ই ঠিক নেহি হ্যায়,—বলিল বুলকন্ বেশ দৃঢ় স্বরে। তারপরে বন্ধুর মত অমিতকে বুঝাইতে লাগিল,—কাঁহে কি—হাম ষাট, চৌষট আদমি আছি,—ঠিক। উলোক বেশি আছে; পাহারা খাড়া হ্যায়,—উস লোগংকো হাত মে বন্দুক হ্যায়—ই বিলকুল ঠিক। তব ভি এক বাত খেয়াল রাখ্‌না। নিজের ভাষায় আরম্ভ করিল বুলকন্—পহিলে, দুনিয়াভর আজ মজদুরকী শক্তি জ্যায়দা হ্যায়।—বাঙ্গালমে ভি হাম বঙ্গালকা মজদুর কমজোর নেহি। দোসরা, জিত্‌না

জোশ সে হামরা লড়াই করব, উতনী জলদি হামরাভি শক্তি বাড়বে। তিসরা,—জ্বলিয়া উঠিল বুলকনের চোখ ঘৃণায়, অবজ্ঞায়,—কুত্তা হ্যায় ই-লোক—ডাণ্ডা দেখলাও, তবে মানেগা!—আর আখিরী,—বুক চিতায় আপনারই অজ্ঞাতে বুলকন্,—হাম কমিউনিস্ট্ হ্যায়, না? হো থানা, হো জেলখানা,—হো মিটিংকা ময়দান ইয়া হো মালিককা কারখানা,—হ্যাম কমিউনিস্ট খেয়ালসে-হি চলেঙ্গে, ডাট রহেঙ্গে, আউর লড়াই করেঙ্গে।

সপ্রশংস দৃষ্টিতে অমিত তাকাইয়া রহিল। যুক্তিতে কোথাও অস্পষ্টতা নাই। কিন্তু এই যুক্তি কি জানিত না অমিত? না মানিত না? জানে, মানে। কিন্তু তাই বলিয়া মানিতে পারে কি—এইখানে এখনি একটা মারামারি শুরু করিয়া দিতে হইবে? তাহা কি যুক্তিমুক্ত ও সঙ্গত? না, উন্মত্ততা?

কেয়া, ঠিক নেহি হ্যায়?—জিজ্ঞাসা করিল সহাস্যমুখে বুলকন্।

অমিত বলিল, বিলকুল ঠিক। কমিউনিষ্ট্‌কা লিয়ে হর জায়গা লড়াইকা ময়দান। সহি হ্যায় ই বাৎ।

সহি হ্যায়?—উৎফুল্ল মুখে বলিল বুলকন্, তারপর—তব?

তব্—হরেক জায়গামে হরেক কায়দা হ্যায় লড়াইকা। ইভি খেয়াল কীজিয়ে। হজারও গাঁও আর ক্ষেতি ছোড় দিয়া লালফৌজ, পিছু হট্ গিয়া—কাঁহে, ক্যায়দাসে স্ত্যালিনগ্রাদমে খতম করেগা দুশমনকো।

বুলকন্ এবার খুশী মনে বলিল: ঠিক। লিকিন সবসে পহলে কাম হ্যায়—লড়াইকা খেয়াল। আর ওই খেয়ালসে-হি ফিন্ কায়দাকা খেয়াল ঢুঁড়না। দেখিয়ে—দুশমন্ দের নেহি কিয়া।—আবার বাঙলায় আরম্ভ করিল বুলকন্: হামার আগেই হামার উপর হামলা করছে সে। এখন বাগডোর হামার হাতমে নিতে হোবে—দের করা চলবে না। রক্ষা নেহি, পাল্টা আক্রমণ চালাতে হবে।—

অমিতের বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই, বুলকনের মতে আসল কথা লড়াই,··· এই আসল কথাটা সে কোনো দিনই ভোলে নাই। আমরা ভুলিয়াছি, অন্যেরা ভুলিয়াছে। ভুলাইতে চাহিয়াছিল বুলকনের মত মজুদুরদের; কিন্তু তাহারা ভুলিতে পারে নাই। ক্ষণে ক্ষণে আপত্তি করিয়াছে। আবার লড়াইএর কায়দা সম্বন্ধে

তাহাদের সুনিশ্চিত জ্ঞান নাই বলিয়া মানিয়া লইয়াছে যখনকার যে কার্যক্রম তাহা। কিন্তু অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে উহার সায় তাহারা পায় নাই। তাই কেহ কেহ মুশড়াইয়া গিয়াছে, কেহ বীতশ্রদ্ধ হইয়াছে, আর কেহ বুলকনের মত সমস্ত ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যদিয়া এই সত্যেই আসিয়া পৌছাইয়াছে,—লড়াই-ই শ্রমিক-শ্রেণীর সত্য। সংঘর্ষ, সংগ্রাম আজিকার বিপ্লবের দিনে এই হইল মূল কায়দা, আসল পোলিসি শ্রমিক জীবনের। তারপর ষ্ট্র্যাটেজি, যুদ্ধের ট্যাকটিক্‌স্‌। বিশেষ ক্ষেত্রে চাই বিশেষ কৌশল। কিন্তু অবস্থাটা কি, সেই কথাটা বুলকন তত ভাবিতে চাহে না, ষ্ট্রাটিজির শিক্ষাও আমরা তাহাদের দিই নাই—কোন শিক্ষা আমরা দিয়াছি ইহাদের ? কোন শিক্ষা দিয়াছি তাহা হইলে ?···

অমিত বলিল : ঠিক তাই কমরেড্‌, কিন্তু প্রথম পরিস্থিতির কথা—হালৎ কি ? তারপর জঙ্গ ও ট্যাকটিকসের কথা, অর্থাৎ, কোন জায়গায় আর কোন কৌশল তা ঠিক করা দরকার। ভাবুন—সংগঠনের কথা—এবং পালটা অক্রমণ কি ভাবে চালানো যাবে ; ভেবেছেন ?

এবার সন্তুষ্ট হইল বুলকন, শোচিয়ে। উ কম্‌রেড্‌ আপনারা ঠিক করবেন। তাই তো হামি বল্‌ছি। তা না আপনারা তাস খেল্‌ছেন। কি এখন কোরতে হোবে বলুন। আভি হরতাল হোনা চাই আজ ;—ট্রামমে, রেলমে, পোর্ট ট্রাষ্টমে, ডক্‌মে, লোহা কলমে, চট্‌কলমে, হর কারখানামে, অফিসমে, কলেজ-ইস্কুলমে—হরতাল আব্‌ভি হোনা চাহি। আর ইধর থানা ইয়া জেলখানামে হামরা ভি ঐসব সোর মচানা চাহি। কোথায় কোন কায়দা হবে হামাদের, বিনোদ দাদা, মথুরা দাদা জেলের বাত জানেন ; আর মোতাহের ভাই মাষ্টার সাহেব, আপ সব কমরেড্‌ একসাথ বসুন—ঠিক করুন। আচ্ছা, তাস খেলনে দীজিয়ে উন্‌ লোগ্‌কো। লিকেন ই-খেল কা টাইম্‌ নেহি, লড়াইকা টাইম। ই হ্যায় আসলি বাৎ—

···'লা' দাস, লা'দাস তুঝুর্‌ লা'দাস—'হানো, হানো, হানো বরাবর,'—ফরাসী বিপ্লবের সেই আশ্চর্য মন্ত্র কি ভুলিয়া গিয়াছ ? ভুলিবার উপায় নাই, অমিত, তোমাদের। বিপ্লব আর তোমাদের বিপ্লব-পড়ুয়াদের মুখ চাহিয়া

বসিয়া নাই। সতেরশ উন'নব্বুই নাই; আঠারশ' আটচল্লিশও নাই।—না; আঠার শ একাত্তরও নাই—আজ উনিশ শ আটচল্লিশ! দুনিয়া-ব্যাপী শ্রমিক-বিপ্লবের দিন এ স্পেকটার ইজ্ হন্টিং দি ওয়ার্লর্ড; নয়া দিল্লীর বা লালদীঘির মালিক মস্তিষ্ক মিছিমিছি ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে নাই। কলিকাতার ট্রামের মজদুর '১৩০২ নং',—নাম যাহাদের নম্বরের দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া গিয়াছে,—সেও তাই ঘোষণা করে—'অডাসিটি, অডাসিটি, অলওয়েজ অডাসিটি।' তবু এখনো কোথায় সেই শ্রমিক-নেতৃত্ব এদেশে?—কোথায় বুলকন, কোথায় তোমরা? কয়জন তোমরা আজ সেই সংগ্রামে উদ্যোগী? আর কত লক্ষ লক্ষ তোমাদের দোসর অপেক্ষমান ক্ষেতে, দোকানে, স্কুলে। কে চলিবে পুরোভাগে; কে দিবে সকলকে নেতৃত্ব?…

চারি দিকের মুখগুলির দিকে তাকাইয়া অমিত এইবার জিজ্ঞাসা করিল নিজেকে—সে শ্রমিক নেতৃত্বের বনিয়াদ তোমরা রচনা করতে পারিয়াছ কি, অমিত? বুঝিয়াছ আগামী দিনের আলোক আজিকার দিনের তীরে আসিয়া জানাইয়াছ তাহার উদয়ের বার্তা? সে দিনের সম্ভাবনা কি হইতে চলিয়াছ এদিনের 'সত্য'?… চিনিয়াছ সেই নবজাতককে? তাহা হইলে অভীঃ, অমিত, অভীঃ। তোমার ভাঙাবাঙলায় জোড়া-দেউল উঠিবে; তোমার বিভক্ত ভারতে জন্মাইবে বহু জাতির মহাভারত। ভারতের শ্রমিক নেতৃত্ব তোমার সামনেই তাহার জন্ম ঘোষণা করিতেছে…ঘোষণা করিতেছে তাহার জীবনের মন্ত্র…লা'দাস লা'দাস তুঝুর লা'দাস।

অমিত বলিল: কিন্তু আজ হরতাল করতে পারবে কি এখন কলকাতার মজদুরেরা? জান্নুয়ারীর হরতালেই দেখেছেন ট্রামে কত ভাঙন ধরিয়েছে সোস্যালিষ্টরা।

বুলকনের আলোচনা অন্য খাতে চলিল: সেই ত হামি বলেছি। গলতি হয়েছে আমাদের দু'শাল ধরে। উ সাচ্চা 'দেশভক্ত্', ই আচ্ছা সোস্যালিষ্ট, এসব বলে বলে যত বদমায়েস আর বে-ইমানকে সুবিধা করে দিয়েছি। পহিলা থেকে উদেরকে মার দিয়ে ঠাণ্ডা করলে আজ উ-লোগ্ কি ট্রামে 'ফুট' ধরাতে পারত?

হেড্ আফিসের 'বাবুরা' ইউনিয়ন থেকে ভাগ্‌ত। দু'চার মজদুরও ইধর-উধর ঘুরত। কিন্তু ট্রাম মজদুর আপনা দিমাক আর আপনা ইমান সাফ্ রাখতে পারত—লড়াই মে সব ভাই সামিল হোত। হোবে—এখনো হোবে। লিকেন লড়াই চাহি—উ কৌশিশ বরাবর কোরতে হবে। ট্রামে হরতাল হোবে—আম হরতালের জন্ম ভি আওয়াজ উঠাতে হোবে।

শ্রমিক নেতাদের এই অকারণ গ্রেপ্তারে কলকাতার শ্রমিকশ্রেণী বিচলিত হইবে কি?…গান্ধীজীর নামে শিশুরাষ্ট্র, শিশুরাষ্ট্র বলিয়া কংগ্রেসের ছোট বড় সর্ব নেতারা মিথ্যার বেসাতি খুলিবেন হয়ত ঝুড়ি ঝুড়ি। জেনোভিয়েভ লেটারও আবিষ্কার করিবে। অবশ্য তাহাতেও কুলাইবে না। পুলিস ও মিলিটারি পাহারা ও টহলদার সাঁজোয়া গাড়ী নিশ্চয়ই কলিকাতার পথ ঘাট, রাস্তার মোড়, শ্রমিক বস্তী ও কারখানার দুয়ারে লাঠী, টিয়ার গ্যাস ও গুলি লইয়া প্রস্তুত হইতেছে। শাহানশাহীর এই রূপ কি শ্রমিকশ্রেণী ধরিতে পারিবে না? সাধারণ মানুষই কি চিনিতে পারিয়াছে সাম্রাজ্যবাদের এই মুখোস? চিনিতে পারিয়াছে ছাত্র বা ছাত্রীরা আপিসের গরীব কেরানিরা, শিক্ষকেরা, সাধারণ স্বাধীনতাকামী রাজনৈতিক কর্মীরা, সংবাদপত্রের সাংবাদিকেরা? না, সংবাদ-পত্র ও কংগ্রেসের রাজনৈতিক কর্মীদের সম্বন্ধে কোনো মোহ পোষণ করিবার হেতু নাই আর। ইতিহাসের শেষ বিশ্বাসঘাতক এই বর্ণচোরা জাতীয়তাবাদী, আর শেষ বারবনিতা—তাহার পত্রিকা।

কাছাকাছি এইরূপ আলোচনা চলিতেছে।…সব সত্য।—অমিত জানে, —সবই ইহা সত্য। কিন্তু আরও সত্য এই যে, ইহা জীবন্ত সত্য নয়, সত্যের কংকাল। তাই সত্য নয় এই সংবাদ-ব্যভিচার, সত্য নয় ইঙ্গ-ভারতীয় ধনিক-শ্রেণীদের এই মিথ্যাচার;—সত্য যেমন ছিল না উনিশ শ বিয়াল্লিশেও ব্রিটেনের গুলি আর বন্দুকের দাপট। সত্য নয় তাই অমিতের এই দ্বিখণ্ডিত বাঙলা, বিভক্ত ভারত। সত্য নয় কংগ্রেসও। হাঁ, সত্য নয় অবশ্য আমাদেরও পুঁথিপড়া মজদুরী ও শৌখীন কিসানী। আমাদের পক্ষে সত্য তবু এই যে আমরা রাত্রির শেষ যামে আসিয়া পৌছিয়াছি, আর দিনের দূত আসিয়া

পৌঁছিয়াছে পৃথিবীর দ্বারে। আসিয়াছে শ্রমিক নেতৃত্বের অগ্রদূতেরা। সত্য এই বুলকন...ও কানাই হাজরা, রশীদ ও পার্বতী। আর কাহারা? তপন ও শ্যামল, অণু ও মঞ্জু, বিজয় ও দিলীপ, বিত্তহীন এই নিম্ন মধ্যবিত্ত?

ইহা সম্ভাবনা; ইহাই সত্য হইয়া উঠিতেছে...

কতক্ষণ আর এই রাত্রি, কতক্ষণ ওই অন্ধকার?

একজন গোয়েন্দা কর্মচারীকে দেখিতে পাইয়া মঞ্জু ও ছেলেরা তাহাকে ঘিরিয়া ধরিয়াছিল—আধ ঘণ্টার কথা বলিয়া তাহাদের বাড়ি হইতে আনা হইয়াছে, ব্যবহার্য্য জিনিসপত্র কাপড় চোপড় সঙ্গে পর্যন্ত গ্রহণ করিতে দেওয়া হয় নাই। এখন এ কি কাণ্ড? শীঘ্র ব্যবস্থা করুক কাপড় চোপড় আনাইবার। বেশ ত ফোন্ করুক, বাড়ির কেহ দিয়া যাইবে।—গোয়েন্দা অফিসার ভয়ে ভদ্রতায় জানাইতেছে, আপনাদের কাগজপত্র তৈরী হচ্ছে। তবে ব্যবহার্য জিনিসের জন্য নাম ঠিকানা আপনারা লিখে দিন—আমি সাহেবকে দিচ্ছি। তিনি ব্যবস্থা করবেন, বলেছেন।

নাম ঠিকানা লেখা চলিতে লাগিল। অবশ্য তাহা বুঝিয়া শুঝিয়া লেখা উচিত, গোয়েন্দা আপিস এই নাম ঠিকানা লইয়া কাহার কি করিবে কে জানে? আর সত্যই লিখিয়া কিছু লাভ আছে কি?

আপনার এখানে কি আছে, হাজরাদা'?

আপনার কি আছে, কমরেড্ বুলকন্?

ছিল সব, কিন্তু তাহা আপিস ঘরে পুলিশ সীল করিয়া রাখিয়া গিয়াছে।

আপনার লোক কেউ নেই আর?

'আপনার লোক?' সে তো আপ্‌লোগ।

হাসিল অমিত। বলিল: বস্! শুধু আমরা? ঘরে কেউ নেই?

ঘর'? সে ত পানশ' মিল দুর হ্যায়...

কোথায়? কোন জিলা? কোন গ্রাম?

আজমগড়ের গ্রাম কালাইটিকি, শহর হইতে বেশি দুর নয়। হাঁ, বেশি বড় গ্রাম নয়, একেবারে ছোটও নয়।...ইউ-পী'র একখানা অপরিচিত গ্রামের

ছবি দেখিতে থাকে অমিত।·· তার পর জিজ্ঞাসা করে বাড়িতে কে কে আছে? কত টাকা পাঠাইতে হইত এইখান হইতে? এখন কি করিয়া চলিবে বুলকনের পরিবার—স্ত্রীর ও পুত্র কন্যার?

প্রথম একটু কুণ্ঠা মিশ্রিত ছিল বুলকনের কথা। তারপরে আসিল একটু চিন্তার ছায়া। তারপর কথা চলিল: কষ্ট হোবে উঁহাদের। ছেলেটাকে পড়াইতেছে বুলকন শহরতলীর ইস্কুলে। বরাবর পড়াইবে। মেয়েটি ছোট—তাহাকেও পড়াইবে! পড়াশুনার বয়স হইতেছে তাহারও, কিন্তু তাহাকে শহরে পড়াইতে পাঠানো এখন সম্ভব নয়। উহার মাও ছাড়িতে চাহে না, বুঝিবে না। আইমা আছেন, বুলকনের মা; তিনি আরও শুনিবেন না। পুরানা জমানার লোক তাঁহারা। এই রকমই তাঁহাদের খেয়াল। আজকার দুনিয়ার কিছু তাঁহার বুঝিতে পারেন না। বুলকনের ছোট ভাইই বুঝিতে পারে না। একজন লোহারের কাজ করে, আর একজন কিসানী। কিন্তু বুলকন মজদুর। সে জানে জমানা বুঝা চাই, দুনিয়া দেখা চাই। কিন্তু কিছু লেখা পড়া না শিখিলে দুনিয়া আজ সমঝিয়া ওঠা সহজ নয়। বুলকনই তাহা পারে না। হিন্দীতে বাংলাতে লেনিনের কথার অনুবাদ না হইলে সে-ও কিছুই জানিতে পারে না। তবু ত সে পার্টির মেম্বর, আন্দোলনের মধ্যে আছে, দশজন কমরেডের সঙ্গে সেকথা বলে, তাহাদের কথা শোনে—কত সুবিধা তাহার। কিন্তু কি করিবে তাহার ছেলে? নয় বৎসর তাহার বয়স। কিংবা বুলকনের মেয়ে—পাঁচ বৎসর তাহার বয়স; তাহারা করিবে কি? বুলকন তাহাদের ইস্কুলে পড়াইবে। যতটা পারে তাহারা ততটা শিখিবে। হাঁ, কাজ তাহারাও করিবে; মজুরের ছেলে, মজুরের মেয়ে মজুরের আন্দোলনের কাজ করিবে—ইস্কুলে পড়িলেই বা কি? কিন্তু এখনো তাহারা ইস্কুলে পড়িতেছে না। ছেলে মেয়েকে আনিয়া এখানকার ইস্কুলে পড়িতে না দিলে তাহা সম্ভব হইবে না। এইখানেই বুলকন সেরূপ ব্যবস্থা করিবে, ঠিক করিয়াছিল। স্থির করিয়াছিল দুইমাস পরে ঘরে যাইবে, ঘরের লোকদের কলিকাতায় আনিবে। চেতলা, কি টালিগঞ্জে কমরেড্‌দের বলিতেছে একটা ঘর ঠিক করিতে। ঘর ভাড়া এখন কোথাও পাওয়া যায় না। তবু বুলকনের তাহা পাইতে হইবে। কারণ,

ছেলে-মেয়েদের পড়াইতে হইবে। বাঙলার মজুরের ছেলে-মেয়ে বাঙলায় পড়িবে না, তবে কি ইউ-পীর গাঁওতে কিসানী করিবে? কিন্তু এখন কি করিবে তাহারা? ছেলে মেয়ের খরচ পত্র কি করিয়া চালাইবে? ঘরে বোয়েল আছে, দুধ দেয়। ক্ষেতির কাজও করিতে পারিত তাহার স্ত্রী। না করিলে এখন চলিবে না। কিন্তু কাজ সে করিবে কি করিয়া? অসুখেই সে পড়িয়া থাকে। অসুখের চিকিৎসা ঠিক মত করা হয় নাই—গ্রামে বৈদ্য-ওঝায় মিলিয়া গোলমাল পাকাইতেছে। পাখুরী হইতে পারে। কিন্তু বুলকন শহরে আনিয়া চিকিৎসা না করাইতে কিছু স্থির বুঝিতে পারিতেছে না। এখন আর তাহা কবে হইবে কে জানে?...উহার কষ্ট হইবে, খুব ভুগিতেছে গত দুই তিন মাস যাবৎ।..বোধ হয় আর ভালো হইবে না—দেরী হইয়া গেল। হাঁ, এবার মরিয়াও যাইতে পারে ...কে জানে কি হইবে?...

মুখের চিন্তার ছায়ার সঙ্গে মমতা-ভরা দরদের সুর লাগিয়াছে গলায়।—দৃঢ় দেহ, সবল, তেজীয়ান সেই মজদুর সৈনিকের আড়াল হইতে কথা বলিতেছে এই কে? সেই চিরদিনের মানুষ—মমতায় দুর্বল, স্নেহে জীবন্ত, আর জীবন-বৈচিত্র্যে পরমাশ্চর্য সত্য।

এই মানুষই কি সবার উপরে সত্য?—সর্বাপেক্ষা জীবন্ত সত্য? না সকল মানুষের এই পরম বিকাশকেই সম্ভব করিবার জন্য জানাইতেছে এই মজদুর-মানুষ—উগ্র, লড়াকু মজদুর,—'বাহাদুর মজদুর'—তাহার আহ্বান—

L'audace! L'audace! Tousjours L'audace!

'সম্ভাবনা' কি এইরূপ সত্য হইয়া উঠিতেছে আজ?

'আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন সবিতা দেবী'।

সবিতা দেবী! অমিত কথাটা বিশ্বাস করিতে পারিল না। এখানে কি করিয়া আসিল সবিতা? গোয়েন্দা কর্ম্মচারী ভাবিল অমিত কথাটা বুঝিতে পারে নাই তাই ব্যাখ্যা করিয়া বলিল, বিজয়বাবুর মাসীমা না তিনি? আপনাদেরও আত্মীয়া। ফোন্ পেয়ে বিজয়বাবুর জিনিসপত্র পৌঁছে দিতে এসেছিলেন। আপনার সঙ্গেও সাক্ষাতের অনুমতি পেয়েছেন।

খানিকক্ষণ আগে বিজয়ের ডাক পড়িয়াছিল—বাড়ি হইতে তাহার জিনিসপত্র পৌঁছাইয়া দিতে আসিয়াছেন তাহার মা। বিজয়ের বন্ধুদের সে বলিয়াছে, মা নয়, মাসী হয়ত। বিজয়ের মা জীবিত নেই। বন্ধুরা বলিয়াছে, খাবার নিয়ে এসেছেন নিশ্চয়। আমাদের জন্য নিয়ে আসিস্। আর আমাদের বাড়িতে খবর দিতে বলিস—কাপড়-চোপড় চাই।

মঞ্জু বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে দুয়ার পর্যন্ত চলিল, বলিল, মাসীকে বোলো বাড়ি থেকে আমাদের শাড়ী ব্লাউজ দিয়ে যেতে।

কে বলিয়াছে, শুধু শাড়ী ব্লাউজ মঞ্জু? পাউডার, স্নো, ভ্যানিটি কেস্?

নিশ্চয়ই। আরও দু-চার ঘণ্টা থাকতে হলে ওসব চাই বৈ কি। তোমাদের ছেলেদের না হয় 'গেজাতে' পারলেই হল—স্নান সাবান কিছুই চাই না।—বলিয়া মঞ্জু আবার আসিয়া তাহার পূর্ব্বেকার জায়গাটিতে বসিয়াছে।

বিজয় চলিয়া গিয়াছে। কলরব থামিয়া গিয়াছে। তাহাদের যুবকদের ছোট সেই দলটি আবার নিজেদের কথা লইয়া জমিয়া উঠিয়াছে। কথা অপেক্ষা তাগাতে মঞ্জুর প্রতিবাদ ও দিলীপের তর্কই বেশি। কানাই হাজরার সহিত কথা বলিতে বলিতে অমিত তাহার কথাতেই জমিয়া গিয়াছিল—অনেকদিনের পরিচিত তাহার

এই চব্বিশ পরগণা, তাহার মাঠ-ঘাট, গ্রামজলা আর লাট। তখন কয়জন ছিল সেখানে কর্মী ? আর আজ সেখানে কানাই হাজরার মত মানুষেরা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছে। তাহারাও অমিতকে ছাড়িতে চাহে না এখনো—অবশ্য কলিকাতায় দোকানপত্র, প্রকাশনের কাজ অমিতের এখন প্রধান কার্যক্ষেত্র। কিন্তু ছাড়িবে কেন তাই বলিয়া তাহাকে কানাই হাজরারা ? 'আপনারা হলেন আমাদের গুরু। গুরু মন্ত্র কানে গেল, তবে না উদ্ধারের পথ মিল্‌ল ?'

অমিত হাসিতে থাকে।—এখনো 'গুরু', 'গুরুমন্ত্র' ওসব কথা ছাড়লেন না, হাজরা দা' ?

ও আমরা চাষীরা বল্‌ব। আপনারা বলেন কমরেড্ লেনিন, কমরেড্ স্তালিন। আমরাও নিজেদের বলি 'কমরেড্'—কিন্তু ওঁরা হলেন মহাগুরু। আমরা ত' আবার ওনাদের মন্ত্র পেলাম আপনাদের মুখেই। আপনারাই কি আমাদের ছাড়তে পারেন—গুরুই কি ছাড়তে পারে শিষ্যদের ?

না। সত্যই ছাড়িতে পারে না। অমিত কি ছাড়িতে পারে সেই হাজরাদের ?—অনেক দূরে আজ তাহার কর্মক্ষেত্র! দেহ ও স্বাস্থ্যের দায়ে সে ক্রমশ এই নিয়মিত জীবনযাত্রা ও ধারাবাহিক কাজকর্ম মানিতে বাধ্য হইয়াছে। পূর্ব পরিচয় ফলে গ্রহণ করিয়াছে এই প্রচার-প্রকাশনের কাজ। হয়ত এখনো যোগ দেয় কলিকাতার কোনো মজুর ইউনিয়নের কাজে। কিন্তু আজ অনেক দিন সে পদার্পণও করে নাই হাজরাদা'দের দেশে। এইখানে তাহার পার্শ্বে বসিয়া বসিয়া তথাপি অমিত আজ বুঝিতেছে তাহার জীবনের নানাদিকগামী শিকড় সেই জলা আরা বাদা, ভেড়ি আর কলা-বাগানের মধ্যেকার এই মানুষদের জীবনের মধ্য হইতেও অমিতের জন্য প্রাণরস আহরণ করিয়া আনিয়াছে—অমিতের সত্তার মধ্যে আনিয়া দিয়াছে মাটি-জল, কাদামাখা বাঙলা দেশের মানুষের প্রাণস্পর্শ, মানুষের কথা ; সেই শ্রমজীবিক চেতনা, সে জীবনের অশ্রান্ত শ্রমপরায়ণতা, আর সর্বস্বান্ত, সর্ব-পীড়ন-অত্যাচার জর্জরিত কৃষক-প্রাণের আত্মপরিত্রাণের নবজাত প্রতিজ্ঞা। গুরু কি পারে শিষ্যদের ছাড়িতে—তাহারা যে গুরুরই জীবনের সার্থকতা। অমিতই কি পারে ভুলিতে হাজরাদের ?

তাহাদেরই মধ্যে যে অমিত আপনাকে সার্থক করিয়াছে। আর তাহাদের জীবনে জীবন মিশাইয়া—আপনার সীমাবদ্ধ-সত্তার ঘূর্ণীস্রোত হইতে আপনাকে টানিয়া তুলিয়া—জন-সমুদ্রের জোয়ারে আবার আপনাকে মিলাইয়া দিতে পারিয়াছে।

সেই সীমাবদ্ধ সত্তার মধ্যে একদা তুমি আপন সীমাবদ্ধ স্মৃতি-চেতনা-আবেগে আলোড়িত ছিলে, অমিত ;—বুলকন্‌রা, রশীদরা, কানাই হাজরারা তোমাকে কি আর থাকিতে দিল সেখানে !···

'আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন সবিতা দেবী,'—প্রবহমান স্রোতের মধ্য হইতে হঠাৎ যেন অমিতের চেতনা একটা পুরাতন ঘাঁটি আসিয়া ছুঁইল আবার।

অমিত উঠিয়া ভাবিতে ভাবিতে চলিল 'আপনাদের আত্মীয়া'—সবিতা ? কে হয় তাহার সবিতা ? 'আত্মীয়া'—এই কথা জানিত কি অমিত ? কিন্তু বিজয়েরই কি মাসী সবিতা ? এই কথাও ত অমিত জানিত না। অবশ্য জানিবার কথাও ইহা নয়। বিজয় কলিকাতা-বাসী নয়। এলাহাবাদ না কোথায় বাহিরে পড়িত। অমিতের সহিত তাহার পরিচয়ও ঘনিষ্ঠ হয় নাই। অমিত শুনিয়াছিল রশীদ আলী দিবসের অভ্যুত্থানের সময়ে ফটো তুলিয়া বেড়াইতেছিল বিজয় ; পুলিশের গুলি লাগে তখন বিজয়ের হাতে পায়ে—কলেজের পড়া তখন শেষ করিয়া সে নাকি বিলাত যাইবার অপেক্ষায় ছিল। তারপর ভাঙিল হাত, পা একখানা গেল, শুধু মানুষটা তখনও অটুট স্বাস্থ্যের জোরে টিঁকিয়া রহিল। সেও ফটো তোলা ছাড়িয়া কবিতা লিখিতে শুরু করিল—তখন সে হাসপাতালে। ছাত্ররাজ্যে তাহার খেলার প্রতিভা ছিল স্বীকৃত। অমিত তাহাকে তাই দেখিয়াছে অল্প—সংবাদপত্রের অপিসে, কোনো শিল্পী সভায় কিংবা সাহিত্যবৈঠকে। লাজুক প্রকৃতির, আত্মপ্রকাশ-কুণ্ঠিত, আত্ম-সচেতন যুবক :—আপনার দৈহিক বিড়ম্বনা যেন উহাকে সচেতন ও সংকুচিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছে ; অপরিচিত-গোষ্ঠীতে সে থাকে অপ্রকাশিত।

কিন্তু বিজয়ের মাসী নাকি সবিতা ? অমিতের সঙ্গেও সে দেখা করিবে ? আর দেখা করিবার মত এখানে ব্যবস্থা করিতে পারিল কিরূপে ? ঔৎসুক্য

আগ্রহ চিন্তা এক সঙ্গে অমিতের মনে দোলা দিতেছিল। গোয়েন্দা আপিসের সাক্ষাতের একটা ছোট ঘরে পৌছিতেই অমিতের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—হাঁ, সবিতাই ত। তাহার পার্শ্বে বসিয়া বিজয়। টেবলের অন্য দিকে আর একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক উপবিষ্ট—পাহারা-নিযুক্ত গোয়েন্দা কর্মচারী নিঃসন্দেহ।

সবিতা উঠিয়া দাঁড়াইল। অভ্যাস মত মর্যাদা দেখাইতে অমি'দা'কে? কিন্তু একি, কাঁদিতেছিল নাকি সবিতা? অন্তত চোখের পাতা এখনো যে কেমন ভারী হইয়া আছে—অমিতের জন্য? পাগল নাকি তুমি, অমিত?···

···যৌবনের প্রান্তে আসিয়া গিয়াছে কি সবিতা?

সুমুখী, সুন্দরী, আদরপালিতা সেই সবিতা ঝরিয়া পড়িয়া যাইতেছে যেন। যাইতেছে কেন, গিয়াছেই বলোনা, অমিত! মায়া হয় বলিতে? হয়, না হওয়াই আশ্চর্য। কাহাকে দেখিতে না মায়া হয় যখন যৌবনের বরমাল্য গলায় আসে শুকাইয়া? দেহের তটে-তটে নামে ভাঁটার টান? আর এতো সবিতা।—সুগৌর দেহেও বুঝি আর ঔজ্জ্বল্য থাকে না। চোখের স্থির জ্যোতির উপর পড়-পড় বেদনার ছায়া। চুলের শ্যাম-গুচ্ছ আসিয়াছে ক্রমে হাল্‌কা হইয়া; আর অধরের কোণে, কপোলের তটে, কপালের প্রশস্ত ক্ষেত্রে একটি একটি করিয়া পড়িতেছে কালোরেখা। অর্থাৎ চল্লিশ।—চল্লিশ হইবে কি, সবিতা? প্রায় হইবে। চল্লিশ না হইলেও তাহার উপকূলে। সেই সুডৌল বাহু, সেই সুন্দর নিখুঁত চিবুক—মিলাইয়া যাইতেছে? না, মিলাইয়া গিয়াছে। কিংবা মিলাইয়া দিয়াছে বলাই ঠিক। সত্যই মিলাইয়া দিয়াছে সে তাহা নিজে।···প্রথম যৌবনের বৈধব্যেই আপনার রূপকে অস্বীকারের নেশা জাগে সবিতার প্রাণে। তখনো আমরা জেলে, তাহা দেখি নাই—কিন্তু বুঝিতে পারি তাহা, পরে তাহাকে প্রথম দেখিয়াই। তারপর আপনার সেই আত্মসংযমের গভীর সংকল্পকে সে করিয়া তোলে সুদৃঢ়। আহারে বিহারে, বেশভূষায়—এমন কি, গতিতে, কণ্ঠস্বরে, রুচিতে,—সকল রকমে হিন্দু বিধবা, শান্তশীলা শুদ্ধসত্বা মেয়ে। ভারতীয় প্রাচীন-সভ্যতার পরিশীলনে সে হইতে চাহিল আরও দৃঢ়চিত্ত, নিয়ম-নিষ্ঠ, আদর্শবাদী মানুষ। না, না, মানুষ নয়—

মানুষ হইতে পারিল কই সবিতা? আপনার আদর্শের তাড়নায়, এদেশের হিন্দু ঐতিহ্যের তাগিদে সবিতা মানুষ হইতে পারে নাই,—মানুষ হইতে সে চাহেও নাই।...একেবারেই কি চাহে নাই তাহা?—হাঁ, চাহিয়াছে। চাহিয়াছে; কিন্তু আপনার অগোচরে আর আপনার অনিচ্ছায়...। কিন্তু জানোইত, সবিতা, জীবনেরে কে রোধিতে পারে?

রোধ করা যখন যায় না, অমিত তখন দেখিয়াছে—সবিতার বহুকুণ্ঠিত জীবন যে-কল্পনার মধ্যে দিয়া তখন প্রকাশের পথ করিয়া লইল, তাহাতে সবিতার জীবন আরও জটিল গ্রন্থিতে জড়াইয়া পড়িল। আপনারই অগোচরে যে সরল মীমাংসায় আসিয়া সবিতা ঠেকিয়াছিল, তাহাও সবিতা জানিতে চাহিল না। শেষে জানিল যখন, তখন আরও তাহা মানিতে চাহিল না। ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ! একদিন অমিতের সঙ্গে তাহার বিবাহের কথা হইয়াছিল। আরও অনেকখানেই সেইরূপ কথা হইয়াছিল নিশ্চয়। কিন্তু অমিতের কথাটা তথাপি মনে রহিল, যেহেতু অমিত ছিল তাহার পিতা ব্রজেন্দ্র রায়ের স্নেহভাজন বন্ধুপুত্র। আর যেহেতু অমিত ছিল দীর্ঘ কয় বৎসর জেলে বন্দী। তারপর সবিতার অকাল বৈধব্যের নিরাশ্রয় দিনে সবিতার কল্পনা ব্রজেন্দ্ররায়ের শুভাকাঙ্ক্ষার সূত্র আশ্রয় করিল, যেমন করিল—যেমন করিয়াছিল—অমিতের কল্পনাও সবিতাকে আশ্রয়? কল্পনার সে তাগিদে সে সুযোগে সবিতার জীবন কিন্তু ততক্ষণে আসলে স্থির সুস্থ সহজ হইতে পারিয়াছে অমিতের ভাই মনুকে আশ্রয় করিয়া প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের সূত্রে। মনু তাহার সতীর্থ বন্ধু তখন। জীবনের যে ছলনা সবিতার তখন চোখে পড়ে নাই, মনুরও চোখে পড়ে নাই, অমিতের তাহা চোখে পড়িয়া গেল গৃহে ফিরিতে না ফিরিতে এক মুহূর্তেই। আর তারপর সে সত্য যখন উহাদের সম্মুখে অমিত তুলিয়া ধরিল—এতবড় বিড়ম্বনা বুঝি মানুষের জীবনে আর ঘটে না। ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ! সবিতা মরিয়া যায় আপনার মনেই। তাহার মন জুড়িয়া বসিয়াছে অমি'দাও নয়—মনু'...মনু...তাহার অপেক্ষাও বয়সে যে মনু দুই এক বৎসরের ছোট!... অকুণ্ঠিত চিত্তে যাহাকে সে আপনার সুহৃদ করিয়া লইয়াছে—আর সেই সূত্রে নাকি আপনার করিয়া ফেলিয়াছে।...না, না, না।

জীবন যত বলিল, 'সবিতা স্বীকার করো, স্বীকার করো',—সবিতা ততই জোরে অস্বীকার করিল! 'না, না, না'।

দূরে চলিয়া গেল মন্নু। অমিতদের নিকট হইতে আপনাকেও দূরে সরাইয়া লইল সবিতা। কিন্তু ব্রজেন্দ্র রায়ের মৃত্যুর পরে আবার তাহাদের দেখা হইল। আবার সবিতা বুঝিল—দূর কখনো দুস্তর হইতে পারে না; দূর করিতে পারে নাই এই মাস বৎসর কাহাকেও—মন্নুকেও না, সবিতাকেও না। অমিতের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল সবিতা, আত্মসংগ্রামে ক্ষত-বিক্ষত সে, তবু সে অপরাজিতা। অমি'দা'—পিতার স্নেহভাজন বন্ধু সে,—সে-ই বুঝিবে সবিতার কথা—জীবনে শুধু একটা পথেই মানুষকে সার্থক হইতে হইবে—গৃহ সংসার লইয়া, একি জবরদস্তি জীবনের? সহস্র তাহার পথ, আর কত বিরাট মানুষের জীবন, কত মহৎ সাধনা মানুষের। অমিতই ত বলিত এই মর্মের কথা ব্রজেন্দ্র রায়ের কাছে। সেই মহতের সাধনা সবিতা গ্রহণ করিবে—তাহাই ত ভারতবর্ষের সাধনা; তাহার পিতার চিরদিনকার প্রয়াস, আর তাহার আপন নিয়তির ইঙ্গিত।

অমিত বলিয়াছিল, মহতের সাধনা কোথা? তুমি যা চাও, তাকে বরং মহাত্মাজীর আরাধনা বলো, সবিতা।

সবিতা বলিল, হাঁ, তা'ই। মহতের সাধক বলেই ত তিনি মহাত্মাজী।

অমিত বুঝিল সবিতা সত্যকে গ্রহণ করিতে চাহে না; কল্পনাই তাহার প্রয়োজন। একটা কল্পনা যদি ভাঙিয়া গিয়া থাকে সে বরং গ্রহণ করিবে অন্য একটা কল্পনা।—কিন্তু তবু গ্রহণ করিতে পারিবে না বাস্তব সত্যকে, জীবনকে। তথাপি অমিত বুঝাইতে চাহিল সবিতাকে, কিন্তু সবিতা বুঝিতে চাহিল না। বুঝিবে না।

বুঝিবে না। হয়ত মনোবিজ্ঞানও মিথ্যা বলে না—বুঝিবে না সবিতা। তাহার আপনারই ভিতরে না-বুঝিবার স্বপক্ষে অনেক-অনেক বাধা জমা হইয়া আছে। তাই সে ছলনা ও কল্পনাকে চাহিবে, জীবনের বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করিবে। চাহিবে ফ্যাণ্টাসি—চাহিবে না রিয়ালিটি। কিন্তু কী সেই বাধা সবিতার?

এদেশের বৈধব্যের সাধারণ সংস্কার! কোথায় কবে মরিয়াছে সেই প্রায়-অপরিচিত এক যুবক—বিবাহান্তেই যে ডাক্তারি পড়িতে বিলাত গিয়াছিল—কিন্তু সেই মন্ত্রপড়া সম্পর্কই সবিতার জীবনকে সত্যের সম্মুখীন হইবার সমস্ত শক্তি হইতে বঞ্চিত করিয়া দিয়াছে।···শুধু সেই কল্পনা নয়, অবশ্য সে যুবকটিও নয়। আছে সেই সঙ্গে জীবন-বঞ্চনার ঐতিহ্য, স্বাভাবিক প্রাণধর্মের বিরুদ্ধে ভারতের সমস্ত শাস্ত্রকারের ও সংহিতাকারের নির্বোধ ধিক্কার; আত্মসংযমের নামে কুৎসিৎ আত্মনিগ্রহ; ইন্দ্রিয়নিগ্রহেই যাঁহারা দেখিয়াছেন পরম পুরুষার্থ·· যাঁহারা পরস্ত্রী-মাত্রকেই 'মা' বলিয়া সম্বোধন করিতে শেখান, আর দশ হাজার বৎসর তপস্যার পরে তপোবনের সুদূর প্রান্তে কোনো রমণীর পদার্পণমাত্র 'মদনজ্বালায়' আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়েন—এ দেশের জীবন হইতে তাহাদের এই অভিশাপ মুচিবে কবে? কবে আবার তাহার মেয়েরা, পুরুষেরা সুস্থ সবল স্বাভাবিক জীবনের অধিকারী হইবে?···মধ্যযুগের অচল জীবন-যাত্রার উপর চাপিয়া পড়িয়াছে আবার কলোনির পঙ্কিল পল্বল। কিন্তু কোথায়ই বা জীবন আজ সুস্থ, সবল স্বাভাবিক—বিকারগ্রস্ত এই পৃথিবীতে? ফিউডাল সমাজের বিকৃত পাপ-বোধ আর বুর্জোয়া-সমাজের বিকৃত যৌনবোধ—কোথায় সুস্থ সবল স্বাভাবিক জীবন-যাত্রার অবকাশ রাখিয়াছে মানুষের জীবনে? মানুষ কিরূপে হইতে পারে আজ মানুষ? Man is not Man as yet.

সবিতাকে অমিত আর বিশেষ বুঝাইতে চেষ্টাও করে নাই! সুস্থ সবল প্রাণময় জীবনযাত্রা—এই দেশেও আসিবে; আসিবে পৃথিবীতে। আসিবে কেন? আসিয়াছে, জানে তাহা অমিত। ততক্ষণ—পৃথিবীতে না হোক—এদেশে সবিতারা আত্মছলনায় যদি শান্তি পায় পা'ক, আত্মনিগ্রহে যদি আধ্যাত্মিকতার স্বাদ পায়, পা'ক। কে তাহাদের রক্ষা করিতে পারে এই আত্মাঘাত হইতে?—মানুষের মূল্যবোধ, মানব-মহাযান।

অতএব মেয়ে-কলেজের চাকরি ছাড়িয়া বিনা-বেতনে বিধবাশ্রমের ইস্কুল পরি-চালনা, হরিজন সেবা, অনাথাশ্রম পর্যবেক্ষণ, চরকা প্রচার, 'গ্রামোদ্যোগ,' কংগ্রেসী মহিলাসংঘ, বুনিয়াদি শিক্ষা ও শেষে কস্তুরবা সমিতির স্বেচ্ছা-শিক্ষার্থিনী,

শরণার্থিনী শিবিরের অবৈতনিক পরিদর্শিকারূপে সবিতা আপন রূপযৌবনকে প্রায় ক্ষয় করিয়া আনিয়াছে এতদিনে।—বহুজন হিতায় চ বহুজন সুখায়-চ তাহার জীবন; ইহাই ভারতের মহাযান।

অমিত দিন কয়েক আগেও সবিতাকে দেখিয়াছে একটা ত্বরিতগামী বাসে। কিন্তু ভালো করিয়া তখন তাহাকে দেখিবার সুযোগও হয় নাই। আজ সকালে তাহার কথাই তথাপি মনে পড়িয়াছে। এখানে সবিতাকে দেখিয়া অমিতের এখন মনে হইল—হঠাৎ তাহাকে বড় ক্লান্ত বড় অবসন্ন বড় শ্রান্ত-বিমলিন দেখাইতেছে। আপনার রূপ যৌবনকে প্রায় ক্ষয় করিয়া আনিয়াছে সবিতা। কিংবা হয়ত চৈত্রের দ্বিপ্রহরে পথে বাহির হইয়াছিল—আদর-পালিতা ভদ্রকন্যা—সে ত অনু নয়, না, মঞ্জুও নয়,—তাই বুঝি এতটা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে!

তুমি বিজয়ের মাসী, সবিতা?—অমিত জিজ্ঞাসা করিল পার্শ্বে বসিতে বসিতে।—দ্যাখো ত, জানতাম ই না আমি। জানি বিজয় ভবানীপুরের দিকে থাকে; কিন্তু কি করে জানব—সে তোমার বোন পো!

জানবার কথা নয়, দিদি মারা গিয়েছেন। বিজুও কলকাতায় থাকত না। —স্বাভাবিক নম্রতার সঙ্গে সবিতা বলিল।

সে ত বুঝলাম। কিন্তু আমরা ত থাকতাম, তোমরাও থাকো। আর অনুর সঙ্গেও তোমার দেখা হয়—অন্তত দেখা হত। তোমাদের কংগ্রেসী মহিলাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করা ত ছিল তাদের নিত্যকর্ম।—কিন্তু কই, তুমিও তাকে বিজয়ের কথা বলোনি, আর বিজয়ও আমাকে তোমার কথা বলেনি।

বিজয় লজ্জিতভাবে বলিল, আমি জানতাম, বলিনি।

বিজয় থামিল, কেমন কুণ্ঠিত বোধ করিল। তারপর আবার বলিল, ভাবলাম আপনারা ত জানেনই। তবু যখন কিছু বলছেন না, তখন না বললেই বা কি?

অমিত, মনু ও সবিতাকে জড়াইয়া জটিল সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাতেই কি এই কুণ্ঠা? না, কুণ্ঠা তাহার আপনার জন্য?

অমিত হাসিয়া বলিল, কি আর? না বল্লে বলা হয় না; জানাও হয়ত

হয় না। থাক, কিন্তু তুমি এখানে এলে কি করে, সবিতা? সাক্ষাতের অনুমতি পেলে কার সাহায্যে?

দীর্ঘ কাহিনী। সবিতা তাহা সম্পূর্ণ বলিল না। বলিবে না, জানিত অমিত। কিন্তু সবিতা যাহা বলে না, তাহা অনুমান করিবার মত, বুঝিবার মত চেতনাও অমিত এতদিনে কি লাভ করে নাই? এতটুকু চিনে সে সবিতাকে, চিনে তাহার বাঙলা দেশকে, সবিতা না বলিলেও অমিত বুঝিল সবিতার কাজ ও কথা।

ভোর না হইতেই বিজয়কেও আজ গ্রেপ্তার করিতে আসে সবিতাদের বাড়িতে পুলিশ। বিজয় যে এখনো গুরুতর কিছু করে, তাহা তাহার মামা জানিতেন না। কবিতা লেখে, গল্প লেখে, শিক্ষানবিশ সাংবাদিক হিসাবে কমিউনিস্টদের কাগজে লেখে, কাজ করে, 'সোভিয়েট সুহৃদ' রূপে এখানে-ওখানে ঘোরে। কিন্তু কি যে পুলিশের রিপোর্ট তাহা কে বুঝিবে? সকাল না হইতে পুলিশ সেই বাড়িতে হানা দিল। বলিল, একটু থানায় যাইতে হইবে বিজয়কে।

একবার আধ ঘণ্টার জন্য? না?—হাসিয়া যোগ করিল অমিত।

বিজয় হাসিয়া বলিল, না, আমাকে বলেছিল 'ঘণ্টাখানেকের জন্য।'

অমিত হাসিয়া বলিল, লোকটা গাল খাবে। আধঘণ্টা বলাই হল রুল্। কি বলেন, তাই না?—জিজ্ঞাসা করিল অমিত উপস্থিত গোয়েন্দা ইন্‌স্পেক্টরটির উদ্দেশ্যে। লোকটা কেমন ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে! এ লোকটার অস্তিত্বও সবিতা বা বিজয় যেন বিস্মৃত না হয়, আসলে সেই উদ্দেশ্যেই অমিত তাহার দিকে তাকাইয়া এই প্রশ্নটা করিল।

অপ্রতিভ হইল ভদ্রলোক। বলিল: আমি জানি না। আমি দপ্তরের ভারে; ছুটির দিনেও চার্জে রয়েছি। আপনাদের কথাবার্তার সময় বসতে বলছেন কর্তৃপক্ষ, তাই বসে আছি।

শুধু লজ্জা নয়, কোথা দিয়া একটা ক্ষোভ ও নিরুপায়তা যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছিল তাহার কথায়।

অমিত সবিতাকে বলিল, তোমরাও বোধহয় বুঝতে পার নি, ঘণ্টাখানেকের অর্থ কি?

কি করিয়া বুঝিবে সবিতা? এক ঘণ্টার পরিবর্তে দুই ঘণ্টা গেল। ন'টা বাজে। তবু বিজয় আসে না। তখন বাড়িতে বসিয়া থাকিতে পারিল না তাহারা।

অমিত জানে 'তাহারা' মানে সবিতাই, তাহার দাদা নয়। তিনি ভারতের স্বাধীনতা-লাভে চাকরি-জগতে বেশি উন্নতি করিতে পারিয়াছেন। বিলিতী কোম্পানির টনক নড়িয়াছে—ভারতীয় চাকরেদের পদমর্যাদা দিতে হয়। শোষণ-স্বার্থ যখন সুরক্ষিত তখন ভারতীয়দেরও দিতে হয় মুষ্টিভিক্ষা। তাই কভিনেন্‌টেড চাকরিতে এখন মিষ্টার রায় সুস্থির। পুলিশের গোলমালে তিনি মাথা দিতে পারেন না। তাহা ছাড়া, ন'টা বাজে যে, আপিসের টাইম হইয়া যাইতেছে মিষ্টার রায়ের। ড্রাইভার এখনো গাড়ী বাহির করে নাই কেন? সে চিন্তারই তিনি কারণ খুঁজিয়া পাইতেছেন না। ড্রাইভারদেরও যেন এখন স্বাধীনতা—আসুক না আসুক, কিছুই বলিবার জো নাই।

বাড়ির অন্যান্য সকলেরই এইরূপ নানারকম বাধা আছে। কোন পরিবারে কাহার আছে উদ্বৃত্ত সময় ও বিনা মূল্যে কাজের দায়িত্ব—বাদে বিধবা ভগ্নীর? কিংবা আশ্রিত-অনুগত ভাগিনেয় বা ভ্রাতুষ্পুত্রদের ছাড়া? অতএব—

সবিতা ভবানীপুর থানায় গেল। হাঁ, একাই গেল, নিকটেই ত বাড়ির।...

অমিত ইহাও জানে—ইস্কুলে কলেজে পড়া ভাইপোদের সঙ্গে গ্রহণ করিতে চাহিলে সবিতা কাহাকেও পাইত না। নিজেও তাহাদের কাহাকেও গ্রহণ করা উচিত মনে করে নাই—কি জানি, পাছে তাহাদের ক্ষতি হয়।

থানার লোক কিন্তু প্রথমে কিছুতেই সবিতাকে বলে নাই। পরে বলিল, সেখানে বিজয় নাই, তাহাকে সেখানে আনাই হয় নাই। তাহারাই গোপনে পরামর্শ দিল—সবিতা লর্ড সিংহ রোডে খোঁজ করুক। বাড়ি ফিরিল সবিতা—

ফোন করিবে লর্ড সিংহ রোডে। 'দেখি, সাধু বসে আছে দুয়ারে'...আর বলিল না সবিতা। চক্ষুতে তাহার অর্থসূচক দৃষ্টি। অর্থাৎ, সে জানিয়াছে অমিতের কথা, জানিয়াছে তাহার গৃহের খবর, অনুর ও শ্যামলের বিপদের কথা।

দৃষ্টির বিনিময় হইল, অমিতের দৃষ্টি বলিতে ত্রুটি করিল না—সবিতা, অমিত তোমাকে চিনিতে ভুল করে নাই। আবার সেই দৃষ্টি স্বীকারও করিল,—সবিতা, অমিতের প্রত্যাশার অপেক্ষাও বেশি তুমি তৎপর, সচেতন, কৌশলী।

সবিতার দাদা অ্যাপিসে বাহির হইয়া গেলেন। ফোনে কিছু জবাব পাওয়া গেল না। শুধু কে বলিল, 'অফিসাররা এলে আবার ফোন্ করবেন বারোটায়।'—'দাদা চলিয়া গেলেন,—কিন্তু দুশ্চিন্তা লইয়া গেলেন—বিজয়ের কি হইল কে জানে।' তখন দশটা, সাধু বিশ্রাম করিবে। সবিতা অন্য কাজেও ব্যস্ত হইয়া রহিল...অর্থাৎ অনুর ও শ্যামলের—সংবাদ পৌঁছাইবার জন্য ছুটিল তাহাদের বন্ধুদের বাড়ি, 'নানা গোলমাল সবখানে—যেমন করেই হোক্ তবু নাগাল পাব ছোট'র।' অতি সহজে অথচ অতি সাবধান সংকেতে বলিয়া যায় সবিতা অনুর নাম। অমিত সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকে।

হয়ত গোয়েন্দা কর্মচারী অনভ্যস্ত, সব শুনিতে বা বুঝিতে চায় না। হয়ত অত্যধিক চতুর লোক,—শুনিয়া যাইতেছে। কিন্তু কিছুই ভাব-ভঙ্গিতে ব্যক্ত হইবে না। কিন্তু, অমিত, তুমি ইতিপূর্বে বুঝিতে কি এতটা চাতুর্য, এতটা কুণ্ঠাহীনতা সবিতার সাধ্য ?.. অমিতের চক্ষুতে কৃতজ্ঞতা ফুটিয়া উঠিল.. সেই সদা-সংকুচিতা সবিতা কেমন করিয়া প্রয়োজনের দায়ে আপন অভ্যাস ও ধারণাকে কাটাইয়া উঠিতেছে, আশ্চর্য নয় কি ? তোমার সম্মুখেও সে আজ আর সদা-ভীতা, অস্বচ্ছন্দ মানুষটি নাই, অমিত। আর পুলিশের সম্মুখে সহজ ছলনা গ্রহণেও কুণ্ঠিতা নয় এই সবিতা। কোনো কারণে, কাহাকেও ছলনা করা যে মনে করিত অন্যায়,—আর নিজেকে ছলনা করাই ছিল যাহার নিয়ম, প্রয়োজন, সেকি সত্যই তবে বুঝিতেছে—কোথায় ছলনা অন্যায়, ছলনা কোথায় প্রয়োজন ?...সে কি তবে মানিবে আত্মছলনায়ও কোনো কল্যাণ নাই ?...

বারোটায় এই আপিসে ফোন করিয়াও সবিতার পক্ষে কোনো লাভ হইল না। কে একজন অফিসার বলিলেন, কেহ কেহ লর্ড সিংহ রোডে আসিয়াছে বটে, কিন্তু কে কে তাহা বলা এখনো সম্ভব নয়। গ্রেপ্তার করা লোকদের নামের তালিকা তৈয়ারী হইতেছে; সবিতা বরং পরে আবার তাহা জানিতে চেষ্টা করিতে পারেন।

সবিতা হতাশ হইল, প্রায় নিরুপায় হইল। একটা সংবাদও পাইবে না বিজয়ের?…সামান্য চা খাইয়াও যায় নাই যে বিজয়। একজন কংগ্রেস এম-এল-এ'র নিকটে যাইতে পারিত সবিতা। গান্ধীবাদী কুমুদ সরকার;—দাদাও তাহাকে ধরিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু সবিতা গম্ভীর হইল। মুখে বলিল, না। কারণ কংগ্রেসে তাহারা পরাজিতের দলে—গান্ধীবাদীরা কি করিবে? তিনি মন্ত্রীদের কাহাকেও হয়ত ফোন্ করিতেন, কিন্তু লাভ হইত না। তাহারা কুমুদ সরকারের সঙ্গে দেখাও করিত না। কুমুদ সরকার যে সত্যই কিছু করিতে পারিবে না, তাহা সবিতা জানে। মারোয়াড়ী ধনকুবেররা এখন আর খাদীপন্থী সেই দলের উপর ভরসা রাখে না।—খোদ মন্ত্রীবাদীদের সঙ্গেই তাহাদের কারবার। তাই মন্ত্রীদের নিকট কুমুদ সরকারদের কোনো প্রয়োজন প্রতিষ্ঠা এখন নাই। বিড়লাজীর ম্যানেজররা বলিয়াছেন—গান্ধীপন্থী এই খাদিদল গঠন-মূলক কাজ করুক না? দরকার মত কস্তুরবা ফণ্ড হইতে তাঁহারা টাকা পাইবেন।

তাহা ছাড়াও কুমুদ সরকারের সম্পর্কে সবিতা আর যাইবে না।

মিসেস সেন-রায়ের কাছেই বরং গেলাম—বলিল সবিতা।

মিসেস সেন-রায়!—অমিতের কণ্ঠ হইতে সবিস্মিত উক্তি বাহির হইল।

হাঁ, মিসেস সেন-রায়! জানেন তাঁকে? এন্‌গেজমেণ্টও ছিল। শরণার্থী-অধ্যক্ষতার ভার পেয়েছেন উনি—দিল্লী থেকে। তাই একটা রিফিউজী ক্যাম্প চালনা নিয়ে আমার সঙ্গে পরামর্শ প্রয়োজন। কালই তিনি এসেছেন দিল্লী থেকে।

অমিতও তাহা জানে।

…না জানিয়া কাহার উপায় আছে? বাঙলা দেশে বাঁচিবে, সংবাদপত্র

পড়িবে, অথচ জানিবে না মিসেস সেন-রায় দিল্লী হইতে শরণার্থী-সেবার বিশেষ ভার লাভ করিয়া কলিকাতা ফিরিতেছেন? অবশ্যই ফিরিতেছেন তিনি দিল্লী হইতে এয়ার লাইনে। কারণ, তাঁহার সময় নাই, সময় নাই তাঁহার। আবার এখনি চলিয়াছেন পণ্ডিত নেহরু ও আচার্য কৃপালনীর নিকট রিফিউজী প্রোব্‌লেমে তাঁহার নিজস্ব বিবরণ পেশ করিবার জন্য—সিম্‌লাতে। হাঁ, কলিকাতা হইতেও এয়ার লাইনেই চলিয়াছেন;—তাঁহার সময় নাই।—কাহারও না জানিয়া উপায় আছে, তিনি দিল্লী হইতে ফিরিয়া—হাঁ, এয়ার লাইনে ফিরিয়া—কারণ, তাঁহার সময় একটুও নাই,—তাঁহার বিবৃতিতে কালই কত অমূল্য উপদেশ দিয়াছেন পূর্ব বাঙলার লোকদের ও দেশ-ত্যাগী-পূর্ববঙ্গবাসীদের? সাধ্য কি, সংবাদপত্র পড়িবে, অথচ জানিবে না মিসেস সেন-রায় পণ্ডিত নেহরু ও কংগ্রেস প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে পরামর্শ করিবার জন্য আবার যাইতেছেন সিম্‌লা? হাঁ, এয়ার লাইনেই যাইতেছেন, তাঁহার একটুও সময় নাই। না জানিয়া পারিবে কি তিনি কবে গিয়াছেন 'কুরুক্ষেত্র-ক্যাম্পে'—সেখানকার ব্যবস্থা বিষয়ে সাজেশ্‌শ্যান দিবার জন্য? অবশ্য ভিতরের খবর জানিলে জানিতে, সেই সাজেশ্‌শ্যান তাঁহাকে দিতে হইয়াছে সন্তর্পণে, দিতে হইয়াছে সুকৌশলে। হাঁ, সুকৌশলে। কারণ, সেখানকার অধ্যক্ষ ও অধ্যক্ষারা অ-বাঙ্গালী, কংগ্রেসের 'হাই কম্যাণ্ডের' স্বপংক্তির মানুষ; নয়াদিল্লীর দরবারের আশে-পাশে তাঁহাদের আত্মীয় বন্ধুর অভাব নাই। মিসেস্ সেন-রায়ের কোনো কথা বলিবার অধিকার কি সেখানে? সাহসই বা কি? হাঁ, মিসেস্ সেন-রায়েরও অধিকার ও সাহসের কথা ভাবিতে হয় সেখানে।

অবশ্য মূলত সাহসের প্রশ্ন নয়, অধিকারের প্রশ্নও নয়। মিসেস সেন-রায় তাহা জানেন। উহার কোনোটারই অভাব তাঁহার নাই। সোসাইটিতে তাঁহার আসন সুদৃঢ়। দুইপুরুষের বিলিতী কৌলিন্য তাঁহার। একালেই না হয় বিবাহ করিয়াছেন এক পুরুষের বিলাত-ফেরৎ আই-সি-এস্ মিষ্টার সেন-রায়কে। বিদ্যায় ও বুদ্ধিতেও মিসেস সেন-রায় কি ভারতবর্ষেই অদ্বিতীয়া নন?—সিনিয়র ক্যামব্রিজের পরে তিনি ক্যামব্রিজে পড়িয়াছেন ইকোনমিকস্; আর দুই

দুইবার ট্রাভ্‌ল করিয়াছেন কন্‌টিনেণ্ট, দেখিয়াছেন লুভর, স্পোর্টস্‌প্ল্যাট্জে শেষবার হিটলারের বক্তৃতা শুনিয়াছেন, রোমে মুসোলিনির প্রাইভেট সেক্রেটারির সঙ্গে আলাপ করিয়াছেন, রাশ্যার পথ হইতেও ফিরিয়া আসিয়াছেন—মিষ্টার সেন-রায়ের জন্যই তাঁহার সেখানে যাওয়া সুবিবেচনার কাজ হইত না। তারপর ভারতবর্ষের কত শহরে রাজধানীতে পাব্‌লিক্‌ ওয়ার্কে ও উইম্যান্‌স্‌ কাউনসিলে আপনার বিদ্যাবুদ্ধির, কার্যশক্তির-বলে নেত্রীত্ব পদ তিনি গ্রহণ করিতেছিলেন। মিসেস সেন্‌রায়ের স্থান তখন নারী-নেতৃত্বের শীর্ষ সোপানে প্রায় স্থির হইয়া যাইতেছিল—রাণী রাজবাড়ে, কাপুরথালার কুঁয়াররাণী, গাইকবাড়নী, বা প্রিনসেস্‌ নিলোফার—ইঁহাদের পরেই যাঁহারা এদেশের নারী-সমিতির চূড়াবাসিনী মিসেস সেন্‌রায় তাঁহাদের প্রতিযোগিনী ও সহযোগিনী। এই কুঁয়াররাণী, গাইকবাড়নীরা ত কাউনসিলের কার্য পরিচালনা করেন না; সে ভার থাকে মিসেস সেন্‌রায়ের মত ইনটেলেকচুয়াল-নেত্রীদেরই হাতে।—আসিতেছিল তাঁহার হাতেও, আসিতও;—এমনি সময়ে ওলট-পালট শুরু হইল।

মিসেস সেন-রায় এই জিনিসটা এত ভালো করিয়া পূর্বে বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু বুঝিতে পারিলেও তাঁহার উপায় ছিল না। মিষ্টার সেন্‌রায় আই-সি-এস; —কি করিয়া মিসেস সেন-রায় কংগ্রেস-ওম্যান হইতেন? যদি তিনি একবার 'আগাষ্ট বিপ্লবে' যোগদান করিতে পারিতেন;—হাঁ গা-ঢাকা দিতেন,—অসুবিধা হইত কি? অনারেব্‌ল স্যর হরকিসানের বাড়িতেও তিনি থাকিতে পারিতেন। মিষ্টার সেন্‌রায় অনারবেল স্যর হরকিসনের এ্যাসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারি ছিলেন সে সময়ে। আর মিসেস সেন্‌রায়কে স্যার হরকিসান সাদরে রাখিতেন, তাঁহার দিল্লী বা সিমলার কোয়ার্টার্সে। কিংবা, না হয় আসিতেনই মিসেস কুইনি সেন-রায়—মানে, শ্রীমতী রাণী সেন-রায়—তখন আগষ্ট বিপ্লবে তিন মাসের মত একবার জেল ঘুরিয়া।—এমন কি অসাধ্য ছিল তাহা মিসেস সেন্‌রায়ের পক্ষে? মোটেই অসাধ্য ছিল না। 'বিশেষ শ্রেণী' তাঁহার জন্য জেলে নির্দিষ্টই থাকিত। বিশেষত তিনি নিজেও বিলাতফের্তা। বরং সত্যই, মিসেস সেন্‌রায়ের ইচ্ছাও ছিল একবার জেল দেখিয়া আসেন।—কে না জানে তিনি

মনে প্রাণে সেই 'বিয়াল্লিশে' ছিলেন কংগ্রেসেরই পক্ষে? অবশ্য কার্যত ও প্রকাশ্যে তিনি তাহা প্রকাশ করিবার সুযোগ হইতে বঞ্চিতা রহিলেন। বঞ্চিতা রহিলেন মিষ্টার সেন-রায়ের চাকরির জন্য। বঞ্চিতা রহিলেন এক ভুলে—আই-সি-এস সেন্‌রায়কে বিবাহ করিবার অদূরদর্শিতায়। তাই মিসেস সেন্‌রায়কে গ্রহণ করিতে হইল সেই বিয়াল্লিশে স্যার হরকিসানের মনোনয়নে ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রন্টের একটা কর্ত্রীত্বপদ। গ্রহণ করিলেন নিজের জন্য নয়,—মিষ্টার সেন্‌রায়ের জন্যই। না হইলে মিসেস সেন্‌রায় তখন চাহিয়াছিলেন এ্যাসেম্‌বলিতে সদস্যার পদে মনোনয়ন। কলিকাতা কর্পোরেশনেই কি তিনি লেডি অল্‌ডারম্যান হইতে পারিতেন না, এবং পরে ফার্ষ্ট মেয়রেস্‌ অব্‌ দি ফার্ষ্ট সিটি? অন্তত একটা প্রাদেশিক এ্যাসেমবলিতে মনোনয়ন লাভ না করিলে তিনি কিছুতেই স্যার হরকিসানকে তখন ছাড়িতেন না। কিন্তু তবু তাঁহাকে হইতে হইল ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রন্টের ওম্যান সাব-কমিটির সেক্রেটারি,—ন্যাশনাল ওয়ার-ফ্রন্টে উচ্চচক্রের উপদেশিকা। একটা ভুল হইল ইহাতে। কিন্তু ভুলটা হইল তাঁহার নিজের জন্য নয়—মিষ্টার সেন-রায়ের জন্য—তাঁহারই চাকরির খাতিরে, 'কুইনী' সেন-রায় মিষ্টার সেন-রায়ের পত্নী বলিয়া, সেই গোড়াকার ভুলের জন্য—সেন্‌রায়কে বিবাহ করায়, ভাটিয়া লালুভাই দেশাইকে বিবাহ না করায়। তাই যুদ্ধ থামিতেই তখন সব ওলট পালট হইল, আর অমনি কোথা হইতে কুইনী সেন্‌রায়ের আসন কাড়িয়া নারী ভারতের নেত্রীত্বলোকে উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিল—মিসেস নাইডু, বিজয়লক্ষ্মী, অমৃতকুমারী এবং ক্যাপটেন লক্ষ্মী ও মিসেস স্বামীনাথন্‌, তারপর যত মেটা ও মেনন, যত ভাটিয়া আর পাঞ্জাবী, হিন্দুস্থানী আর মাদ্রাজী, —বাংলা দেশেও আসিল যত হেঁজিপেঁজি। কিন্তু আসিল কিরূপে? কংগ্রেসের কর্মী বলিয়া কি? কে তাহারা কংগ্রেসের কর্মী? তবে বিদ্যার জোরে কি? কে তাহারা লেখাপড়া শিখিয়াছে? কে তাহারা ইংরাজি বলিতে জানে? তবে ইহারা নেত্রী হইল বুদ্ধির জোরে কি? কে ইহারা বুদ্ধিমতী? তবে রূপের জোরে কি? না, না, তাহা নয়। রূপের জোরে কিছুতেই নয়। কিছুতে নয়।

কুইনী সেন-রায়ের জানা আছে—বাঙালিনী হইলেও রূপে তিনি অপরাজিতা। নিশ্চয়ই অপরাজিতা। হাঁ, তিনি উহাদের পার্শ্বে বসিয়া, মুখা-মুখি দাঁড়াইয়া, নিজেকে বিচার করিয়া দেখিয়াছেন। উহারা কেহবা তাঁহার অপেক্ষা একটু গৌরাঙ্গী, কেহ বা বেশি সুমুখী, কিন্তু সর্বব্যাপিক কেহ নহে তাঁহার মত 'চার্মিং' এবং 'স্মার্ট' এবং 'ইনটেলেক্‌চুয়াল'। হাঁ, 'ইনটেলেক্‌চুয়াল বিউটি' এখনো বলে কুইনী সেন-রায়কে 'ফরেন আফিসের' ডিপুটি সেক্রেটারি কাপুর, পাকা ফ্লার্ট কাপুর। কিন্তু বলে তবু সত্য কথাই, জানেন তাহা 'কুইনী' সেন-রায়। 'ইনটেলেক্‌চুয়াল বিউটিও', আর এখনো,—হাঁ, এখনো, তিনি সযৌবনা। আগে না জানিলে কেহ কি বলিতে পারিবে তিনি এই পঞ্চদশ-বর্ষীয়া 'বেবি' সেন-রায়ের মাতা স্বয়ং সপ্তত্রিংশদোত্তীর্ণা? কে জানে যে উনিশ শ' এগারোতে তিনি জন্মিয়াছিলেন? আর তাই তাঁহার নাম 'কুইনী,' মানে, এখন প্রকাশ্যে জন সাধারণের নিকট 'রাণী', (কিন্তু অন্তরঙ্গ বিলাত-ফেরতা মহলে 'কুইনীই')। না, নিজেকে বহুদিন কঠিনভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন কুইনী সেন-রায়,—নয়া দিল্লীর প্রত্যেকটি আধুনিক কক্‌টেল পার্টিতে, মেয়েদের প্রত্যেকটি সমিতিতে, বাপুজীর প্রত্যেকটি 'প্রার্থনা সভায়;'—প্রতিদিন নিজেকে ভালো করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন,—প্রতিবার আরশির সম্মুখে দাঁড়াইয়া—মিনিটের পর মিনিট—পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহার কেশ, তাঁহার চোখের কোণ, পেন্ট্-মুক্ত ভ্রূ, রুজ-মুক্ত কপোল ললাট, ওষ্ঠরাগমুক্ত ওষ্ঠাধর, বসনমুক্ত বাহু, করাঙ্গুলি, চিবুকের তল, কণ্ঠ ও স্কন্ধ, বক্ষ ও কক্ষ—দেখিয়াছেন নিজেকে সম্মুখ হইতে, পিছন হইতে, অপাঙ্গে,—কিন্তু কে বলিবে তিনি দেড় মনের বেশি ওজনে? সাধ্য নাই, সাধ্য নাই, কেহ তাহা জানে। 'স্লিমিং' করিবার প্রয়োজন নাই, চিনি ছাড়িবার কারণ নাই, ক্রিম কমাইবার দরকার নাই—কুইনী সেন-রায় আরও কুড়ি বৎসরেও বুড়ী হইবেন না। আশ্চর্য তাঁহার শরীরের পড়ন, সুঠাম, সুডোল,—আর সুযৌবনা;—আবার ইনটেলেকচুয়ালও। অতএব, অপরাজিতা মিসেস সেন-রায় রূপে যৌবনে তখনো, আরও অনেককাল, রহিবেন অপরাজিতা; তবু আজ এখনি তাহা

বিশেষ ভাবে সত্য। এখনি—এই উনিশ শ সাতচল্লিশে ও আটচল্লিশে। এখন এক-একটা বৎসর যেন এক-একটা বিষম ওয়ার্নিং তাঁহার নিকট। সময় নাই, সময় নাই, সময় নাই ···কুইনী, সময় নাই। হাঁ, চলিয়া যায় তাঁহার জলুষ, যায় তাঁহার যৌবন, যায় তাঁহার গৌরতনুর তনিমা।··· অনেক করিয়া এখন মেরামত করিতে হয় তাঁহাকে, মেরামত করিতে হয় প্রতিদিন, প্রতিবার বহুক্ষণ ধরিয়া প্রসাধনশালা হইতে বাহির হইবার পূর্বে···কুইনীর সময় নাই, সময় নাই,···'দিল্লী দূরন্ অশত'···কোথায় এ্যাসেম্‌বলির সদস্যপদ, প্রদেশে মন্ত্রিত্বের পদ, বিলাতে ভারতীয় কোনো একটা দৌত্যাবাসের কর্ত্রীত্ব, ইউ-এন-ও বা জেনেভায় কোনো একটা ডেলিগেশ্যনের নেতৃত্ব···কোনোটাই এখনো সেন-রায় বা মিসেস সেন-রায় আয়ত্ত করিয়া উঠিতে পারেন নাই। অথচ, কুইনী, সময় নাই, সময় নাই।···অতএব, যেমন করিয়া পার ওঠো···যাহাকে পার আশ্রয় করো, যাহা চাই আঁকড়াইয়া ধরো···গান্ধীজীর প্রার্থনা সভায় জোটো; নোয়াখালি উদ্ধারে ছোটো; 'আগষ্টের স্বাধীনতায়' পতাকা তোলো; সেপ্টেম্বরে, পাঞ্জাবহত্যার ব্যাপারে দিল্লী যাও; অক্টোবরে, বাংলায় ফেরো; নবেম্বরে, দিল্লী ছোটো; ফেব্রুয়ারীতে, রাজঘাটে লোটাও। ওঠো, ছোটো, হানা দাও, ধর্ণা দাও, কাঁদো, নাচো···কিন্তু যাহাই করো সংবাদ-পত্রে এসব কথা সর্বাগ্রে ছাপাও। সংবাদদাতাদের সঙ্গে তাই খাতির রাখো; খাতির জমাও সংবাদপত্রের মালিকদের সঙ্গে; খাতির ফলাও সংবাদ এজেন্‌সির মুনিবদের সঙ্গে; চা-এ ডাকিয়া খুশী করো সংবাদপত্রের সম্পাদকদের, আর ফোনে ডাকিয়া কৃতার্থ করো নিউজ এডিটারদের, রির্পোটারদের··· তারপর সাধ্য কি, ভূ-ভারতে কেহ তোমার নাম না জানিয়া পারে? সাধ্য কি কেহ দেখিবে না তোমার ছবি—নোয়াখালির গাঁয়ে, কিংবা বিড়লাভবনের ছায়ে; বেলেঘাটায় গান্ধীজীর বৈঠকে তাঁহার সামনে, কিংবা শরণার্থী শিবিরের মধ্যখানে?—শুধু কি দেখিবে ওই শাকচুন্নি অমৃরিতরাণীকে? কিংবা মেদ-মাংসল কউনসিলরকে? না, দেখিবে তাহারা রাণী সেন-রায়কে,—দেখিয়াছে।

অমিতেরও সাধ্য কি তাই না দেখিয়া পারে?···কিন্তু সময় নাই, সময় নাই,

কুইনী সেনরায়। তুমি মাদ্রাজী নায়ার নও, গুজরাতী বেণে নও, পাঞ্জাবী বৈশ্য নও, হিন্দুস্থানী কায়স্থও নও,—তুমি বাঙালী ব্যারিষ্টারের মেয়ে মাত্র। অনেক অসুবিধা তোমার। গুজরাতে তোমার বাড়ী নয়, বোম্বাই-এ নাই ব্যবসা; ইনফ্লুয়েনস নাই দিল্লী সিমলায়।—বিবাহ করিয়া ফেলিয়াছ সেনরায়কে,—একটা জড়ভরত! আই-সি-এস। হাঁ একদিন তারাই ছিল রাজা—আমলারাজার দিনে; কিন্তু আজ ত তারা চাকর—যে-কোনো কংগ্রেসম্যানের, যে-কোনো মালিকের দাপটে ওরা অতিষ্ঠ। মিষ্টার সেন-রায় অমিতদের অনুজ, ইউনির্ভার্সিটির একটা ভালো ছাত্র। কো অপারেটিভ লইয়াই তাই সে সন্তুষ্ট—কলিকাতার সেক্রেটারিয়েটেই থাকে আবদ্ধ;—নয়া দিল্লীতে যাইতেও সে চাহে না, সাহসও পায়না। বোঝে না তাহার স্ত্রী কুইনীর ভবিষ্যৎ, বুঝে না তাই নিজের ভবিষ্যৎ।···তোমাকে পিছনে ফেলিয়া যাইতেছে, কুইনী, তাই ভাটিয়া মিলমালিকের কন্যারা আর পত্নীরা, যত মাদ্রাজী পাঞ্জাবী এড্‌ভানচারেস্‌রা, তোমার মত যাহাদের না আছে বিদ্যা, না আছে বুদ্ধি, না আছে রূপ—ও যৌবন···বিউটি এণ্ড ইনটেলেকট। ··সব থাকিতেও সব তোমার অনায়ত্ত, কিছুই তুমি পাইয়াও পাও নাই।—অথচ সময় নাই, সময় নাই, সময় নাই তোমার।—কুইনী সেনরায়ের নিকট এই সাবধান বাণী বহন করিয়া আসে প্রতিটি দিনরাত্র। তিনি জানেন সময় নাই; আর তাই সংবাদপত্র পাঠক মাত্রকেই জানিতে হয় তিনি শরণার্থী সমস্যায় কি করিতেছেন—এয়ার লাইনে ছুটিয়া:—ভারতীয় কনষ্টিটিউশ্যান ব্যাপারে কি বলিতেছেন—সংবাদপত্রে লিখিয়া:—ভারতীয় নারীর অধিকার রক্ষায় কি করিতেছেন—সার্কুলার দিয়া; গান্ধীজীর বিয়োগে কতখানি কাঁদিয়াছেন—সভায় বসিয়া; আর এখন গান্ধীজীর শেষ নির্দেশ মত কি করিতেছেন বাঙলা দেশের শরণার্থীদের স্বয়ং পরিদর্শন করিয়া। তাঁহার এগ্রো-ইকোনমিক সল্যুসনের নোট, তাঁহার ম্যাস এজুকেশ্যনাল রিজিনারেশ্যান স্কিম, তাঁহার সোশ্যাল রিগ্রুপিং এর প্ল্যান, আর গান্ধীয়ান ইকনোমিকস এণ্ড ডায়েলেটিকাল ডিফারেনসিয়ালএর গ্রাফ;—এই সব না জানিয়া উপায় আছে কাহারও? উপায় আছে

অমিতদেরও? হায়, তবু মিসেস রাণী সেনরায় পাইলেন কি না হতভাগা বাংলাদেশে এই গড-ড্যামড্ শরণার্থীদের কাজ। এজন্যই কি ক্যামব্রিজে পড়িয়াছিলেন তিনি?…কন্টিনেণ্টে ঘুরিয়াছিলেন? জীবন দেশের নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন?

অমিত জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় দেখা পেলে মিসেস সেনরায়ের—এয়ারোড্রোমে?

এয়োরোড্রোমে? সেখানে কেন?—জিজ্ঞাসা করিল সবিতা।

ওঁর সময় নেই বলে—হয়ত দিল্লী যাচ্ছেন, কিংবা দিল্লী থেকে ফিরছেন।

দুইটি ঘণ্টা ইন্দ্রাণীকে কাল সন্ধ্যায় বসাইয়া রাখিয়া তাহাই গতকাল জানাইয়াছিলেন মিসেস রাণী সেনরায়। বাঙলার শরণার্থী মেয়েদের তিনি একটা নার্সিং শিক্ষার ব্যবস্থা করিবেন, তাই তিনি ডাকিয়াছেন সিষ্টার ইন্দ্রাণীকে। কিন্তু কাল আর তাঁহার সময় হয় নাই—নিউ ইয়র্ক ট্রিবিউন মেলের মার্কিন সংবাদদাতার সঙ্গে ছিল 'তাঁর টি'। হ্যাচারলি তার পরে এখানকার 'পত্রিকা' আর 'ষ্টেটসম্যানেও' একটা স্পেশ্যাল ইণ্টারভিউ দিতে হইল। কাজেই 'সিষ্টার ইন্দ্রাণী, রিয়েলি, কুইনী সেনরায়, হ্যাজ নো টাইম—এ্যাবসোলুইটলি নো টাইম। কালই যেতে হবে এয়ারে সিমলা—দিল্লী চলুন, কথা হবে।'—আর ততক্ষণ অমিত একা বসিয়া ইন্দ্রাণীর বাড়িতে।

অমিতের কথায় সবিতা হাসিল। না, সে প্রোগ্রাম ক্যানসেল করেছেন। ওঁকে বিশেষ করে অনুরোধ করেছেন শ্রীভুজঙ্গ সেন আর আমাদের মন্ত্রী জগন্নাথ চৌধুরী,—মিসেস সেন রায় অন্তত দু'দিন এখানে যেন থাকেন।

অমিত শুনিল; সবিতাকেও আজ দুপুরে মিসেস সেনরায় ডাকিয়াছিলেন শরণার্থী শিক্ষাসদন গড়িবার স্কিম লইয়া। তখন কিন্তু বেলা একটা, মিসেস সেনরায় বাড়ি ছিলেন না,—সবিতাকেও অপেক্ষা করিতে হইল—লাঞ্চে গিয়াছিলেন ফার্পোতে। মারোয়াড়ী এক ব্যবসায়ী 'হোলি-লাঞ্চ' দিয়াছিলেন—কংগ্রেসের

গবর্ণমেণ্টের মন্ত্রীদের নিমন্ত্রণ ছিল। সবিতা ভাবিল—মিসেস সেনরায়কে বলিয়া বিজয়ের একটা ব্যবস্থা হয়ত করা যাইবে।

মিসেস সেনরায় সবিতার কথা শুনিয়া প্রথম কিছু করিতেই রাজি হইলেন না। কমিউনিস্টদের ত গবর্ণমেণ্টের দমন করিতেই হইবে, তিনি করিবেন কি? লাঞ্চেও কথাটা উঠিয়াছিল। পুলিশের একজন বড় কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন, মারোয়াড়ীদের এই কথা বলিতেছিলেন। সেখানেই মিসেস্ সেনরায় শুনিয়াছেন কমিউনিস্টদের আজ ধরা হইয়াছে; তবে অনেককে নাকি পাওয়া যায় নাই এখনো। দুই এক দিনের মধ্যেই পাওয়া যাইবে—পালাইবে কোথায় তাহারা? রাশিয়া এখন রক্ষা করুক না ইহাদের? মিসেস সেনরায়েরও কোন দরদ নাই ইহাদের জন্য। একবার তর্ক হইয়াছিল মিসেস সেনরায়ের সঙ্গে উহাদের এক চাঁই-এর—মিসেস নাইডুর সম্মুখে। মিসেস নাইডুর নিকট তখন খুব আস্কারা পাইয়াছিল উহারা। মিসেস সেনরায় সহ্য করিতে পারিলেন না উহাদের রাশিয়ান ইকোনোমিক্‌সের পক্ষে ওকালতি। উহা আবার ইকোনোমিক্‌স্? ক্যাম্ব্রিজের ইকোনমিক্‌স্-পড়া ছাত্রী তিনি, কেইনসের নূতনতম লেখা পড়িয়াছেন। কি জানে এই সব ফ্যানাটিকরা ইকোনোমিক্‌সের? কিন্তু মিসেস নাইডু থামাইয়া দিলেন, না হইলে মিসেস সেনরায় দেখিতেন মূর্খগুলির স্পর্ধা কত দূর যাইত।

সবিতা অনেক কষ্টে একবার বলিবার সময় করিয়াছিল, বিজয় তত বড় কেহ নয়। ইকোনমিক্‌স্ সে জানে না। বিজয় খেলে, কবিতা লেখে।

কবিতা লেখে?—মিসেস্ সেনরায়ের চোখে বিদ্রূপের হাসি ফুটিল। মিসেস সেনরায় কবিতা পড়েন না। মিসেস সেনরায় 'ষ্টেটস্‌ম্যান' পড়েন, 'লাইফ' পড়েন, 'ইলাষ্ট্রেটের্ড্ লণ্ডন নিউজ পড়েন', এখন 'হিন্দুস্থান টাইম্‌স্'ও 'ইলাষ্ট্রেটেড্ উইক্‌লি অব ইণ্ডিয়াও' পড়েন,—আর পড়েন 'ক্রাইম্‌স'।

সবিতা বুঝি সেই সব পড়ে নাই?—সবিতার ভাগ্যক্রমে আসিয়া পড়িলেন শ্রীভূজঙ্গ সেন—এ্যাসেম্‌বলির এক কংগ্রেস হুইপ্, আর ব্রজনন্দন পালিত—ফিনান্‌স্ মিনিষ্টারের প্রাইভেট্ দালাল।

কয়টা পারমিটের হোল্‌ডার ভূজঙ্গ সেন ?—জিজ্ঞাসা করিল অমিত।

সবিতা উত্তর দিল না। অমিত জানে—কয়মাস পূর্বেও সবিতার অপরিসীম ভক্তি ছিল ভূজঙ্গ সেনদের উপর। না থাকিবার কারণ নাই। দেশের জন্য ইহাঁরা জীবন দিতে গিয়াছিলেন, বাংলা দেশে ইহাদের নাম দেবতার মন্ত্রের মত। এরূপ এক-একটা নামের সঙ্গেই যেন জাতির এক-একটা জীবনের শিকড় জড়াইয়া আছে। কি করিয়া বুঝিবে সবিতা আসলে জাতির শিকড় ইহাঁদের সহিত জড়াইয়া নাই, জড়াইয়া আছে দেশের জনতার সহিত ; তাহারাই উহার প্রাণরস জোগায়। ভূজঙ্গ সেনকেও রস জোগাইয়াছে একদিন এদেশের স্বাধীনতার সংগ্রাম। কিন্তু আজ যে একটা শূন্যচারী পরগাছা সেই ভূজঙ্গ সেন, কি করিয়া বুঝিবে তাহা সবিতা ?

ভূজঙ্গ সেনের আসিবার কথা ছিল—কাল রাত্রিতেই কথা হইয়াছে। আগমনের প্রকাশ্য কারণ পূর্ব বাংলার শরণার্থী। কিন্তু নয়াদিল্লীতেই কথা হইয়াছিল ভূজঙ্গ সেনের সঙ্গে মিষ্টার অনিল দত্তের বাড়িতে মিসেস সেনরায়ের। —মিষ্টার অনিল দত্ত—যাঁহার ওয়াইফ্ ও ব্রাদার ব্রিটিশ আমলের অত্যাচারে প্রাণ দেয়—অমিত জানে তাহা।...সুনীল আর ললিতা,—কে জানে যে, অনিলের জীবনে তোমাদেরও মূল্য ছিল ? এখন 'শাফারিং-এর' জন্য ক্ষতিপূরণ পাইয়াছেন মিষ্টার দত্ত, কমার্সের এক এ্যাসিটেন্ট সেক্রেটারি তিনি। মিসেস সেনরায় ও ভূজঙ্গ সেন উভয়কে মৃদু পরিহাসে দোষারোপ করিলেন। ভূজঙ্গ সেন দিল্লীতে একটু চাপও দিতে পারেন না কি বাঙালীদের প্রতি সুবিচারের জন্য ? এই ত, এত 'ফরেন সার্ভিসে' লোক যায়—একজন বাঙালীও কি যাইতে পারেন না রাজদূত হইয়া ? কত মাদ্রাজী পাঞ্জাবী মেয়ে দিল্লীতে কর্ত্রীত্ব ফলাইতেছে, একজন বাঙালী মেয়েও কি নাই ? ইউনেসকোর সংস্কৃতি পরিষদে মিসেস সেনরায় হিউম্যান রাইটসের উপর ও উওম্যান'স রাইট্‌সের উপর বলিতে পারিতেন—দেখিয়াছেন কি সেই নোট ভূজঙ্গ সেন ?

ভূজঙ্গ সেন বলিতেছিলেন—বাঙলার কংগ্রেসে শরণার্থীদের স্থান করিয়া দিতে না পারিলে কি করিয়া কংগ্রেস বাঁচে। কিংবা কোনো 'কাজ' করিতে পারেন

তাঁহারা? তাই মিনিষ্টার শ্রীজগন্নাথ চৌধুরীও তাঁহাকে এখানে থাকিতে বলেন। উভয়েই উভয়ের সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন—ভূজঙ্গ সেন জানেন মিসেস সেনরায় একটা ঘুঁটি; পাকিলে অশ্বও হইতে পারে। সেনরায় বুঝিতেছেন জগন্নাথ চৌধুরী একটা সূত্র—ছাড়া ঠিক নয়।

সবিতার হয়ত উঠা উচিত—কোনো একটা কথা বা চুক্তি সম্ভবত ইহাঁদের নিজেদের এখন ছিল। কিন্তু সবিতা উঠিবে কি করিয়া? তাড়াতাড়ি উঠিতে চায় বলিয়াই সে একবার বলিল মিসেস সেনরায়কে,—একবার বিজয়ের সঙ্গে তিনি সবিতার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারেন না? বিজয়ের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় কাপড়-চোপড়ও যে সে সঙ্গে লইতে পারে নাই। সবিতাকে বিদায় দিবার প্রয়োজন মিসেস সেনরায় ও ভূজঙ্গ সেন উভয়েরই সম্ভবত ছিল। তাঁহাদের একটা গোপন পরামর্শ আছে। একটু পরেই সময় হইলে আরও দুই-একজন আসিবেন—সম্ভবত অনারেবল দি মিনিষ্টার ফর জাষ্টিস্, জগন্নাথ চৌধুরীও।

সময় ছিল না ওদের,—বলিল সবিতা।

না, সময় যে তাঁহাদের নাই তাহা অতি পরিষ্কার বোঝে অমিত। বোঝে—মিসেস সেনরায় কেন এই সব ব্যাপারে হাত দিতে চাহেন না। না হইলে এখনি তিনি ফোন করিতে পারিতেন মাননীয় মন্ত্রী শ্রীযুক্ত মণ্ডলকে। আর বিগলিত হইতেন শ্রীযুক্ত মণ্ডল; 'মিসেস সেনরায়—আপনি! ওঃ! ওঃ! তা দেখছি—দেখছি, এখনি বলে দিচ্ছি আমি···হাঁ, হাঁ, করব···।' হয়ত বা আধ ঘণ্টার মধ্যে সেক্রেটারিয়েট হইতে পালাইয়া স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইতেন শ্রীযুক্ত মণ্ডল। 'কাজটা হয়ে গিয়েছে মিসেস সেনরায়?··· হাঁ, হাঁ, আপনাকে তাই জানাতে এলাম।'···জানাইতে আসিবেন, এবং তাই শ্রীযুক্ত মণ্ডল বসিবেন। মিসেস সেনরায়কেও সহিতে হইবে সেই উজবুকের সঙ্গে বাক্যালাপের যাতনা। তবু যদি কেনো লাভ হইত তাহাতে? কি করিতে পারে এই 'শেডুল কাষ্ট' মন্ত্রী? নয়াদিল্লীতে ঘুঘু-বাঙালী মন্ত্রীরাই পাত্তা পায় না—জগন্নাথ চৌধুরীই পারিবেন কি না ঠিক নাই।

কিন্তু কমিউনিষ্টদের জন্য কেন কুইনী সেই আপনার চ্যান্স নষ্ট করিবেন? না, মিসেস সেনরায় অত সস্তা মানুষ নহেন। না, তিনি এসব কাজে হাত দিবেন না। বরং ভূজঙ্গ সেনকেই বলা যাউক কিছু একটা ব্যবস্থা করিতে।

মিসেস সেনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, কি করা যায় ভূজঙ্গবাবু? পারেন না কি কিছু করতে?

তিনি ভূজঙ্গ সেন—নয়াদিল্লীর এ্যাসেম্‌বলির ফোর্থ হুইপ। কি না পারেন তিনি?...তবে—এই কমিউনিষ্টগুলিকে গুলি করা দরকার...

কিন্তু বলছেন যখন আপনি মিসেস সেনরায় আর তুমিও এসেছ সবিতা—

ভূজঙ্গ সেন মাপিয়া দেখিলেন, সবিতার না হয় খাদি আর গ্রামোদ্যোগে নীরেট মাথা। বিমান-বিহারিণী মিসেস সেনরায় নয়াদিল্লীতে উচ্চমহলে একেবারে তুচ্ছ নন। সেখানে মিসেস সেনরায়কে ভূজঙ্গ-সেনের নিজ দলটা ভারী করিবার কাজে লাগানো যাইতে পারে। ফোর্থ হুইপ হইতে ফার্ষ্ট হুইপ, কিংবা একটা ক্ষুদে মন্ত্রিত্ব প্রথম ধাপেই,—এই সব কাজে একটা এ্যাসেট হইতে পারেন মিসেস সেনরায়—এই ধারণা কি ভূজঙ্গ সেনেরই নাই? না থাকিলে তিনি মিসেস সেনরায়ের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিতেছেন কেন? ওই সব শরণার্থীদের জন্য?

ভূজঙ্গ সেনের কিন্তু অভিমানও আছে। সবিতা কি তাঁহাকে জানিত না? কোথায়, সে নিজে ভূজঙ্গ সেনকে বলিল না কেন?...ভূজঙ্গ সেন রাগ করেন নাই, কিন্তু মনে ক্ষোভ পোষণ করেন। সবিতা কি তাঁহাকে এত পর বলিয়া মনে করে? তাঁহাদেরই পাড়ায় ছিল তাহার ইস্কুল।

সবিতাকে অনুযোগ দিলেন ভূজঙ্গ সেন। কুমুদ সরকারদের পাল্লায় সবিতা মিথ্যা মিথ্যা ঘুরিয়া মরিতেছে। এই খাদিগুলি অকর্মণ্য। অবশ্য ঠিকই ভাবিয়াছে সবিতা—বিজয়ের জন্য ভূজঙ্গ সেন কিছু করিতে পারিবেন না। পারিবেন কি করিয়া? কাহার সহিত কথা বলিবেন ভূজঙ্গবাবু? তাঁহাদের চিনিবে কি এখন পুলিশের কর্তারা? চিনিত অবশ্য একদিন। কিন্তু

তিনি এখন কংগ্রেসম্যান। 'মন্ত্রী নই, একটা সেক্রেটারিও নই—সেদিনের ভোঁতা টেরোরিষ্ট।'

সবিতা লজ্জা পাইল। বলিল, তাইত ভাবছিলাম এসব কাজে কি আপনারা যাবেন?

দেখা যাক্। সন্ধ্যা বেলায় বিলেল্লা প্যালেসে হোলির পার্টি আছে, দেখা হবে মন্ত্রীদের সঙ্গে। মিসেস সেনরায়ও থাকবেন তখন। তখনই বিজয়ের বিষয়ে কথা হবে পুলিশ মিনিষ্টার দে-সরকারের সঙ্গে।

ইতিমধ্যে ভূজঙ্গ সেন বলিয়া দিলেন কি-কি জিনিস বিজয়ের দরকার হইবে—কাপড়-চোপড় সাবান, তেল, টুথ পেষ্ট, ব্রাশ। বিজয়ের জন্ম তাঁহার বরাবরই মায়া ছিল। দুঃখ করিলেন—ছেলেটা কমিউনিষ্টদের দলে পড়িয়া গোঁয়ার হইয়াছে। রাগ করিলেন,—ছেলেগুলিকে কেন ধরেছে গবর্নমেণ্ট? ধাড়ীগুলিকে ধরা দরকার। তা ধরবার নামগন্ধ নেই। কেবল দুই একটা পুরাতন বোকা ধরা পড়েছে,—অমিত, সৈয়দআলী, মাষ্টার সাহেব, —সব পুরাতন বদমায়েস, কিন্তু গোবরে-ভরা নীরেট মাথা।

ভূজঙ্গ সেনকে আমার কথা না বললেই পারতে।—অমিত হাসিয়া বলিল সবিতাকে।

সবিতা বলিল, আমি বলি নি কিছু।

তা হলে এখানে দেখার অনুমতি পেলে কি করে?

ওঁরা কেউ কিছু করলেন না। তখন সরাসরি এখানেই এসেছি। এখানে এসে সরাসরি পুলিশকর্তার সঙ্গে দেখা করতে চাইলাম। ভূজঙ্গ সেনের কাছে যাব কেন? তার চেয়ে এরাই বরং ভালো।

এতটা স্পষ্টতা, কর্মোদ্যম যে সবিতার মধ্যে ছিল, ইহা অমিতের অজানা। আশ্চর্য, কি করিয়া সে আপন সংকোচ ও কুণ্ঠা কাটাইয়া উঠিল? সরাসরি একা এই গোয়েন্দা-দপ্তরে আসিয়া পড়িল—সেই সবিতা 'সাত-চড়ে কথা সরে না মুখে' সেই পার্বতীর মতই। কিন্তু পার্বতী জীবিকার গরজে উদ্যোগিনী,

শ্রমিকের দৈনন্দিন অভাবের তাড়নায় গরজ তাহার। সবিতার তাড়না কি? হয়ত বিজয়ের মায়া, হয়ত আপন প্রকৃতির দাবী। এবার কি আর সে আপনাকে খর্বিত করিবে না, খর্বিত রাখিবে না?

সবিতা জানাইল, বিজুকে দেখবেন আপনি জানি—ওর খাওয়া-দাওয়ার নিয়ম আছে। জানেন না বোধ হয় সেবারে গুলি বিঁধে অবধি ওর অন্ত্রের ক্ষত শুকোয় নি।

সবিতা জানাইল স্বল্প কথায় ও সহজ সাধারণ কণ্ঠে—তাহার কথায়, কণ্ঠস্বরে কোনোখান দিয়া যেন বেদনা ও বিক্ষোভের কোনো আঁচ না লাগে,—আর না জাগে তাহার কোনো আবেগ-স্পর্শে বিজয়ের মনের সেই বেদনাকাতর ক্ষতস্থলটির ব্যথা।

সেদিনও সকালেই বিজয় বাহির হইয়াছিল। রশিদ আলী দিবসের অভ্যুত্থানের দ্বিতীয় দিবস। সকালেই পাড়ায় ট্রামও পুড়িতে আরম্ভ করে। বিজয় ক্যামেরা লইয়া চলিয়াছিল তাহার এক বন্ধুর সঙ্গে।

বিজয় বলিল, সুরেশ কর, আপনি তাকে জানেন না।

ফটো লইতেছে তাহারা, পোড়া ট্রামের, পথের ব্যারিকেডের, মিলিটারি ট্রাকের, উদ্দীপ্ত জনতার, উৎসাহী বালকদলের। হরিশ মুখার্জি রোডে বুঝি দেখিয়াছিল তাহাকে গোয়েন্দার একটা চর। হয়ত চিনিতও সে বিজয়কে, অথবা তাহার সঙ্গী সেই বাস ইউনিয়নের সুরেশকে। গলির মোড়ে খপ্‌ করিয়া হঠাৎ তাহাদের ধরিয়া ফেলিল এক ফিরিঙ্গী সার্জেণ্ট্‌। প্রথমেই কাড়িয়া লইল ক্যামেরাটা। বিজয় আপত্তি করিতেই বলিল:

আই'ল্‌ শুট্‌ ইউ: গুলি করব।

গুলি করবে কি? ঠাট্টা নাকি?—বিজয় অমিতকে বুঝাইয়া বলিল, সত্যই আমরা ভেবেছিলাম বুঝি তামাসা করছে। পরে মনে হল—ভয় দেখাচ্ছে।

সবিতা বলিল, ওরা তখনো বলে ক্যামেরা দাও সাহেব। খানিকদূরে রাইফেলধারী ছয়জন গুর্খা। সাহেবও রিভলবার লইতেছে। তথাপি বিজয়েরা

বুঝিতে পারে নাই কিছু। বরং সুরেশ দমিয়া না গিয়া সাহস দেখাইয়া বলিল, ওসব রাখো সাহেব, ক্যামেরা দাও।

এই দিচ্ছি,—গুলি উঁচাইয়া তুলিতেই সুরেশ দুইলাফে পিছনে সরিয়া গেল। দৈবক্রমেই লাগিল না সেই গুলি। দুইজনে পিছন ফিরিয়া প্রাণপণে তখন ছুটিল গলির মধ্যে। পার্শ্ব ঘেঁসিয়া কি লাগিল একটা বিজয়ের বাম কব্জিতে। পড়িয়া গেল তাহার পরে সুরেশ; তথাপি উঠিল আবার। বিজয়ও পড়িয়া গেল, এবার ডান উরুতে বিঁধিয়াছে কিছু। কিন্তু উঠিল। একটা ফটক-ওয়ালা বাড়ির হাতায় ঢুকিয়া পড়িল। আর পারে না, বসিয়া পড়িল পোর্টিকোতে। এবার শুইয়া পড়িল সুরেশ কর,—তখনো সে জানে না গুলি তাহার পার্শ্বভেদ করিয়া কিড্‌নিতে গিয়া লাগিয়াছে। কিন্তু আর পারে না বুঝি সে। বিজয়ও আর পারে না—পা নিশ্চল, বাম হাতটা বুঝি চূর্ণ হইয়াছে, পেটেও লাগিয়াছে নাকি?

—স্তব্ধ হইয়া যাইতেছে কি অমিত? কিন্তু ইহাও ত সুপরিচিত কাহিনী।

অমিত শুনিল: শুধু দুইজন তাহারা দুইজনের দিকে তাকাইয়া। মনে হইল বিজয়ই বেশি আহত—রক্ত ঝরিতেছে তাহারই বেশি। পিপাসার জন্ম জল চাহিতেছে, কেহ তাহা দেয় না। চারিদিকের বাড়ি হইতে লোকে জানালা দিয়া দেখিতেছে।

বিজয় বলিল,—এইবার তাহার হাসি ম্লান,—সুরেশ আমাকে বলে, 'আমরা বোধ হয় আর বাঁচব না।' —আমরা!—তখনো ও ভরসা দিতে চায় আমাকে, মরলেও আমি একা মরব না। একজন সঙ্গী থাক্‌বে।

...অমিত বিজয়ের ইঙ্গিত বুঝিল। হাঁ, জীবনের অপেক্ষাও বেশি করিয়া চাই আমরা মরণের সম্মুখে কাহাকেও আপনার দোসর রূপে। জীবন আপনিই একটা মহারাজ্য। অফুরন্ত তাহার আত্মীয়তা। মৃত্যু শূন্যময়, মৃত্যু অনাত্মীয়, সেইখানে সকল পরিচয়ের শেষ-সীমা। তাই মৃত্যু এত বিভীষিকা। তাই ত জীবনের শেষপ্রান্তে দাঁড়াইয়া আমরা বাহু মেলিয়া দিই—কাহাকেও কি

আঁকড়াইয়া ধরিতে পাইব না? কোনো একটি সুপরিচিত হাত; কোনো দুইটি সবল সন্তান-বাহু; কোনো একটি ব্যথায়-বিস্ময়ে-ভয়ে কাতর নবীন দেহের উষ্ণস্পর্শ। তাহাও যেখানে নাই, চাই সেইখানে অন্তত কোনো একটি পরিচিত হৃদয়ের আশ্বাস—'আমি রহিলাম তোমার অন্তিম অংশভাক্, তোমার চরম আশ্বাস, তোমার জীবনান্তের সঙ্গী।'

দুই ঘণ্টা পরে পাড়ার লোকেরা ফোন্ করিয়া এ্যাম্বুলেন্স আনায়—তাহাদের হাসপাতালে পাঠায়।

সবিতা জানাইল—সেই রাত্রে সেই ছেলেটি মারা গেল। বিজয়কেও বাঁচানো গেল অনেক কষ্টে। হাতটা গিয়াছে; পাটাও যাইতে বসিয়াছিল হাসপাতালের ডাক্তারদের দোষে। তাহারা যেন দেখিয়াও দেখে না—সেপটিক হইল, দুই দুইবার কাটিল, শেষে এম্পুটেট করিবার কথা। কিন্তু পেটের ঘা'ই মারাত্মক হইতেছিল। বাড়ি হইতে পেনিসুলিন প্রভৃতি সরবরাহ করিয়া তাহাকে রক্ষা করা গেল। অথচ পেটে ক্ষত হইয়াছিল সামান্য,—পার্শ্ব দিয়া গুলিটা ছিটকাইয়া গিয়া হাতে বিঁধে।

ইচ্ছা করিয়াই সবিতা সমস্ত ব্যথা গোপন করিল। সে জানে, এই সব কথা বিজয়কে অনেক বেশি আলোড়িত করে; সে কুণ্ঠিত হয় ইহার আলোচনায়। অমিতও বুঝিতে পারে—জীবনে সমস্ত সৌভাগ্য ছিল বিজয়ের—সে ভালো হকি খেলিত, আজ সে কি মানুষের শুধু কৃপার পাত্র হইবে? না, কিছুতেই না। সে এইজন্য তাহার পুরাতন সহপাঠিনীদের সঙ্গও বর্জন করিয়াছে—এক সময়ে তাহারা বিজয় বলিতে অজ্ঞান হইত। কিন্তু সে বিজয় আর নাই। বিজয়ও নাই আর সেই সমাজে।

কিন্তু এদিকে বিজয়ের পেটে একটি ব্যথা প্রায় লাগিয়াই আছে। খাওয়া-দাওয়া অত্যন্ত নিয়ম মত করিতে হয়। ডাক্তার বলেন, হয়ত সেই গুলিরই ফল। যাহাই হউক, বিজয়কে যদি উহারা ধরিয়া রাখে, এই দিকে একটু সাবধান হইতে হইবে অমিতের।

অমিত সহজ ভাবে শুধু জানায়—তাহা দেখিতেই হইবে।

সবিতা একবার চুপ করিয়া রহিল, পরে স্থির দৃষ্টিতে বলিল, মন্নুকে সব কথা লিখে একটা চিঠি দিয়ে দিলাম।—

মন্নুকে ?

অমিত জানে সবিতার পক্ষে মন্নুকে পত্র লেখার অর্থ কি ? তাহা যে তাহাদের দুইজনার পক্ষেই প্রায় দুইজনাকে স্বীকৃতি। তাই অমিতের কণ্ঠ হইতে আপনা আপনি ফুটিয়া উঠিল বিস্ময়োক্তি : 'মন্নুকে।'

সে ছাড়া আর কে আছে ? অনু ও শ্যামল ত' নেই—এখন আসবেও না। তার সাহায্য না পেলে আমার চলবে কেন ?

অর্থসূচক দৃষ্টি আবার সবিতার চক্ষে। তাহার বক্তব্য অমিতের বুঝিতে বাকী রহিল না। তবে কি সত্যই সবিতা জীবনে আর একটি নূতন পৈঠায় এবার অবতীর্ণ হইবে!—আত্মসংকোচনের মোহে, অধ্যাত্মবাদের ছলনায় আর কি সে আপনাকে ছলনা করিতে চাহে না ? জীবনকে সে কি স্বীকার করিবে, স্বীকার করিবে মন্নুর সঙ্গে একযোগে তাহার জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করিতে নতুন ভিত্তিতে ?…

কিন্তু অমিত সাবধানে বলিল, ওদের ব্যবস্থাও হয়ত মন্নু সময় পেলেই করবে।—

সবিতা একটু তাকাইয়া থাকিয়া বলিল, আমিওত আছি।··

অমিত বুঝিল। বলিল, তোমার যে অনেক কাজ। কষ্ট হবে।

সবিতার দুই চক্ষুর মধ্যে অমিত পাঠ করিল যেন এক নিবেদন।

তাই সে নিজেই আবার বলিল, কিন্তু কাজকে ভয় কি, সবিতা ? অভীঃ।

গোয়েন্দা আপিসের ফাইল আর দপ্তর, পার্শ্বে একজন গোয়েন্দা উপবিষ্ট। প্রত্যেকের কথা চলে সতর্ক; অমিতও কথাটা বলিল ঈষৎ লঘু স্বরে। কিন্তু সেই কথায়, দুইটি চোখের তারায় একটা নতুন কৃতজ্ঞতা ও নতুন সংকল্প যে ঘনায়িত হইয়া উঠিল, তাহা বুঝিতে কষ্ট হইল না!…অভীঃ, অভীঃ, অভীঃ।

আর কোনো কথার প্রয়োজন আছে কি, অমিত ? কোনো কথার আর সার্থকতা থাকিতে পারে সবিতার জীবনে ?

সাক্ষাতের সময় শেষ হইতেছে। বিজয়ের সহিত উঠিতে উঠিতে অমিত বলিল: তুমিই দেখবে তবে এবার থেকে মনুকে। দেখবে।—

দাঁড়াইল সবিতা: নিশ্চয়ই। সে আমার পুরোনো বন্ধু। এক সঙ্গে দু'জনা পড়েছি। আমিই তাকে দেখব।

অমিত দাঁড়াইয়াছিল; সবিতাও থামিল। সে চক্ষে কি আর একটা ক্লান্ত বিনীত স্বীকৃতিও দেখিল অমিত ?···তাহা হয় না, তাহা হয় না। সবিতা তাহার জীবনকে, তাহার ভাঙা-চোরা জীবনকে—জোড়াতালি দিয়া বাঁধিতে চাহে না। যাহা হারাইয়াছে তাহাকে সে পুনরুদ্ধার করিতে পারিবে না। যাহা হারাইয়াছে—তাহাকে হারাইয়াছে বলিয়াই সে স্বীকার করিবে; হারানোকে স্বীকার করিতে সে ভয় পায় না। সে ভয় পায় না, সে জয় চায় না—এই ত তাহার অনাসক্তি যোগ। তাহাই সে গ্রহণ করিবে। গ্রহণ করিবে তাই মনুর ভার, আর অনুর কাজও;—আর গ্রহণ করিবে জীবনকে—সহজ জীবন নয়, মহৎ জীবনকে। সবিতা-মনুর সংসার নয়, সবিতা-মনুর জীবন, ও শ্যামল-অনুর জীবন;—যে জীবনে আছে জীবনের বিস্তার—গার্হস্থ্য নয়, কর্মযোগ—বহুজন হিতায় চ বহুজন সুখায় চ।

গোয়েন্দাআফিসার সহকর্মীকে বলিল, ওঁর সঙ্গে যাও, ফটক খুলে দিতে বলো।

সবিতা শেষবারের মত বিজয়ের মাথায় হাত রাখিল। বলিল, অমিদা'কে বলেছ তোমার কথা? বলো নি? তা হলে এতক্ষণ বললে না কেন আমাকে। ওঁকে জিজ্ঞাসা করতাম।—

বিজয় বাধা দিয়া বলিল, ঠিক হোক, ওঁদের ত বলবই।

সবিতা কি ভাবিল, শেষে বলিল, যা'ই হোক বিজু, আমি কিন্তু ভয় পাই না।

বিজয় তাহার সঙ্গে সঙ্গে ফটক পর্যন্ত চলিল।

'আমি কিন্তু ভয় পাই না',···ভয় পাইবে না সে কোন জীবন স্বীকৃতিতে? সহজ জীবন স্বীকৃতিতে, না মহৎ জীবন স্বীকৃতিতে—না দুইয়েতেই?

আমাকে চিনতে পারলেন না বোধ হয়, অমিত বাবু?

কে?—অমিত পিছনে ফিরিয়া দেখিল সেই গোয়েন্দাঅফিসার ভদ্রলোক, তাহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। নিজেই সে বলিল আবার, আমি চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী···

অমিতের মনে পড়িতেছে না তথাপি। চন্দ্রকান্ত জানাইলেন, আপনাকে একবার এ আপিস থেকে আমি বাড়ি পৌছে দিয়েছিলাম—সে দশ বৎসর হবে প্রায়···

ওঃ। অমিতের মনে পড়িল, সেই গোয়েন্দা যুবক—স্পোর্টস্ম্যান বলিয়া যে চাকরি পাইয়াছিল, খেলার কথায় ছিল তখনো উৎসাহ···ঝাপ্সা হইয়া গিয়াছিল সেদিনের কথা অমিতের মনে।

অমিত বলিল, দেখুন, ভাবিই নি আপনি আছেন এখানে! তা এখন আপনি কী পদে?

ইন্স্পেক্টরের কাজে প্রমোশন পেয়েছি গত আগষ্ট। অনেকে এ বিভাগ ছেড়ে দিলেন, তাতেই একটু সুবিধা হল। ডি, সি, বললেন—ইণ্টারভিউ নাও। সবিতা দেবী যখন বললেন আপনার সঙ্গে দেখা করবেন উনি, কিছু ফলটল নিয়ে এসেছেন, তাতে মিছা বাধা দেবার আমার কি?

চন্দ্রকান্ত অমিতের পরিচয়কে মনে করিয়া রাখিয়াছে, আর তাই অমিতের সঙ্গেও সবিতার সাক্ষাৎ হইয়া গেল।···কোন্ দশ দৎসর পূর্বেকার আধঘণ্টার বা পনের মিনিটের একটি মানবীয় পরিচয়ও এই গোয়েন্দা দপ্তরের ধরা-বাঁধা নিয়ম ও দুর্মতিকে ছাড়াইয়া উঠে—এই নয়া স্বাধীনতার এত পরিবর্তনের এপারে আসিয়াও পৌছে,—যখন ভুজঙ্গ সেন পাইলে তোমাদের গুলি করে, আর মিসেস সেনরায় হন স্বাধীনতার বড় কংগ্রেস-কর্ত্রী—তখন চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী—আই বি ইন্স্পেক্টার অব পুলিশ, কলিকাতা স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের,—সে আবার তোমার পরিচয়কেও মনে করে একটা স্মরণীয় জিনিস, গর্বের কথা।···

অমিত সহাস্যে বলে, খেলা-টেলা আছে ত এখনো, চন্দ্রকান্তবাবু?

খেলা? সে কবে শেষ হয়ে গিয়েছে, অমিতবাবু। আপনিই দেখি তবু মনে রাখেন—আমি একদিন ছিলাম স্পোর্টস্ম্যান।

অমিত বলিল, খেলা যে আশ্চর্য্য জিনিস। মস্কো 'ডাইনেমোর' কথা ত' শুনেছেন। স্পোর্টস্ প্যারেড' দেখেছেন? দেখে আস্‌বেন—সিনেমায় মস্কোর 'স্পোর্টস্ প্যারেড্'। মনে হবে—হয় আপনার জন্মানো উচিত ছিল এ্যাথেন্‌সে, নয় এ যুগের এই নতুন এ্যাথেন্‌স মস্কোতে—তা হলেই স্পোর্টস্‌ম্যানের জীবন সার্থক।

কেমন একটা সস্মিত কৃতজ্ঞতা গোয়েন্দা ইন্‌স্পেক্‌টার চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তীর মুখে। আর সে খেলোয়াড় নাই, শরীর ভারী হইয়াছে, মাংসল হইয়াছে, সুডৌল হইয়াছে, একটা নিশ্চলতার ছাপ পড়িতেছে তাহার শক্ত মজবুত দেহে। তবু এই অমিতবাবু,—এত বৎসর পরেও মনে করিয়া রাখিয়াছেন একদিন সে চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তীও ছিল স্পোর্টসম্যান। সে খেলিত···একদিন সে ভালো খেলিত—সে পরিচয়টা চন্দ্রকান্তের মনেও আজ জীয়াইয়া উঠিতেছে।

কিন্তু বিজয় আসিয়া গিয়াছে। হাঁ, চন্দ্রকান্তও বিদায় লইবে। অমিত বলিল, একটি ছেলে হয়েছিল না আপনার তখন?—সেদিন যেন কি কাজ ছিল তার? কেমন আছে সে? আর ছেলেপিলে কি আপনার?

চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী সপুলক আনন্দে বলিলেন, আপনার তাও মনে আছে? হয়ত তার ভাত ছিল সেদিন। এখন সে ইস্কুলে পড়ছে। আরও দুটি মেয়ে, একটি ছেলে হয়েছে। হাঁ ভালো আছে সব। সবাই এখানে। আর কি, দেশ ত পাকিস্তান হয়ে গেল। যা বলেন, আপনারা লীডাররা আমাদের তুলে দিলেন লীগের হাতে; সর্বনাশ হল বাঙলা দেশেরই।···দেখুন এখন। আচ্ছা, নমস্কার। ফলমূল জিনিষপত্র পাঠিয়ে দিচ্ছি আমি ভেতরে।

চন্দ্রকান্ত বিদায় লইল। দশ বৎসর আগেকার পনের মিনিটের পরিচয় একটা নূতন আলোকে ভাঙিয়া চুরিয়া আবার নতুন হইয়া উঠিতেছে···মিথ্যাও নয় তবে সেই পনের মিনিট—সেই পরিচয়—সেই মানুষ···

বন্দিগৃহের দিকে চলিতেছিল তাহারা দুইজনে। বিজয় ধীরে ধীরে বলিল, মাসী এবার এগিয়ে এলেন, অমি'দা'।

তোমারও তাই মনে হল, না?—আসতেই হবে, বিজয়। জীবন সম্বন্ধে যাঁরা সীরিয়াস্ সাধ্য কি তাঁরা অস্বীকার করবেন এই শতাব্দীর জীবন-পথ?

জীবন সম্বন্ধে যাহারা সীরিয়াস্ ··

পঁয়ষট্টিজনের সেই গৃহে পৌঁছিয়া গিয়াছে অমিত। প্রশ্ন আসিতেছে—বিজয়কে ঘিরিয়া ধরিয়াছে দিলীপ, মঞ্জু, বিজয়ের বন্ধুরা। হর্ষোৎসবও পড়িয়া গিয়াছে—খাবার জিনিসপত্র দিয়া গিয়াছে নাকি বিজয়ের মাসী। সেই সবিতা রায়? হাঁ, হাঁ, সেই খাদি গ্রুপের সবিতা রায়···সুজাতার বিস্ময় আর কৌতুক একই সঙ্গে ফুটিয়া উঠে।

গান্ধীপন্থী সবিতা রায়—কিন্তু জীবন সম্বন্ধে সে সীরিয়াস'···। জীবনে যে সীরিয়াস সে কি করিয়া নিজেকে বঞ্চিত করে? জীবন সম্বন্ধে যে সীরিয়াস সে কেন আত্মপ্রকাশে এতটা থাকে সংকুচিত? সংকুচিত সে, তথাপি জীবনের মহৎ প্রকাশের অভিযানে সে চলিল আজ আগাইয়া। না, ইহাও তাহার আপনার হইতে আপনাকে গোপনেরই একটা পন্থা? প্রকাশের পন্থায় মিশাইয়া যায় সবিতার পলায়নেরও পন্থা।

অন্ধকার হইতেছে। ঘরের এক কোণে এবার চুপ করিয়া বসিল অমিত। এমনি সময়ে কাল ইন্দ্রাণীর জন্য সে অপেক্ষা করিতেছিল তাহার গৃহে। আর আজ এই মুহূর্তে ইন্দ্রাণীকে তাহার মন হইতে দূরে সরাইয়া রাখাও সম্ভব হয় না। ·· এই শতাব্দীর জীবন-পথ আত্মনিগ্রহে নয়, বুঝিয়াছিল ইন্দ্রাণী! বিদ্রোহেও নয়,—বুঝিয়াছে তাহা সবিতা—বোঝে নাই যাহা ইন্দ্রাণী।—

গ্রামোদ্যোগ আর বুনিয়াদি শিক্ষা লইয়া মনে মনে সবিতা পূর্বেই সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিতেছিল—তাহাতে ভুল নাই। ইহা ত মানুষকে আফিম্ খাওয়ানো। বুঝিবার যেটুকু বাকী ছিল তাহা সম্পূর্ণ হইয়াছে এই কয় মাসের স্বাধীনতার ফলে—গ্রামোদ্যোগীদের বাণিজ্যোদ্যোগ দেখিয়া আর হোমরা-চোমরাদের কংগ্রেসাগ্রহ দেখিয়া।

মোড় ঘুরিতেছে তাহার কাজের, মোড় ঘুরিল তাহার পথের। সে পথটা সে জানিত বহুজন হিতায় চ বহুজন সুখায় চ। কিন্তু জানিত না বহুজনের সেই পথ চলে আমাদের সংগ্রাম-ক্ষেত্রের দিকেই; অথচ সবিতা চলিতে চায় সংগ্রাম হইতে দূরে দূরে নিভৃতে নিরালায়, ছায়ায় ছায়ায়।

আজ সেইপথ তবু আনিয়া ফেলিল সবিতাকে শত সহস্রের কোলাহল মুখর যুগান্তরের এই পথের উপর। চিরদিনের ভয় কাটাইয়া, সংকোচ কাটাইয়া, সবিতা—আত্মগোপন যাহার ধর্ম, আত্মবিলোপ যাহার নিয়ম—একা আসিয়া দাঁড়াইল এই গোয়েন্দা আপিসে তোমাদের সাক্ষাৎপ্রার্থিনী শুধু কি বিজয়ের মায়ায়? একা চেষ্টা করিয়া দেখা করিয়া গেল সে অমিতেরও সহিত, শুধু কি অমিত-মনুর প্রীতি প্রেমে? দেহের ঔজ্জ্বল্য ম্লান হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এমন স্বচ্ছন্দ নির্ভয় সবিতা বুঝি আর কোনো দিন ছিল না। তথাপি নিজের ভাগ্য লইয়া বোঝাপড়া করিতেও চায় না আর সবিতা—জিনিয়া লইবার লোভ নাই আর কিছু। অনেক আগাইয়াছে সে আরও আগাইবে—আরও।

কিন্তু তথাপি সবিতা বিশ্বাস করিত অহিংসায়, সত্যাগ্রহে। তাহাই যে ভারতবর্ষের চিরকালের কথা। শুধু তাই বলিয়াও নয়—উহা যে সবিতার জীবনের সম্মুখে তাহার নিয়তির নির্দেশ। না হইলে বিধাতা তাহাকে যৌবনের প্রারম্ভেই এমন রিক্ত করিলেন কেন? তাই সবিতা মানিয়া লইয়াছিল এই আত্ম-সংকোচনেই তাহার সার্থকতা। মনুকে সে ভালবাসিয়াছে—নিজের অগোচরে ভালোবাসিয়াছে; আর মনুও তাহাকে ভালোবাসিয়াছে নিজের অজ্ঞাতে। সেই ভালোবাসাকেই সে স্বীকার করিল আজ; কিন্তু স্বীকার করিল এই পৃথিবীর কর্মোদ্যোগের মাঝখানে। স্বীকার করিবে তাহা মহৎ জীবনের পাথেয় রূপে, সহজ জীবনের উপকরণ রূপে নয়।···

অনেক সংগ্রামে সবিতা জয়ী; কিন্তু বিজয়িনীর বৈভব সে চাহে না। জয়ের উন্মাদনা নাই তাহার; পৃথিবীর বিরুদ্ধে তাহার নালিশ নাই, ভাগ্যের বিরুদ্ধেও সে চাহে না নতুন অভিযান।···

অনেক আগাইয়াছে—কিন্তু সে যে চাহে না আত্মোন্মোচন। তার মান আছে, লজ্জা আছে, ভয় আছে,—হয়ত তাহাও খসিয়া যাইবে একটু একটু করিয়া। কিন্তু তবু সবিতার মনে থাকিবে ভারতীয় ঐতিহ্যের সূক্ষ্মস্থূল, বাস্তব-কাল্পনিক, বহু বহু মানসিক-আধ্যাত্মিক বন্ধন।

সে ইন্দ্রাণী নয়—বিজয়িনীর অভিবান চাহে না।…সে ইন্দ্রাণী নয়—বিদ্রোহের মিথ্যায় তাই সে দিগ্‌ভ্রান্ত হইবে না। বহুজন হিতায় চ বহুজন সুখায় চ তাহার জীবন—

আর তাহাই ত এই জনতার মহাপথ, না সবিতা?

সাত

জ্যোতির্ময় সেন অমিতের কাছে আসিয়া বসিয়াছিল। বলিল, শুনলাম কাউকে ছাড়ছে না ওরা—

একসঙ্গে জেলে ছিল তাহারা অতীতে, একসঙ্গে চলিয়াছে এই পথে। জ্যোতির্ময় সত্যকারের কর্মী, অমিতের স্নেহভাজন।

অমিত বলিল, অন্তত আপাতত।

জ্যোতির্ময় বলিল, আপনার কি মনে হয়—এভাবে কতদিন রাখ্‌বে?

এবার?—'শেষ যুদ্ধ শুরু আজ, কমরেড্'। তা হলে হয় আমরা রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকার করব, নয় আমরা রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে নগণ্য হয়ে যাব।

সে ত দুই চরম অবস্থার কথা বল্‌লেন। মাঝখানে কি কিছু হতে পারে না? যেমন, ওরা বুঝ্‌বে—এ ভাবে আমরা নিঃশেষ হব না। আমরা ত বুঝছিই—আমাদের সংগঠন দুর্বল। শেষ যুদ্ধ হলেও ডিসাইসিভ্ এ্যাক্‌শান-এর অনেক দেরী। প্রস্তুতির সময় চাই—ততক্ষণ একটু চুপচাপ থাকি না কেন আমরা।

অমিত বলিল, সম্ভবত আর তা সহজে পাব না—এস্পেক্‌টার ইজ্ হন্টিং দি ওয়ার্লড্। ডিসাইসিভ্ এ্যাক্‌শান্‌ও পৃথিবীতে শুরু হয়ে গিয়েছে। তবে সমস্ত ফ্রণ্টে সমান জোরে তা বাধে নি এখনো, পৃথিবীর সর্বত্র সমান অবস্থাও নয়।

জ্যোতির্ময় সেন একটু চুপ করিয়া রহিল। বলিল, আপনার কি মনে হয়—জেলে বসে থাকাটা ঠিক হবে? বাইরে কাজ তত এগিয়ে গিয়েছে কি?

অমিত হাসিল।—পাগল! কাজের এখনো কি?

ওঁরা বলছিলেন—আমরা যারা পাকিস্তানে ছিলাম তাদের দরখাস্ত করে, মামলা করে বেরিয়ে যাওয়া দরকার—'আমরা পাকিস্তানের লোক, ইণ্ডিয়ান ডোমিনিয়ন আমাদের ধরে রাখবে কেন?' কাজটা কি ঠিক হবে?

অমিত বুঝিতে পারে না :—আপত্তি কি?

কেমন 'আবেদন-নিবেদনের' ভাব আছে না কথাটায়?

থাক্‌লই বা?—

কিন্তু শুনিয়া খুশী হইল না জোতির্ময়, চুপ করিয়া রহিল। তারপর আবার বলিল—অনেকটা নিজের কাছেই বলিতেছে হয়ত,—ঠিক কথা। কিন্তু পাকিস্তানের হাতে ওরা আমাদের দিলে ত আরও বিপদ। তারা ছাড়বেই না।...তা ছাড়া, ছাড়লেই বা আমি পাকিস্তানে যাই কি করে? থাকি কোথায়?...করব কি? মিনতি এখানে, তার নিজেরও অসুখ। শেষ পর্যন্ত তা টি, বি,ও সাব্যস্ত হতে পারে। কোথায় রাখব ওকে জানি না। মেয়ে দুটোও তো আছে। টাকাই বা কোথা? একটা কাজকর্ম কিছু এবার না করলে আর চলে না।...এতদিন শ্যালা ছিলেন, শ্বাশুড়ী ছিলেন।—শহরে ছিল শ্যালার সাইকেল ও ইলেকট্রিক গুড্‌সের দোকান। একসময়ে রাজনৈতিক কাজ-কর্ম করতেন মিনতির দাদাও, কাজেই আমারও এতদিন ভাব্‌তে হয় নি। মিনতি আমাদের বাড়িতে থাকৃত না, থাক্‌ত ওর দাদার কাছে; সেখানেই পার্টির কাজকর্ম করত। আমাদের দেশের বাড়িতে ত আর যাবার উপায় নেই। দাঙ্গার পরে পাড়া প্রতিবেশী সবাই ছেড়ে এসেছে। মিনতি থাক্‌বে কি করে একা মেয়ে দুটি নিয়ে? ঢাকায় ওদের ব্যবসাও আর চলে না—ভদ্রলোকরা চলে এল, শহরের খরিদদাররা কমে গেল, মুসলমানরা নতুন আস্‌ছে পাড়ায়, এখান থেকেও মালপত্র যায় না; কাজেই সেই ব্যবসাপত্র বিক্রী করে মিনতির দাদা চলে এসেছেন। তাঁদের বাড়িও অমনি নিয়েছে পাকিস্তান সরকার। গোড়ের ওদিকে একটা কাঁচা বাড়িতে আপাতত দুটো ঘর নিয়ে তিনি আছেন। কি করবেন ঠিক নেই...টাকা কড়ি শেষ হয়ে আস্‌ছে—দু'চার মাস আর চল্‌বে হয়ত...

শত সহস্র পরিচিত কাহিনী আর বহু পরিচিত দৃশ্যের মতই একটি কাহিনী ইহা অমিতের পক্ষে। ভদ্রলোকের রাজনীতি একটি মুহূর্তে পূর্ব বাংলায় মেরুদণ্ড ভাঙিয়া ধ্বসিয়া গিয়াছে। জনতা হইতে বিচ্ছিন্ন রাজনীতি শুধু বিদেশী-বিরোধের উপর আপনাকে পুষ্ট করিয়াছিল, কিন্তু আজ পূর্ববাংলার শোষকই জনতার চক্ষে স্বজাতীয়। জনতা-বিচ্ছিন্ন সেই ভদ্র-সন্তানের রাজনীতি তাই এখন একেবারে ফাঁকা।···অথচ সাহসের অভাব ছিল না, ত্যাগের অভাব ছিল না ; সত্যই বীর্যময় মহৎ প্রকাশের আশ্চর্য প্রমাণ রাখিয়া গিয়াছে সেই পূর্ববাংলার জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীরা—সূর্য সেন, প্রীতি ওয়াদাদার। আর আজ দেশ ছাড়িয়া পলাতক, পথে পথে অন্নহীন বস্ত্রহীন অসহায় মেরুদণ্ড-ভাঙ্গা পূর্ববাংলার সেই নর-নারী। জ্যোতির্ময় সেন মিনতি সেন পর্যন্ত আর আজন্মের কর্মক্ষেত্রে দাঁড়াইবার মত ঠাঁই পায় না। জ্যোতির্ময়ের মেরুদণ্ডও বুঝি তাই আর খাড়া থাকিতে চাহে না।

অমিত শুনিতেছিল : মিনতির মা কিছুতেই যাবেন না পাকিস্তানে।···মিনতি যেত,···আমাকেও যেতে দিতে আপত্তি করত না,—নিজের শরীরের এ অবস্থায় গিয়েই বা করবে কি সে?···সংসারে যে অবস্থায় পড়েছি, আমিই বা গিয়ে করব কি পাকিস্তানে?—রোজগার করতে হলে কলকাতাতেই থাকতে হয়···হাঁ, পাকিস্তানে কাজ করতাম, ঠিক। ওঁরা বলছেন, সেখানেই থাকো। কিন্তু ওঁরা বুঝছেন না সেখানে আমি যাই কি করে এখন?···মেয়ে দুটো আছে। মাষ্টার সাহেবকে বলিনি···কিন্তু রোজগার না করলে আর চলে না। মিনতিকেই কি বুঝোতে পারি আবার ফিরে যাবার কথা?—

আসলে ওর টি-বি, নাও হতে পারে। ওর কেমন বিশ্বাস—শক্ত কিছু একটা অসুখ ওর হয়েছে। কিন্তু ডাক্তারও দেখাতে চায় না। আর আমি কাছে না থাকলেই গোলমাল বাধায় ; কারো কোনো কথা শুনবে না। করি কি এখন?—এ অবস্থায় ওকে ফেলে পাকিস্তানে যাই কি করে?—মাষ্টার সাহেব এসব বুঝতে চান না—বললেন, 'যাদের সঙ্গে কাজ করেছেন তারা এখনো সেখানে—পূর্ববাংলার কৃষক। আর আপনি থাকবেন এখানে?'

কিন্তু বুঝিতে পারে অমিত। হয়ত তপনের সেই সমস্যাও অন্ত দিক

হইতে আসিয়া দেখা দিয়াছে জ্যোতির্ময়ের জীবনে। তপন দাঁড়াইয়া গিয়াছে,—দাঁড়াইয়া না গেলেও ক্রমে দাঁড়াইয়া যাইবে। দেশলক্ষ্মীর মজুরের ভাগ্যের সঙ্গে তাঁহার জীবন মিশিয়া যাইতেছিল—অবশ্য কে বলিবে তাহা কত দিনের জন্য ?··· মিশিয়া গিয়াছিল জ্যোতির্ময় সেনের জীবনও ত। জেল খাটিয়াছে সেদিনে জ্যোতির্ময়, কাজে লাগিয়াছে আবার। দশ বৎসর এমন আন্দোলন নাই যাহাতে জ্যোতির্ময় তাহার জেলায় অগ্রণী হয় নাই। মিনতিও ছিল তাহার সঙ্গীই !·· তবু এই ত আজ ভাঙিয়া পড়িতেছে মিনতি, মেরুদণ্ডে ঘা খাইয়াছে জ্যোতির্ময়ও। আর পারে না যেন সে। শক্ত আমরা কতটুকু ? ততখানিই আমরা শক্ত যতখানি শক্ত জনতার আন্দোলন।···দেশবিভাগে বাঙালী জাতির মেরুদণ্ডই সেই জন্য ভাঙিয়া যাইবার কথা। তথাপি সে মেরুদণ্ড খাড়া হইবে। কারণ, সাধারণ মানুষের মৃত্যু নাই···'ওরা কাজ করে'···হোক্ বাঙলা দুইখণ্ড, বাঙালী জনগণের জীবন খণ্ডিত করে কে ? কিন্তু খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে জ্যোতির্ময়···তাহার যে এখন জনতার আন্দোলনের মধ্যে আর আশ্রয় নাই। করিবে কি-সে আজ ? মিনতিও তাহাকে আজ খণ্ডিত করিয়া ফেলিতেছে। ক্লান্ত, ক্লান্ত, বড় ক্লান্ত ! জ্যোতির্ময়ের চোখ মুখ সমস্তর উপর যেন এই ক্লান্তি-কাতরতা দেখিতেছে অমিত। কি উত্তর দিবে অমিত জ্যোতির্ময়কে ?

অনেকগুলি কণ্ঠে কি হর্ষোচ্ছ্বাস এত কথাবার্তা ? 'বন্ধ হয়ে গিয়েছে—' 'হাঁ, দু'সেক্‌সান—সাউথ্ ও নর্থ।' 'ইন্‌কেলাব জিন্দাবাদ'।

'ট্রামে হরতাল হয়েছে।'···

এই ত উত্তর সমুত্থিত হইল। 'বাহাদুর ট্রাম কা মজদুর'—আমার প্রশ্নের উত্তর যোগাইতেছে তাহারা কলকাতার বুকের উপর। কিন্তু উত্তর পড়িতে পারিতেছি কি আমরা ভারতবর্ষের মানুষ ? এ দেশের ইতিহাসও বিভক্ত নয়, আর ঐতিহ্যে-আবদ্ধ জনতাও প্রাণচঞ্চল। বুঝিতেছে কি তাহা এ-দেশের মেয়ে, এ-দেশের পুরুষ ?···

'দুনিয়া কী মজদুর এক হো !'

ঠিক, বুলকন্, ঠিক। ভারতের মজদুর, পাকিস্তানের মজদুর এক হইবেই।···

বিজয় বলিল, সবিতা মাসী বলেছিলেন—'ট্রাম ত বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বাসেই যাব।' তখন বুঝি নি তাঁর কথার অর্থ।

ঐতিহ্য-বিমুগ্ধা সবিতার মনেও তাহা হইলে ঢুকিয়াছে এই উত্তরের প্রতিধ্বনি। শোনো, জ্যোতির্ময়-মিনতি, শোনো তোমরাও এই উত্তর।

তথাপি বৃহৎ কিছু এখনি হইবে না,—অমিত মনে করে এখন-এখনি বৃহৎ কিছু হইবে না। তাহারা প্রস্তুত নয়,—মালিকেরা প্রস্তুত। মাউন্টব্যাটনী স্বাধীনতায় দেশ এখনো প্রভাবিত। দালাল শাসকেরা আক্রমণ করিতে দেরী করে নাই, কিন্তু মজুরপার্টি আত্মরক্ষা করিতেও যেন ভুলিয়া ছিল। উহাদের একদিকে ডিকেন্স্ লেন্-এর মত গুপ্ত ঘাতকবাহিনী, অন্য দিকে পুলিশ রাজের প্রকাশ্য চণ্ডনীতি। তথাপি ভরসা—পৃথিবীর বিপ্লবী চেতনা। কিন্তু সময় লাগিবে—একটু সময় লাগিবে, বিজয়। তবে 'শেষ যুদ্ধ শুরু আজ' এশিয়ায়ও!

বিজয় বলিল, কিন্তু এই যুদ্ধের সময়টা কি জেলেই কাটাতে হবে বসে বসে?

বসে বসে কাটাতে হবে কেন? যুদ্ধ সেখানেও আছে। বরং জেলে যুদ্ধ লেগেই থাকবে। সময়ই পাবে না। আর সময় যদি পাও তাহলে—লিখ্‌বে, পড়বে; কর্মক্ষেত্রের অভিজ্ঞতাকে বিচারে চিন্তায় আপনার করে নেবার অবকাশ পাবে লিখে, যাচাই করে। এই ত সময় পেলে।—আর তোমার ত কথাই নেই—একটু হাসিয়া বলিল অমিত,—কাগজ আছে কলম আছে, লিখবে কবিতা, সাহিত্য; গ্রো মোর সাহিত্যিক ফুড্, ইঞ্জিনীয়ার্স অব হিউম্যান্ সোল্।

আসলে পরিহাস করে নাই অমিত। বিজয়ও পরিহাস মনে করে না। লিখিতে হইবে, না হইলে বসিয়া থাকিবে নাকি? ব্যর্থ হইবে বিজয়? লিখিবে বলিয়াই ত সে খেলা, ফোটো তোলা ছাড়িয়া এই কর্মস্রোতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু অভিজ্ঞতা না হইলে লিখিবে কি? জানে কি সে? ভদ্র অবস্থাপন্ন বাঙালী পাড়ার ভদ্রলোকের জীবনযাত্রা, কলেজে-ইউনিভার্সিটির কোলাহল মুখর ছাত্র-ছাত্রী, তাহাদের বামপন্থী তর্ক কিংবা সাধারণ নিরপরাধ প্রেম-গুঞ্জন,—ইহাই ত

বিজয়ের অভিজ্ঞতার জগৎ। অবশ্য তাহার দৈহিক দুর্বিপাকের পরে তাহার সেই বন্ধুরা একটু দূরে দূরে থাকে। কিন্তু এই শিক্ষিত বাঙালী যুবকের জগৎ কতটুকু ? আর কতখানি ইহার মূল্য? দূরে মানব-সমুদ্রের গর্জন বিজয় শুনিতে পায়—ইহার মধ্য হইতেও। মহাকালের মন্থন যে শুরু হইয়াছে তাহার ঘরের বাহিরেই। জীবনের তরঙ্গ আছড়াইয়া পড়িতেছে তাহাদের বুকের কাছে। আজ কলেজে ধর্মঘট, কাল গুলির সামনে দাঁড়াইয়া ভাগ্যের মোকাবিলা করা, পরশু উনত্রিশে জুলাইর জন-প্লাবনে অনুভব করা জীবনের জোয়ার,—আবার হিন্দু-মুসলমানের রক্তারক্তি, দেশবিভাগ, মিথ্যার আস্ফালন : বিজয় লিখিতে গিয়া লিখিতে পারে না—কবিতাও যেন ইশ্‌তেহার হইয়া উঠিতেছে। এই বিরাট মন্থনের সত্যকে সে কি তবে উপলব্ধি করিতে পারে নাই ? না। বুঝি সে প্রত্যক্ষও করিতে পারে নাই। উহাকে আপনার করিয়া লইতে হইলে আপনাকে উহার মধ্যে মিলাইতে হইবে। বিজয় সেই আত্ম-নিবেদনের পথেই অগ্রসর হইতেছিল দৃঢ় মৌন আগ্রহে—কিন্তু জানিয়াছে কি সেই সত্যকে ? এখনো যে এই অভিজ্ঞতা ছাপাইয়া তাহার অন্তরের তলে জাগে সুন্দরের স্বপ্ন, আনন্দের আমন্ত্রণ, আর প্রেমেরও স্পর্শ।… প্রেম আসিয়া হানা দেয় প্রাণে, প্রেমের কবিতা লিখিতে চাহে মন।

বিজয় তাই হাসিয়া বলিল, কি দেখেছি, কি জেনেছি যে লিখব ? ইনিয়ে বিনিয়ে মধ্যবিত্তের প্রেমের কবিতা লিখব ? তা লেখা চলে আর ?

অমিত হাসিয়া বলিল, প্রেম কিন্তু বড়লোকেরও নয়, মধ্যবিত্তেরও নয়,—মানুষের। প্রেমের কবিতাও লেখা চল্‌বে সর্বকালেই। কারণ, প্রেম সর্বকালেই থাকবে। তবে প্রেমেরও রূপ বদলায়, প্রেমের কবিতার রূপও বদলাবে। এ কালে মানুষের প্রেম যে রূপ নিচ্ছে সেটা হয়ত কবি দেবেন্দ্রনাথেরও ধারণা ছিল না। রবীন্দ্রনাথের কাব্য দিয়েও তাকে সম্পূর্ণ বুঝ্‌তে পারি না। তবু তা প্রেম, হয়ত গতিমান্‌ মানুষের প্রেম।

বিজয় বলিল : তবু যুগটা মোটামুটি প্রেমের কবিতার নয়, তা ত ঠিক ?

অমিত তাহাও মানে না। হয়ত যুগটা একান্ত ভাবে ব্যক্তি-মানসের উদ্বোধনের যুগ নয় বলিয়াই বিজয়ের এইরূপ মনে হয়। কিন্তু কোনো বড় কবিতাইত আসলে

ব্যক্তির কথা নয়। সত্যকার কবিতা সামূহিক অনুভূতির প্রকাশ, যুগের সৃষ্টি-চেতনার উপলব্ধি কাব্যরূপের মধ্য দিয়া। এ যুগটা মানুষের কবিতার, তাই প্রেমের কবিতারও। এ যুগটা জীবনের নব-অভ্যুদয়ের, অর্থাৎ সৃষ্টির ; তাই সাহিত্য-সৃষ্টিরও। হয়ত আর একান্ত ভাবে তেমন লিরিক কবিতার যুগ নাই। আসিতেছে মহাকাব্যিক উপন্যাসের দিন। নিটোল-গল্পে-সমাপ্ত নবেলের দিনও আর থাকিবে না। দুই একজন নায়ক নায়িকার কথা লইয়াও উপন্যাস আর গ্রথিত হইয়া উঠিবে না। তাহা হইয়া উঠিতেছে সামগ্রিক জীবন-চিত্র, জগৎ প্রবাহের প্রতিকল্প—দুই জন বা দুইশ জনকে আশ্রয় করিয়া। তার রসটা মানব-রস। কিন্তু আসিতেছে সন্দেহ নাই—গাব্রিয়েল পেরির সেই singing to-morrows বিজয়ও কবিতা লিখিবে, সাহিত্য লিখিবে। তাই কবিতার প্রাণবস্তু ও সাহিত্যের প্রাণবস্তু তাহাকে খুঁজিতে হইবে, বুঝিতে হইবে বাস্তবকে। দেখিলেই শুধু হইবে না, বাস্তবের মর্মকোষে পৌছিতে হইবে। কিন্তু বাস্তবকে না দেখিলে তাহার মর্মকোষে পৌছিবার কথাও উঠে না। বাস্তবকে কতটুকু দেখিয়াছে বিজয়? শ্রেণী-সংগ্রামে কতটুকু সে প্রত্যক্ষ যোগদান করিতে পারিয়াছে? বিপ্লবী-শ্রেণীর আশা-আনন্দের সঙ্গে আপনাকে কতখানি মিলাইতে পারিয়াছে?—তাহা না পারিলে যে তাহার কথা হইবে শুধু কথা, ব্যক্তির কথা ; তাহা ত কবিতা হইবে না, এ যুগের সৃষ্টির স্বাক্ষর বহন করিবে না। "জীবনে-জীবন যোগ করা···না হইলে মিথ্যা হবে গানের পশরা···"

দুই জনায় কথা হইতেছিল। এদিকে কে বলিল : সকলকেই নাকি জেলে পাঠাচ্ছে, থানা হাজতে কাউকে পাঠাবে না। অমিত শুনিল, বলিল, বাঁচা গেল। থানার হাজতগুলি নরককুণ্ড—অসম্ভব নোংরা!

কিন্তু আমাদের জিনিসপত্র এল না যে?—মেয়েদের কে একজন বলিল। বোধ হয় মঞ্জু। একটা শাড়ী ব্লাউজও সঙ্গে আনি নি,—বলিয়া বিজয়ের কাছে আসিয়া বসিল মঞ্জু।

বিজয় সরিয়া বসিল, হাসিয়া বলিল, চাও ত আমার একখানি ধুতি দিতে পারি, আর একটা হাফ্‌শার্ট।

কাজলামো পেয়েছ ? মাসীকে দেখে সাহস বেড়ে গিয়েছে।—কলহে প্রবৃত্ত হইল মঞ্জু।

বে-ইমান !—শোনা গেল ওদিকে বুল্‌কনের গলা। হামলোগোঁসে ঠিকানা নিলে, লেকিন এক বহিন্‌কো, ভাইকো শাড়ী কাপড়া আনালে না। বেইমান্ ই লোগ্—মালিকক্কা কুত্তা ! আপ্‌লোগসে ভালো ভালো বাত্ বোলে, আপলোগ বোলেন—'ভদ্দরলোক'। বেইমান্ আউর দাগাবাজ, কুত্তা মালিকক্কা।

শ্রেণীশত্রু তাহারা বুলক্‌নের। বুলকন্ তাহাদের মুখের কথায় ভুলিবে না, তাহার কাছে ভদ্র আচরণ প্রত্যাশাও করিবে না। রাজাই প্রত্যাশা করে রাজার কাছে রাজার ন্যায় আচরণ-লাভ—পরাজিত পুরুও তাহা প্রত্যাশা করে বিজয়ী সিকান্দরের নিকট, আর পায়ও। ভদ্রলোক আমরা, আমরাও প্রত্যাশা করি ভদ্র-আচরণ গোয়েন্দা অফিসারের থেকে, দিইও চা, পাইও। কিন্তু মজদুর বুল্‌কন্ ! সে ভদ্রতা চাহে না, পায় না, গ্রহণও করে না।

কে কাছে আসিয়া বসিল—কখন বিজয় মঞ্জু তর্ক করিতে করিতে উঠিয়া গিয়াছে। অমিতের নিকট আসিয়া বসিয়াছে সুজাতা সেন—শ্যামলের আত্মীয় সুজাতা। বয়সে অবশ্য সে অনেক বড়, বিধবা নিঃসন্তানা বাঙালা দেশের মেয়ে।

অমিতই প্রথম কথা বলিল, কি হবে এবার আপনাদের নার্সদের ধর্মঘটের ?

মাসখানেক যাবৎ ছোট একটা ধর্মঘট চলিতেছে 'সেবিকা সংঘের' নার্সদের। সুজাতার উপর তাহা পরিচালনার দায়িত্ব। সুজাতা বলিল, কি হবে, তাই ত বুঝ্‌ছি না। অনেক দিন হয়ে গেল। আজ সাতাশ দিন—

আপনিও ত জেলে চল্‌লেন—নতুন যাচ্ছেন বুঝি ?

হাঁ, নতুন। কিন্তু সত্যই কি জেলে নেবে ? ক্ষতি ত আর কিছু নয়—ঠিক এ সময়টা আপনি বাইরে থাক্‌লেও হত, অমি'দা ?

আমি ? আমি কি করতাম, বলুন ? আমি ত বাতিল মানুষ। অম্লশূল, স্বাধীনতা, দেশ-বিভাগ আর রক্তারক্তির টাল সাম্‌লাতেই বেসামাল।

না, আপনি বাইরে থাকলে কাজ হত অন্তত আমাদের।

কেমনতর?—উৎসুক হইল অমিত।

দিন তিনেক হল ইন্দ্রাণীদি' এসেছেন কলকাতা। আমার সঙ্গে তিনি দেখাও করবেন না। কিন্তু বোধ হয় ইন্দ্রাণীদি' চান—আপনি একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। আপনি ধর্মঘটের একটা মীমাংসার কথা বললে নিশ্চয় তিনি তা রাখবেন। হয়ত তাই তিনি নিজেও চানও—

অমিত হাসিল, আপনার এরূপ বিশ্বাস এখনো? 'সেবিকা সংঘ' থেকে ওঁর এখন এত লাভ—মাসে দেড়-দু' হাজার টাকা নিশ্চয়ই মুনাফা তুলছেন।

তা তুলুন। কিন্তু আপনার কথা ইন্দ্রাণীদি' ফেলবেন না।

সুজাতা নীরব রহিল একটু। পরে বলিল, তাছাড়া, লোকে যাই বলুক—ইন্দ্রাণীদি'র টাকার প্রতি লোভ নেই। ক্ষমতা-প্রিয় তিনি,—ক্ষ্যাপা-মেজাজের, খামখেয়ালি; কিন্তু আমি অন্তত বলতে পারব না ইন্দ্রাণীদি' মন্দ মানুষ—লোকে যাই বলুক। ব্রজানন্দ পালিত একটা অন্যায় কাজও করাতে পারে নি ওঁকে দিয়ে। বরং অনেক মেয়েকে ইন্দ্রাণীদি' দুর্ভাগ্যের থেকে বাঁচিয়েছেন। ক্ষমতাপ্রিয় ইন্দ্রাণীদি', সকলেই ওঁর কর্ত্রীত্ব মেনে চলবে—এই হল ওঁর আসল কথা।—ব্রজানন্দই হোক্, আর যে-ই হোক। নইলে টাকার লোভী নন।—আর ভালোও বাস্‌তেন আমাদের;—অন্তত আমাকে। তাই আপনি একবার গেলেই এ ধর্মঘটের মীমাংসা হয়ে যায়। কাল পার্টি আপিসে এই জন্য আপনার জন্য আমি বসেছিলাম।

অদৃষ্টের লেখা—অমিত হাসিয়া বলিল। কাল সে আপিসে যাই-ই নি···

আরও পরিহাস অদৃষ্টের। এমনি সময়ে এমনি সন্ধ্যায় কাল অমিত ইন্দ্রাণীরই জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া ছিল ইন্দ্রাণীর গৃহেই। আর আজ এই সময়ে সেই ইন্দ্রাণী হয়ত হাওড়ায়, চলিয়াছে দিল্লী। হয়ত মানব আসিয়াছে তাহার মাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিতে।

দিলীপ দত্ত বলিত: মানব ছাত্র-আন্দোলনের মধ্য দিয়াই আসিয়াছিল সাম্যবাদের ও সাম্যবাদী দলের নিকটে। কিন্তু ইন্দ্রাণী অস্বীকার করিবে এই

কথা: মানব তাহার মাতৃ-জীবনেই পাইয়াছে সাম্যবাদের দীক্ষা; বরং কমিউনিষ্ট পার্টি তাহাকে বঞ্চিত করিয়াছে সেই সুমহৎ উত্তরাধিকার হইতে; বঞ্চিত করিয়াছে তাই ইন্দ্রাণীকেও তাঁহার জীবনের চরম সার্থকতা হইতে। মানব বিদ্রোহের শিক্ষা হারাইয়াছে—তাহাদের পার্টিরই কবলে পড়িয়া। আর না বলিলেও ইন্দ্রাণী জানে—সে পার্টির কবলে সে পড়িল অমিতেরই জন্য—ইন্দ্রাণীরই আগ্রহে। কিন্তু অপরাজেয়া ইন্দ্রাণী তাই বলিয়া পরাজয় মানিবে না কোনো পার্টির নিকট।

মহাযুদ্ধের সূচনা সেদিন। একদিনের জন্য অমিত পৃথিবীর সমস্ত পরিচয়-কেন্দ্র ত্যাগ করিয়া আশ্রয় করিয়াছিল ইন্দ্রাণীকে। পৃথিবীতে ইন্দ্রাণী ছাড়া এত সাহস কাহার আছে তাহাকে আশ্রয় দেয় এই সময়ে? আর, কাহাকে ইন্দ্রাণী আশ্রয় দিবে না—অমিতকে? ইন্দ্রাণী কোনো দলে বিশ্বাস করুক না করুক, বিশ্বাস করে বিপ্লবে। বিপ্লবের সেই জ্বলন্ত শিখাতেই কি সে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে নাই তাহার তপ্ত জীবনের রাত্রিদিন? স্বামী ছাড়িয়াছে, গৃহ ছাড়িয়াছে, আরাম ছাড়িয়াছে, আলস্য ছাড়িয়াছে। ইন্দ্রাণী লইয়াছে এই নার্সের জীবিকা, আপন জীবিকার্জনের স্বাধীনতা,—ইন্দ্রাণীর জীবনাদর্শে নারী-জীবনের আত্মবিকাশের প্রথম সোপান ইহাই। সেই সঙ্গে ইন্দ্রাণী লইয়াছে আপন সন্তানকে মানুষ করিবার সাধনা,—ইন্দ্রাণীর চিন্তায় নারী-জীবনের আত্মাধিকারের চরম পরীক্ষা তাহাতে। আর ইন্দ্রাণী তাই লয় নাই—লইতে পারে নাই—রাজনৈতিক আন্দোলনের কোনো কর্মভার; লয় নাই—লইতে পারে নাই—অমিতের সঙ্গে বিপ্লবের সহকর্মিনী হইবার দৈনন্দিন দায়িত্ব; লয় নাই—লইতে পারে নাই—পথে পথে অমিতের সহকারিণী হইবার স্বচ্ছন্দ অধিকার—একান্ত যে অধিকার ইন্দ্রাণীরই, আর কাহারও নয়,—জানে ইন্দ্রাণী। সে তাহাদের সহযাত্রিণী; সহকর্মিণী নয়, সহধর্মিণী। আপনার গৃহে সে আশ্রয় দিয়াছে তাই অমিতের সহযোগিনীদের, ভাবী কর্মিণীদের সাদরে গ্রহণ করিয়াছে, হাসপাতালে আয়োজন করিয়া

দিয়াছে তাহাদের নানারূপে জীবিকা-শিক্ষার সুযোগ, তারপর নিজ গৃহেই স্থাপন করিয়াছে আবার সেই নূতন শিক্ষিতা নার্সদের বাস-কেন্দ্র। এবং সেই সূত্রেই যুদ্ধমুখে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে তাহার 'সেবিকা-সংঘ' ও এই 'সংঘারাম'—'নার্সেস্ হোম্' ও 'নার্সিং হোম্।'

সেদিন মহাযুদ্ধের প্রথম রাত্রি। 'স্টেট্স্‌ম্যানের' বিশেষ সংখ্যার বৃহদাকার 'দি ওয়ার' শব্দ দুইটি হাঁকিয়া হাঁকিয়া তখন চৌরঙ্গীর ফেরিওয়ালারা শ্রান্ত হইয়া নিজেদের বস্তির ঘরে শুইয়া পড়িয়াছে। রাত্রি সাড়ে বারোটায় অমিত ইন্দ্রাণীর 'সংঘারামে' অর্থাৎ তাহার ফ্লাটের দুয়ারে আসিয়া মৃদু করাঘাত করিল। কেহ বুঝি দেখিয়া ফেলিবে তাহাকে একটু জোরে শব্দ করিলে। উত্তেজিত অমিত জানে —পৃথিবীর মহামুহূর্ত আসিতেছে। স্বগৃহে ফিরিলে হয়ত রাত্রিশেষে পুলিশেরই কবলে তাহাকে পড়িতে হইবে; আর বঞ্চিত হইতে হইবে জীবনের সুমহৎ পরীক্ষা হইতে। কাহার নিকট অমিত আজ চাহিতে পারে এইরাত্রে বিশ্রামের সুযোগ? আর কাহার নিকট আজ বিশ্রাম না গ্রহণ করিলে অমিতের জীবনের নিগূঢ় লগ্নটি অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে?

ইন্দ্রাণী কিন্তু বিস্মিত হইল না। সে যেন প্রতীক্ষা করিয়াই ছিল। মানুর চোখের নিদ্রাও তখনি প্রায় নিঃশেষ হইয়া গেল। আর ঘুমাইল না কেহ— অমিত নয়, ইন্দ্রাণী নয়, মানবও নয়। সারারাত্রি বসিয়া কিশোর মানব মায়ের আর 'অমিত কাকার' তর্ক শুনিল। ইন্দ্রাণী বোঝে না—কেন অমিতেরা কংগ্রেস নেতাদের পিছনে পিছনে চলিতেছে? উহারা ত বিপ্লবী নয়, বিপ্লবের শত্রু— মানুষের শত্রু। মানুষকে ইহারা মানুষের অধিকার দিতে চাহে না, শিখায় শুধু বশ্যতা। মন্ত্র পড়ে, টিকি নাড়ে, ধর্মের নাম করিয়া মানুষকে আরও অমানুষ করিয়া রাখিতে চাহে। ইহাদের সঙ্গে কোনো সম্মিলিত ফ্রণ্ট্ গঠন করিয়া সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস করা যায় তাহাও ইন্দ্রাণী মানিবে না।

সে বলে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অপেক্ষা এ দেশের মানুষের বড় শত্রু এই গান্ধীবাদ। কারণ, ইংরেজ শত্রুবেশেই এসেছে, গান্ধীজী এসেছেন মিত্রবেশে। ইংরেজ চেপে বসেছে ঘাড়ের উপরে, গান্ধীজী আসন বিছিয়েছেন মনের তলায়।

অমিত তর্ক করিয়াছে,—ভুল তর্কও করিয়াছে; কিন্তু বুঝিয়াছে—কর্মক্ষেত্র হইতে দূরে থাকিয়া ইন্দ্রাণী আপনার তেজ ও সাহসের তীব্রতায় আপনি অধীর হইয়া উঠিতেছে। মতাদর্শকে কার্যে রূপান্তরিত করিবার মত অবকাশ না থাকিলে মতাদর্শই শুধু কাঁচা থাকে না, মানুষটীও হয়ত কাঁচিয়া যায়—যদি সে মানুষ ইন্দ্রাণীর মত তেজস্বিনী ও মনস্বিনী না হয়।

কিন্তু মানু কী বুঝিল, বলিল, অমি'কা সত্য কথা বলেছেন।

ইন্দ্রাণী হাসিয়াছে। অমিতের বাহুস্পর্শ করিয়া সপরিহাসে বলিয়াছে, তবে আর কি, তোমারই জিত—তোমার দলে যখন আমার ছেলে। তবু, পরাজয় মান্‌বে না কিন্তু ইন্দ্রাণী, সে ত মানুর মা নয়।

অপরাজিতা ইন্দ্রাণী তারপর যখন পার্শ্বের ঘরে আপনার বাক্‌স-পেটরা টুকি-টাকির মধ্যে মেজেয় শুইয়া পড়িল তখন এঘরে তাহাদের শয্যায় পাশাপাশি ঘুমাইয়া পড়িয়াছে অমিত ও মানু; আর ওদিকে পূর্বের আকাশে মহাযুদ্ধের নূতন রক্তপ্রভাত ফুটিয়া উঠিতেছে।

সেই রাত্রি হইতে মানব ছিল অমিতের দূত। গোপন সঞ্চরণের দিন তখন সমাগত, অমিতের গুপ্ত আশ্রয় হইতে গোপন সংবাদ সে বহন করিত।

তারপর মহাযুদ্ধ মোড় ঘুরিল। ফাটল দেখা দিল অমিত-ইন্দ্রাণীর জীবনে। দুইজনে এবার যখন দেখা হইল তখন ভারতের বায়ুতে বায়ুতে কানাকানি: রেল্ লাইন উপড়াইয়া দিয়াছে, টেলিগ্রামের তার কাটিয়া ফেলিয়াছে, আগুন জ্বলিয়াছে। ইন্দ্রাণীর চক্ষেও তখন একই সঙ্গে আগুন আর আবেগ: নেতারা জেলে রুটি-মাখন ধ্বংস করুক, কিন্তু জনতা নিয়েছে বিপ্লবের ভার। তাকে আর কেউ এবার বাধা দেবার নেই—গান্ধীজী না, কংগ্রেস না। এসো, অমিত, এসো—অবিশ্বাস করো না অন্তত তুমি এই বিপ্লবকে এখন।

কিন্তু অমিত অটল: বিপ্লবের পথ সরল রেখায় নয়, ইন্দ্রাণী।

দৃপ্ত আত্মাভিমানে পরিণত হইল ইন্দ্রাণীর আবেগ: বিপ্লবের পথ ইন্দ্রাণীর অত্যন্ত-অপরিচিত নয়, অমিত।—একবারের মত তীব্র হইল তাহার কণ্ঠ, তারপর আবার তাহা আপনার সবল স্বাচ্ছন্দ্যে প্রকাশিত হইল। হাসি ফুটিল

মুখে, চোখে ফুটিল সচেতন ব্যক্তিত্বের জ্যোতিঃ। সেই সচেতন ব্যক্তিত্ব আপনাকে সচেতন ভাবেই বিজয়-অভিযানে নিয়োজিত করিল, ব্যক্তিত্বময়ী ইন্দ্রাণী যেন আপনার ব্যক্তিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করিতেছে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির বিরুদ্ধে। সভ্যতাকে যে পুরুষ-স্বভাব সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া আপনার পরুষ-হস্তে গঠিত করিয়াছে আর বিমর্দিত করিয়াছে চিরক্রন্দ্যমান নারী হৃদয়কে,—তাহার সমস্ত সুকুমার বৃত্তি, মায়া মমতা স্নেহপ্রেমকে সম্মান করিতে ভুলিয়া গিয়াছে,—ইন্দ্রাণী কঠিন জীবন-সংগ্রামের মধ্য দিয়া সেই পুরুষ-কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে জাগ্রত হইয়াছে—আপন সত্তায়। কিন্তু জাগিলেও শুধু আপন সত্তায় সে স্থির হইতে পারে কই? চির-প্রতিদ্বন্দ্বী সেই পুরুষকে টানিয়া আপনার কুক্ষিগত করিয়া না ফেলিতে পারিলে কোথায় ইন্দ্রাণীর নারীসত্তার স্বস্তি?—ভালোবাসায়ও ইন্দ্রাণী আত্মবিস্মৃতা নয়; ভালবাসিয়াও ইন্দ্রাণী তাই আত্মাভিমানিনী।

ইন্দ্রাণীর দেহের উল্লাসে, মুখের উল্লাসে চোখের দীপ্তিতে যেন এই কথাই ফুটিতেছে: তুমি, অমিত, তুমি,—ইন্দ্রাণীকে যে স্বীকার করিয়াছ,—অর্থাৎ ইন্দ্রাণীই যাহার কাছ হইতে আপন শক্তিতে আদায় করিয়াছে নিজের স্বীকৃতি—সেই তুমি, এই তেজোময়ী দীপ্তিময়ী নারীসত্তার সঙ্গে আপন সত্তাকে মিলাইয়া দিয়া কি সার্থক না হইয়া পারিবে আজ?—আজ, বিয়াল্লিশের বিদ্রোহাগ্নির সম্মুখে, যখন ইন্দ্রাণী আপনার বাঁধা-ঘর ও বাঁধা-সংসার পর্যন্ত বিপন্ন করিয়া তোমাকে ডাক দিতেছে সেই মহোৎসবে? নিবে না তাহার সঙ্গে তুমি সেই অগ্নিদীক্ষা, পারিবে এই অগ্নিময়ী নারীসত্তার সম্মুখে অবনত না হইয়া?

ইন্দ্রাণীর চোখের এই দৃষ্টি কি অমিতের অচেনা? না, না। এই তেজ, এই অগ্নিশুদ্ধ দীপ্তি, চিরদিনের পরিচিত অমিতের,—স্বাগত। এই অপরাজেয় নারীসত্তাকে স্বাগত করিয়াও সে গর্বিত। তবু অমিতের অগ্রাহ্য এই দৃষ্টি—এই মুহূর্তে; অগ্রাহ্য এই মুহূর্তে সেই আত্মসচেতনার আবেগময় আহ্বান; অগ্রাহ্য এখন ইন্দ্রাণীর পুরুষ-স্বভাব-প্রতিদ্বন্দ্বী অহঙ্কারোদ্ধত সত্তার এই সমুদ্রোচ্ছ্বাস—অমিতের চির উদ্‌গ্রীব-সত্তার তটে।

নিয়তির মতই অনিবার্য নিয়মে বহিয়া গেল সে রাত্রির মিনিট, প্রহর।

অহঙ্কার কখন অভিমানে পরিণত হইল, তারপর পরিণত হইল অনুনয়ে : অমিত, অমিত, তুমি তোমার দেশকে ভালোবাসো, ভালোবাসো তার স্বাধীনতা। আজ যখন তোমার দেশের জনতা বিপ্লবের মুখে তখন তুমি রহিবে কোন্ 'মস্কোর' চিন্তায় মগ্ন ?

এ যেন অমিতের মনের একাংশেরও দাবী। কিন্তু ব্যর্থ সেই নিবেদন।

জটিল এ জীবন, ইন্দ্রাণী। জটিল কর্তব্য-সংকটে তবু পথ হারাইবে না তোমাদের অমিত। দেখিয়াছে সে স্বদেশাত্মাকে, দেখিয়াছে সে বিশ্বাত্মাকেও। আর সে জানিয়াছে—মানুষের ইতিহাসের বক্র-তির্যক পথে আজিকার মত করতালি পাইবে না অমিতেরা। ইহাই তাহাদের বৈপ্লবিক বিধিলিপি এই মুহূর্তে, 'কলোনির' জীবনের এই বিয়াল্লিশের বিদ্রোহ-বিভ্রমে।

অমিত বুঝাইতে চাহিল : এ দেশের জনতারও পথ, ইন্দ্রাণী, উদ্ঘাটিত হচ্ছে জনযুদ্ধের পথে।

জ্বলিয়া উঠিল অনুনয় এবার বিদ্যুৎ-বজ্রে।—তুমি ষ্ট্যালিনিষ্ট, অমিত? মস্কোর ক্রীতদাস।

আমি স্তালিন-পন্থী—একবার নয়, শতবার,—যতক্ষণ স্তালিন ইতিহাসের মুখপাত্র—আর আমি ইতিহাসের ছাত্র।

ইন্দ্রাণীর ঠোঁট কাঁপিতেছিল, কথা ফুটিল না। কিন্তু কি যেন একটা বুকের মধ্যে ছিঁড়িয়া যাইতেছে। সে চোখ বুজিয়া রহিল, নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া রহিল। তারপর অনেকক্ষণ পরে চোখ খুলিয়া হাসিল—যেন কিছুই ঘটে নাই। বলিল, অমিত, ইন্দ্রাণী চিরদিনই ইন্দ্রাণী—বিদ্রোহিণী। হোক্ এই বিদ্রোহ নির্বোধ স্বদেশীয়ানার, যেই পথে বিদ্রোহ সেই পথে আমি। মনে রেখো এ কথা যদি মনে পড়বার মত হয় তা কোনোদিন।

একটা ছেদ পড়িয়া গেল ভাবে, কর্মে;—আর জীবনেও নহে কি ?

অমিতের পরিচালনা হইতে চ্যুত হইয়া বালক মানব সেদিন ছাত্র-বন্ধুদের আশ্রয়-সন্ধানে অগ্রসর হইতে চাহিল। অগ্রসর হইল তাই তখন সে দিলীপদের দিকে;—ইন্দ্রাণীর তাহা অগোচর।

উপায় ছিল না—বিদ্রোহিনী ইন্দ্রাণী স্বগৃহে স্বাগত করিতেছে তখন আগষ্টের যত গোপন বিদ্রোহীদের। কেহবা তাহারা কংগ্রেসম্যান, কেহবা সোশ্যালিষ্ট। সুজাতা তখন তাহার 'সেবিকা সংঘে' সদ্য পাঠোত্তীর্ণা সহকর্মিনী। অমিতদেরই পরিচয়ে ইন্দ্রাণী তাহাকে আশ্রয় দিয়াছে, আর তারপর দিয়াছে তাহাকে আপনার সহযোগিনীর দায়িত্ব। আর মিনাও থাকে দিদির সঙ্গে—দিদির ঘরেই 'সংঘারামে'। কিন্তু মিনা তখনি ছিল দিলীপদের ছাত্রী-সংঘের মেয়ে—জনযুদ্ধ-বাদিনী ছাত্রী।

অলীক আশা ইন্দ্রাণীও বেশিক্ষণ পোষণ করে নাই আগষ্ট বিদ্রোহীদের নিকটে। কিন্তু বিদ্রোহের যে এত অলীক রূপ তাহাকে দেখিতে হইবে তাহাও সে জানিত না। কঠিন দায়িত্ব তাহাকে লইতে হইয়াছে গোপনে গোপনে। নানা গুপ্ত কর্মীচক্রের সে হইয়াছে গোপন আশ্রয়। তাই আত্ম-গোপন করিতে হইয়াছে ইন্দ্রাণীকে কথায়-আচরণে,—আর আত্ম-গোপন তাহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। কিন্তু দায়িত্ব তাহাকে পালন করিতেই হইবে;—সাহস, শক্তি, চতুরতা দিয়া ইন্দ্রাণী ঘিরিয়া রাখিয়াছে আশ্রয়কামী গোপন কর্মীদের। পুলিশের অত্যাচার সহিতেই ছিল তার স্পর্ধা, কিন্তু দৃপ্ত মস্তকে তাহা সহিতে গেলে আর এই 'সংঘারামের' গোপন-আশ্রয় কেন্দ্রটি অক্ষুণ্ণ থাকিত না। তখন কোথায় যাইত তাহাদের ট্রান্‌সমিটার, কোথায় যাইত তাহাদের গোপন মুদ্রণশালা, গোপনে মুদ্রিত ইশ্‌তেহারের পাহাড়?—পুলিশের চোখে ধূলি দিবার জন্যই ইন্দ্রাণী তাই প্রথম দিকে যোগাইয়াছে—ডেষ্টিটিউট্ হোমের হাসপাতালে সেবিকা, আর গ্রহণ করিয়াছে ডেষ্টিটিউট্ হোমের হতভাগিনীদের অপ্রার্থিত মাতৃত্বের দায়। আকণ্ঠ ছাপাইয়া উঠিয়াছে তাহার ক্রোধ আর বিদ্রোহ নানা হোম-পরিচালক সমাজনেতাদের ঘৃণিত বৃত্তিতে। ব্রজানন্দ পালিত তখন ডেষ্টিটিউট্ হোমের ডিরেকটার, চারটা 'ফ্রি কিচেনের মালিক'। ক্ষমতা ও মুনাফা তাহার চার-চারটা বড় ব্যবসায়ের ডিরেকটারের অপেক্ষা কম নয়। কারণ, সে কংগ্রেসম্যান; সে বিপ্লবী, স্বদেশীর প্রচারক; সে কর্পোরেশনের বে-সরকারী মুরুব্বি—এবং আগষ্ট বিপ্লবের গোপন অর্থ-সংগ্রাহক।

জেল হইতে ভুজঙ্গ সেন জানাইয়াছেন ইন্দ্রাণীকে ব্রজানন্দের এই মন্বন্তরী ব্যবসাদারীটা বিদ্রোহেরই আবরণ হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে। ইন্দ্রাণী তাহা অস্বীকার করিয়াছে। কিন্তু রহিয়াছে নীরব। নির্মম নিয়তি ইহাও এই পর্বের বিদ্রোহের,—তেতাল্লিশ আর পঁয়তাল্লিশের। সহিতে না পারিলেও এ ছলনা, সেদিন বিদ্রোহ না করিয়া নীরব রহিয়াছে ইন্দ্রাণী —দর্পিতা, খড়্গের মত উদ্যতা ইন্দ্রাণী। না, ব্রজানন্দের মেয়ে-ব্যবসার তুলনায় তেমন কিছুই নয়—বিশু চাটুজ্জের প্রণয়-প্রলাপ ইন্দ্রাণীর নিকটে, আর রাওজীভাইর অজস্র প্রণয়-পত্র ইন্দ্রাণীর উদ্দেশ্যে। ইন্দ্রাণী তাহাতে আর কত জ্বলিবে ঘৃণায়? নারীর একটা রূপই বুঝি উহারা চিনিয়াছে। মিথ্যা নয় সে রূপ নারীর; একদিন শতবার স্বীকার করিত তাহা ইন্দ্রাণী। স্বীকার করিত নিজেরও এই বিশিষ্ট রূপ—সে পুরুষ-হৃদয় বিজয়িনী। স্বীকার করিত বলিয়াই শতবার সে দেখিয়াছে আরশীতে নিজের মুখ, নিজের চোখ, নিজের চিবুক, বাহু, কর। নাকের পার্শ্বেকার ক্রম-গভীর রেখাটিকে পর্যন্ত চাহিয়াছে মসৃণ সযত্ন হস্তাবলেপে মুছিয়া ফেলিতে;—চাহিয়াছে বুঝিতে, এখনো সে পুরুষ-হৃদয়-রঞ্জিনী। কিন্তু তবু ইন্দ্রাণী জানে আরও বড় তাহার সত্য—সে শুধু নারী নয়, সে মানুষ। সে শুধু নারী-মাংসের একটি মোহন মধুর স্তূপ নয়,—সে এক মানব-সত্তা,—সে এক সন্তানেরও মাতা। আর শুধু তাহাও নয়,—স্বতন্ত্র এক সত্তা সে, সে ইন্দ্রাণী।

তাহার পৃথিবীর চরম সত্য ত ইহাই—সে ইন্দ্রাণী, সে আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ। পুরুষের সহকারিকা সে নয়, সহকার-আশ্রিতা লতা নয় সে, সে স্বয়ং সম্পূর্ণা। ইহারা কি মানুষ—এই বিশু চাটুজ্জে আর রাওজীভাই—যে ইহাদের দিকে ফিরিয়া তাকাইবে ইন্দ্রাণী? আর এই নিরন্ন নারীর দেহ-ব্যবসায়ী ব্রজানন্দ—সেও মানুষ?

সমস্ত পুরুষ জাতিরই উপর এইবার ঘৃণা ধরিয়া গেল ইন্দ্রাণীর। ইন্দ্রাণীর মন আকণ্ঠ ভরিয়া উঠিল সেই ঘৃণায়। অথচ এই ব্রজানন্দ-রাওজীভাই প্রভৃতিদের সহায়তায় ইন্দ্রাণী তখন যুদ্ধের দিনে দেশীয় ধনিক-গোষ্ঠীর রোগ-সেবার ভার

লইতেছে তাহার 'সংঘারামে।' বিস্তৃত হইয়া উঠিতেছে অন্য দিকে তাহার 'সেবিকা-সংঘ' কলিকাতায়। ফ্লাট ছাড়িয়া সমস্ত বাড়িটা ইন্দ্রাণী আয়ত্ত করিল, তাহার শাখা বিস্তার করিল মধ্য কলিকাতায়; আর সুজাতাকে দিল উহার ভার। দেশে নার্স নাই,—ফিরিঙ্গী নার্স'রা যুদ্ধে গিয়াছে,—সংঘারামই দেশের ধনিকদের ভরসা—পীড়িত ও স্বচ্ছল এই ব্যবসায়ী শ্রেণীর। অন্যদিকে সেই পুরুষ-কবলিত গলিত সভ্যতার দিকে তাকাইয়া-তাকাইয়া ইন্দ্রাণী আরও বুঝিল—'মানুষ জন্মিয়াছিল মুক্ত স্বাধীন, মানুষ সর্বত্র আজ শৃংখলিত।' সর্বত্র, সর্বত্র, সর্বত্র। কি এ দেশে কি বিদেশে, কি আমেরিকায় কি সোভিয়েট দেশে,—সর্বত্র শৃংখলিত মানুষ। এবং কোনো শৃংখল মানে না ইন্দ্রাণী—সমাজের না, রাষ্ট্রের না, প্রেমেরও না।

না, কাহাকেও শৃংখল পরাইতেও চাহে না ইন্দ্রাণী।

যুদ্ধ শেষ হইল। বি-এস্-সি ক্লাসের দুয়ার হইতে মানব বলিল, সে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়িবে, বোর্ডিং-এ থাকিবে। ইন্দ্রাণী বিমূঢ় হতবাক্ হইল। কিন্তু বাধা দিল না—বাধা সে দিবে কেন তাহার পুত্রকে? স্বাধীন সত্তায় স্বতন্ত্র হইতে চাহে বুঝি মানব? স্বতন্ত্র হইবে সে, এবার আপন জীবন রচনা করিবে। কিন্তু ইন্দ্রাণীর কি স্থান নাই সেই জীবনে? আর ইন্দ্রাণীর জীবন হইতে কি এইবার বিদায় লইবে তাহার মানু? এই কি ইন্দ্রাণীর মাতৃ-তপস্যার সার্থকতা?—এত শূন্যময় কি সেই সার্থকতা, এত নিশ্চল অন্তহীন একটা গহ্বরের মত, এমন ছেদহীন একটা অন্ধকারের মত? শূন্যগৃহ যেন ইন্দ্রাণীরও হৃদয়ের শূন্যতাকে এই ভাবে অতলস্পর্শী ও অন্তহীন করিয়া তুলিবে।

ইন্দ্রাণী তাই আপাতত দিল্লী চলিল। পাঞ্জাবী শরণার্থীদের সেবার ভার গ্রহণ করিতে তখন ডাকিয়াছে তাহাকে যুদ্ধকালীন কংগ্রেসী বন্ধুরা। সেখানে বসিয়া সে জানিল মিনাকে কেন্দ্র করিতেছে মানুর জীবন—যে মিনা সুজাতার বোন, অতি সামান্য একটা আঠার উনিশ বৎসরের মেয়ে—রূপে সামান্য, বিদ্যায় সামান্য, ব্যক্তিত্বে সামান্য। অথচ স্পর্ধা তাহার সে ইন্দ্রাণীর বিরুদ্ধেও দাঁড়াইতে চাহে। সেই মেয়ে মোহগ্রস্ত করিল মানুকে—অসামান্যা ইন্দ্রাণীর অসামান্য পুত্র যে!

ইন্দ্রাণী শুনিল অনেক কথা। কিন্তু জানিল না তাহার মাসু আপনাকে কিরূপে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিয়াছে। কিছুতেই মাসু মানিতে পারে নাই তাঁহার মাতা কোনো নারীরই নারীত্বের অপমান সহিতে পারে। কিছুতেই ভুলিতেও পারে নাই তবু 'ছাত্রী-সংঘের' সমস্ত মেয়েদের কানাকানি—স্বাধীন, অবাধগতি ইন্দ্রাণী, ভাটিয়া মারোয়াড়ীদের নার্স জোগাইবার ব্যবসায়ে ধনিক-লালসা, ও ব্রজানন্দের ডেষ্টিটিউট্ হোমে হতভাগিনীদের আশ্রয় দিবার নামে ডেষ্টিটিউট্ হোমের ব্যভিচারকে প্রশ্রয় দিয়াই আপনার সেবিকা সংঘকে প্রসারিত করিয়াছে।

কোথা দিয়া কি ঘটিতেছে অমিতও জানে নাই। তাহাদের মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িয়াছিল কলিকাতার ভ্রাতৃমেধে, তারপর দেশ-বিভাগে। শুধু মন্ত্র পাঠের মত বলিয়া লাভ কি সবই সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত?—এ যে বহু বহু শতাব্দীর প্রতিশোধ—'এ আমার এ তোমার পাপ'। ইন্দ্রাণী গিয়াছে দিল্লীতে—উচ্চকোটির কর্তৃমহলে তাহার পরিচয় কম নয়। শরণার্থী সেবায় সে যখন ভার লইল অমিত তখন বরং খুশীই হইয়াছে। সত্যই অমিত সংবাদ পায় নাই দিল্লীতে কোন্ মার্কিনী বৃত্তিও ইন্দ্রাণী সংগ্রহ করিয়া ফেলিয়াছে তাহার "কংগ্রেসী-বিদ্রোহীদের" সহায়তায় মানবের জন্য। মানব তাহা বর্জন করিয়াছে বিনা প্রশ্নে। অজস্র মিথ্যায় অতিরঞ্জিত হইয়া ইন্দ্রাণীর কলঙ্ক অবশেষে ইন্দ্রাণীর 'সেবিকা-সংঘের' মধ্যে ধর্মঘটের আকারে দেখা দিয়াছে। সেই ধর্মঘটের নেতৃত্ব লইয়াছে সুজাতারা। আর সেই ভূমিকম্পে ভাঙিয়া চূর্ণ চূর্ণ হইতে বসিয়াছে এখন ইন্দ্রাণীর 'সংঘারাম'। অনেকদিন পরে হঠাৎ আবার সেই সুপরিচিত অক্ষরের নীল একখানা খাম আসিয়া পড়িল অমিতের হাতে। তাহার ক্ষুদ্র অবয়বে সেই পুরাতন ইন্দ্রাণীর স্বাক্ষর: 'অমিত, ইন্দ্রাণীকে মনে পড়ে?—সে কিন্তু তোমাকে মনে করে বসে থাক্‌বে এই দোল পূর্ণিমার সন্ধ্যাটিতে···আসবে?'

হোলির আকাশে কাল লাল থালার মত চাঁদ উঠিতেছে তখন,—ফিরিয়া আসিল ইন্দ্রাণী মিসেস সেনরায়ের বাড়ি হইতে।

দেরী করিয়ে দিলেন মিসেস সেনরায়। যেন শুরই কেবল সময় নেই আর সময় আছে আমাদের সকলেরই।—ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে বলিল ইন্দ্রাণী।

তোমার সময়ের অভাব নাকি ইন্দ্রাণী? তা হলে কি উঠ্‌ব?—পরিহাস করিল অমিত পুরাতন স্বরে।

সময়ের অভাব নিশ্চয়ই; কিন্তু সকলের সম্পর্কে নয়। অন্তত অভাব নেই অমিতের সম্পর্কে ইন্দ্রাণীর সময়ের।

অনেক কাল পরে অনেকদিন আগেকার মত সেই পরিহাস। তেমনি কণ্ঠ, তেমনি দৃষ্টি; আয়ত চক্ষে তেমনি ঔজ্জ্বল্য আর মদির-মাধুর্য। কিন্তু কেমন যেন অমিতের সংশয় হইল—বুঝি সবই ইহা বিশেষ উদ্দেশ্যে পূর্ব-পরিকল্পিত—এই কণ্ঠস্বর, এই চাহনি, এই নুইয়া-পড়া হাতের শ্লথ সুন্দর স্পর্শটি স্কন্ধে। কিন্তু চিরদিনই কি ছিল ইহা এমনি পূর্ব-পরিকল্পিত? না, আজই বহু-বহু অভ্যস্ত প্রয়োগের শেষে ইহা হইয়াছে এমন প্রাণ-লেশহীন আপ্যায়নের একটা মামুলী ভূমিকা?

অমিত স্মিত হাস্যে বলিল, অমিতের সময়ের মেয়াদ কিন্তু ফুরিয়ে এসেছে। তাকে যেতে হবে এবার পার্টির চাকরিতে।

সত্য কথাই। কিন্তু সেই সত্য অমিত আজ রক্ষা করিবে না, ইহাও সত্য। তথাপি ইহাই সে বলিল। আর ইন্দ্রাণীরও তাহাতে আঘাত লাগিল। একবার তাকাইয়া থাকিয়া সে বলিল, খেয়ে যাবে না, অমিত? আমি যে তোমাকে খাওয়াতে-খাওয়াতে গল্প করব আজ।

নিঃসংশয় নয় অমিত। তথাপি সাধ্য হইল না বলিবে, 'না'। বরং বলিল, তবে বহুদিনের মত তোমার হাতের রান্নাই আবার হোক্ অমিতের কাজের তাড়নার উপর জয়ী।

ইন্দ্রাণী হাসিল; কিন্তু কথাটা বিশ্বাস করিল না। পরিহাস ত নয়; অমিত উপহাস করিতেছে কি ইন্দ্রাণীকে?

একটু পরেই কথাটা উঠিল: মিনা সেনকে চেনো তুমি, অমিত?

না।—সত্যই অমিত চিনিত না।

সুজাতা সেনের বোন্—তোমাদের সুজাতা সেন। যাকে আমি মানুষ করেছিলাম তোমার কথায়। আর যাকে আমি করেছিলাম—আমার দক্ষিণ হস্ত।

অমিতও তৎক্ষণাৎ সরাসরি বলিল, আর আজ যে এখন নার্সদের ধর্মঘটে নেতৃত্ব নিয়ে তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে।

দাঁড়াক!—সংক্ষেপে তীব্র কণ্ঠে বলিল ইন্দ্রাণী।—শক্তি থাকে দাঁড়াক। শক্তি ছিল বলে আমি গড়েছি আপন রক্ত দিয়ে এই 'সেবিকা-সংঘ';—সে কাহিনী তুমি জানো, অমিত। ইন্দ্রাণী প্যারাসাইট্ নয়, আপন শক্তিতে আপন ভাগ্যকে সে জয় করেছে; আপন হাতে গড়েছে সে এই সেবিকা-সংঘ। ভাঙুক তা যদি পারে ওরা ধর্মঘট করে—যাদের নিজ হস্তে আমি দিয়েছি বাসস্থান, অন্নজল এই গৃহে।—কিন্তু এই চোরাগোপ্তা আঘাত কেন? এই গুপ্ত হত্যা?

অমিত বুঝিল না। বলিল, গুপ্ত হত্যা?

ইন্দ্রাণী বলিল: মিনা সেনকে চেনো? চেনো না? তোমাদেরই পার্টির মেয়ে সেও। এইখানে—এই ছাদের তলায় বসে তাকে দিয়ে ফাঁদ পেতেছিল মানুর জন্ম তোমাদের সুজাতা সেন।

অমিত এবার কথাটা বুঝিল, বলিল, বেশ। তারপর?

তাদেরই পরামর্শে মানু চলে গেল বোর্ডিং-এ। মানুর মা তাতে আপত্তি করে নি। মানু চায় মিনাকে—তাতেও বাধা দিত না মানুর মা। ব্যক্তিগত মতামতকে শ্রদ্ধা করতে জানি আমি; আর পারব না শ্রদ্ধা করতে মানুর ব্যক্তিত্বকে? কিন্তু সে চাপটা এমন স্থূল হাতে দিতে গেল কেন সুজাতা সেন? একটা ধর্মঘট বাধিয়ে দিলেই ইন্দ্রাণী চৌধুরী জব্দ হবে—আর মিনা ও মানুর বিবাহ বন্ধনে দেবে সম্মতি; এমনি মানুষ নাকি ইন্দ্রাণী?

অমিত বলিল, কিন্তু সম্মতির জন্ম এরূপ চাপের প্রয়োজন ছিল কি? তুমি ত সম্মতই ছিলে ওদের বিবাহে।

বিবাহে? ওদের বিবাহে আমি সম্মত হবার প্রশ্নই ওঠে না। যার খুশী বিবাহ করুক যাকে। আমি কোনো কালে তাতে বাধা দোব না। কিন্তু আমি কোনো

কালে সম্মতি দোব না কারও কোনো বিবাহ অনুষ্ঠানে। আমি অবিশ্বাস করি সমস্ত বন্ধনে—অবিশ্বাস করি বিশেষ করে তোমাদের "পবিত্র বিবাহ-বন্ধনে।"

সুর'র সেই অভিজ্ঞতা! কিন্তু ইন্দ্রাণী সুর নয়—সে বিক্ষুব্ধা, বিদ্রোহিণী। বিক্ষোভে বিদ্রোহে সে এবার বুঝি বিভ্রান্তাও।

অমিত হাসিয়া উঠিল।

ইন্দ্রাণী ক্ষুব্ধ হইল।—হাসলে যে, অমিত? এ কথা কি জানতে না তুমি?

জানতাম। কিন্তু তবু শুন্‌লে হাসি পায় না কি?

তা পেতে পারে তোমার। ঘটকালিই যখন তোমাদের দলের প্রোগ্রাম।

অমিত আবার হাসিল।—সেই ভরসাতেই ত এ দলটা আঁকড়ে আছি। কিন্তু অভাগা যেদিকে চায় সাগর শুখায়ে যায়।···জানোই ত অমিতের নিয়তি।

নিয়তি!—দশ বৎসরের পার হইতে অবিস্মরণীয় একটা কথা আবার ইন্দ্রাণীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। এই কলিকাতা শহরের এমনি এক সন্ধ্যায় ফুটপাতের উপরে পথ-প্রদীপের আলোতে সেদিন ইন্দ্রাণী অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছিল; আর অনেক অনেক অবিস্মৃত বৎসরের সমস্ত স্মৃতি মন্থন করিয়া অপ্রত্যাশিত একটি কণ্ঠস্বর বাজিয়া উঠিয়াছিল সদ্য-কারামুক্ত অমিতের কর্ণে—'অমিত'!' তারপর মূর্তি ধরিয়া ওঠে সেই জন্ম-জন্মান্তরের পারের ডাকের মত ওই ডাক একটি মানবীতে—'ইন্দ্রাণী!'—অমিত জানিল সেই মুহূর্তে তাহার নিয়তি।—আজ দশ বৎসর পরে সেই কথা অমিতের মুখে! কিন্তু মুখে সেই চিন্তা-সংহত আবেগ-আগ্রহ কোথায়? অমিতের মুখে যে আজ একটা পরিহাস-তরল হাস্য!

অমিত হাসিয়া বলিল, নিয়তি বই কি—নিয়তির অভিশাপ!

অভিশাপ, অমিত?—ক্ষোভে বেদনায় মথিত হইল এবার ইন্দ্রাণীর বুক। জলিয়া উঠিল আবার তাহার চোখ।—তোমার জীবনে ইন্দ্রাণী অভিশাপ বহন করে এনেছে!

অমিত বলিল, ইন্দ্রাণী নয়;—নিয়তি। ইন্দ্রাণী যা এনেছে, ইন্দ্রাণী তা জানে। কিন্তু ইন্দ্রাণী যা গ্রহণ করতে পারে নি, তা জানে না ইন্দ্রাণী।

কি গ্রহণ করতে পারে নি, ইন্দ্রাণী ?

গ্রহণ করতে পারে নি সে মানুষকে। দান করতে পারে নি সে নিজেকে আপন সত্তার বাইরে। আর তাই গ্রহণ করতে পারে নি সে অমিতকেও আপন সত্তার মধ্যে।

ইন্দ্রাণী স্তব্ধ, বিমূঢ়; তাকাইয়া রহিল সে অমিতের চোখের দিকে। অনেকক্ষণ,—অনেকক্ষণ। তারপর স্থির, গর্বিত কণ্ঠে বলিল,—এবং হাসিল,—

শোনো, অমিত,—ইন্দ্রাণী দানের বস্তু নয়। সে আপনার সত্তায় আপনি সম্পূর্ণ। আর মানুষকেও সে চায় আপনার নিজ নিজ সত্তায় তেমনি সম্পূর্ণ দেখ্‌তে—নইলে মানুষ মানুষই নয়।

অমিত বলিল, মানুষ নিজ-নিজ সত্তায় অসম্পূর্ণই, ইন্দ্রাণী। মানুষের সম্পূর্ণতা মানুষের সম্পর্কে আত্মদানে আর সমগ্রকে গ্রহণে। 'তন্নষ্টং যন্ন দীয়তে।' Only in collective living do we reach plenitude.

ইন্দ্রাণী হাসিল, বলিল, জানি, অমিত, জানি তোমার মতবাদ। ওইত তোমাদের মন্ত্র। কিন্তু এই মন্ত্রে ইন্দ্রাণী ভুল্‌বে না। এ মন্ত্রেই তোমরা মানুষকে কামান-বন্দুক করেছ—গড়েছ তোমাদের টোটেলিটেরিয়ানিজম্‌।

অমিত এবার বিদ্রূপের সহিত হাসিল: মন্ত্র না হোক্‌, মার্কিনী বুলিটা আজ তোমার মুখেও ফুটেছে। চাই কি, পেতেও পার তোমার 'সেবিকা-সংঘের' জন্য একটা মার্কিনী 'এড্‌'—ধর্মঘটের বিরুদ্ধে অভিযানে সহায়তার বরাদ্দ ইণ্ডিয়ান মার্শাল প্ল্যানেও থাকবে, নিশ্চয়। কথাটার খোঁচাও স্পষ্ট।

ইন্দ্রাণী জ্বলিয়া উঠিল, ধর্মঘট!—কেন, অমিত, এই ধর্মঘট? সুজাতার ব্যক্তিগত আক্রোশ বলে ত—

না হয় মান্‌লাম তা'ই। যদিও জানি—মিনা আর মানবের প্রেম-পরিণয়ের সঙ্গে এর সম্পর্ক সম্পূর্ণ তোমার উষ্ণ মস্তিষ্কের কল্পনা,—হয়ত বা ওদের প্রেমটাও তোমার কল্পনা। না, থাক্‌, প্রমাণ তুমি না দিলে; আমি তা মেনে নিচ্ছি তোমার খাতিরে আপাতত। কিন্তু সুজাতা সেনের ব্যক্তিগত স্বার্থে এতগুলি 'সেবিকা সংঘের' মেয়ে ধর্মঘট করেছে কেন? তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থটা তাতে কি?

কাজ করতে চায় না বলে, কাজ না শিখলে আমি কাউকে ক্ষমা করি না বলে, বিনা কাজে দক্ষিণা চায় বলে।

সত্য, ইন্দ্রাণী ? তুমি তাদের প্রত্যেকের কাজের বাবদে রোগীদের থেকে আদায় করো দিনে ষোল টাকা, আর রাত্রিতে বিশ টাকা। আর তারা পায় কি প্রত্যেকে ?—দিনের কাজে ছ' টাকা, রাত্রের কাজে আট টাকা—

মিথ্যা কথা। তারা পায় আমার এখানে বাসস্থান, পায় এদিনেও পুষ্টিকর আহার্য, পায় কার্যকালেও আমার ব্যবস্থা-করা চা, টি-ফিন্। সব চেয়ে বড় কথা, পায় সপ্তাহে সপ্তাহে স্থির কাজ ;—জানে না বেকারের দুর্দশা কাকে বলে।

আর তুমি পাও কি—এ কাজ করে ? কিংবা দিল্লীতে বসে কাজ না করে ?

আমার শ্রম-মূল্য,—যেমন ওরা পায় ওদের শ্রম-মূল্য। আমার শ্রম-মূল্য—যে শ্রমের বলে আমি একাকী গড়েছি এই প্রতিষ্ঠান, বোঝো কি, তার অর্থ কি ? তার অর্থ—ইন্দ্রাণীর সমস্ত জীবন-যৌবন, তেজ, শক্তি, দীপ্তি।—তার মূল্য কত জানো, অমিত ?

অমূল্য—আমার কাছে। কিন্তু পৃথিবীতে তুমি আদায় করো কি মূল্য ?—অন্যদের দাও দিনে দশ ঘণ্টায় দশ টাকা, আর রাত্রি-জাগা দশ ঘণ্টায় আট টাকা।—ইন্দ্রাণীর শক্তি, দীপ্তি, তেজ—এ সবের মূল্য হল গুটি পঞ্চাশ মেয়ের সপরিবারে অনাহার ;—তাদের পুত্র আর ভ্রাতাদের তেজোহীনতা, দীপ্তিহীনতা, শক্তিহীনতা।

ইন্দ্রাণী এই যুক্তিতর্কের জন্য সম্ভবত প্রস্তুত ছিল। তাই সে পরাজয় মানিল না। বলিল, শোনো, অমিত, এ বাঁধিবুলি না আউড়ে খোঁজ নাও ওরা সত্যই কতটা কাজ করে, কতটা কাজ শিখেছে, আর কতটা শিখেছে কুড়েমি, কাজ ফাঁকি দিতে। শিখেছে কি শ্রমের মর্যাদা, না শিখেছে তোমাদের বাঁধিবুলি ?

অমিত হাসিল। বলিল, ইন্দ্রাণী, এও ত বাঁধিবুলি—তবে শোষিতের নয়, শোষণের বাঁধিবুলি।

ইন্দ্রাণী ইহা মানিবে না। অমিত যেন তাহাও জানিত, তবু ভাবিল—ইন্দ্রাণী কি বুঝিবে না এই সরল সত্য ? সে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

ইন্দ্রাণী বলিল, টাকার লোভ ইন্দ্রাণীর ? বেশ, এই প্রতিষ্ঠানের সমস্ত লাভ আমি কালই তোমাকে লিখে দিচ্ছি—তোমার ব্যক্তিগত দায়িত্বে দিচ্ছি—কোনো দলের বা কমিটির জন্য নয়। আর তুমি তোমার ব্যক্তিগত কর্তব্যবোধ নিয়ে পরিচালনা করো এই মেয়েদের, এদের কর্তব্যে—নার্সের দায়িত্ব পালনে প্রবৃত্ত !

অমিত হাসিল, আমার ব্যক্তিত্বে তোমার যত আস্থা, ওদেরও দায়িত্বে তত আস্থা রেখে দেখো না কেন ?

না।

ইন্দ্রাণী বাহিরের দিকে তাকাইয়া আছে—চমৎকার পূর্ণিমা রাত্রির চাঁদ আর আকাশ। কি দেখিতে-দেখিতে হাসি ফুটিল ইন্দ্রাণীর ঠোঁটে একটু-একটু করিয়া। কিন্তু এ ত পূর্ণিমা রাত্রির হাসি নয়; ইন্দ্রাণীর সেই প্লাবন নয়। ইন্দ্রাণী বলিল, এ মেয়েগুলোকে তোমরা কাজ ফাঁকি দিতে শিখিয়ে সমাজকে শোষণ করতে শেখাচ্ছ; আর ওদেরকে তোমরাই মানুষ হতে দিলে না।

অমিত বলিল, শ্রেণী-সংগ্রামের সৈনিক যে মানুষ, সে সবচেয়ে সচেতন মানুষ, সব চেয়ে সচেতন ব্যক্তিত্বেরও সেই অধিকারী।

'সচেতন মানুষ' !—জ্বলিয়া উঠিল আবার ইন্দ্রাণীর চোখ।—স্বাধীন নয় যে মানুষ, সে মানুষ সচেতন ?—শ্রেণী-সংগ্রামের নামে বলি দিতে শেখালে যে মানুষকে তার নিজ বুদ্ধি, চেতনা, মানুষের অধিকার, তার ব্যক্তিত্বের আর তোমরা তবে রাখলে কি ?—

দ্যাখো না, তোমার আপন একান্ত সত্তায় সম্পূর্ণ হবার স্বপ্নও এই এত মানুষের স্বাধীন ব্যক্তিত্বকে দলে, মুচড়ে, মাটিতে মিশিয়ে দিতে চলেছে।

অশ্রদ্ধা জ্বলিয়া উঠিল এবার ইন্দ্রাণীর চোখে।—বিয়াল্লিশের বিপ্লবের বিরোধিতা করলে যারা, সোভিয়েট সংঘের দালালিতে যারা দুনিয়ার মানুষকে বলি দিলে সেই যুদ্ধের সাম্রাজ্যবাদীদের সম্মুখে, কোথায় ছিল তোমাদের সে 'সচেতন ব্যক্তিত্ব' তখন, অমিত ?···কথা শেষ করিল না—একবার হাসিল ইন্দ্রাণী। তারপর কথাটার আক্রোশ কমাইয়া বলিল, হাঁ, মানুষের সবচেয়ে বড়

স্বপ্ন—লেনিনের সোবিয়েত্। তার সব চেয়ে বড় দুঃস্বপ্নে পরিণত আজ এই লেনিনিষ্টদের সোবিয়েত্। মানুষ তার ডিক্টেটারি রাষ্ট্রের তলায় আপনাকে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। পৃথিবীর সর্বাধিক দানবীয় ক্ষমতা এ রাষ্ট্রযন্ত্রে কেন্দ্রিত; ক্রুরতম নিপীড়ন-যন্ত্র তা সভ্যতার, এই বিপুল-অবয়ব কলেক্টিভ্ রাষ্ট্র—

না, ইন্দ্রাণী এই রাষ্ট্রকে প্রাণে মনে ঘৃণা করে। সত্য কথা ঘৃণা করে সে সকল রাষ্ট্রকেই। মানুষকে একভাবে না একভাবে পীড়ন করেই রাষ্ট্র, পীড়ন করারই নাম ত সমাজ-শাসন। কিন্তু ঘৃণা করে ইন্দ্রাণী সোবিয়েত্ রাষ্ট্রকেই সব থেকে বেশি। 'কারণ, এমন রাষ্ট্র আর গড়ে ওঠে নি, সাধারণ মানুষকে এমন করে কোনো রাষ্ট্র আর তার যান্ত্রিক দমন-ক্রিয়ায় অঙ্গীভূত করে নিতে পারে নি।' বিভীষিকা এ রাষ্ট্র ইন্দ্রাণীর, বিভীষিকা এ রাষ্ট্র মানুষের।···আর তাই ইন্দ্রাণী ঘৃণা করে প্রত্যেক দেশের কমিউনিস্ট পার্টিকে। ঘৃণা করে সকল পার্টিকেই সে—

আবার বলিল ইন্দ্রাণী, মানুষকে মানুষ হিসাবে কেউ তারা চায় না; সকলেই চায় মানুষকে ছেঁটে-কেটে, দলে-মুচড়ে তাদের মেম্বর করে নিতে, নেতৃত্বের হাতিয়ার করতে। আর, এ চেষ্টায় সবচেয়ে দুর্বার-নীতিতে, আসুরিক পদ্ধতিতে করতে জানে তোমাদের কমিউনিষ্ট পার্টি—আমার প্রধান শত্রু।···

কিন্তু সকল দেশের নিপীড়িত মানুষের প্রধান ভরসা—

আর কি সর্বনাশের কথা তা—এ যে ডা'নর হাতে পুত্রসমর্পণ তাদের পক্ষে। তাই ত আমার এত রাগ তোমাদের উপর—তোমার উপরও, অমিত। তুমিই না মানুষের স্বাধীনতা আর মানুষের মর্যাদায়, মহিমায় ছিলে প্রাণে-মনে বিশ্বাসী ?

তা না হলে কমিউনিস্ট হলাম কি করে···

ইন্দ্রাণী তাহাও জানে, কিন্তু তাহা মানিতে সে রাজী নয়।

অমিত তথাপি জানায়, মানুষের স্বাধীনতা, মানুষের মহিমা···এ চেতনা, এ বোধ, এ লক্ষ্য নিয়েই ত এগিয়ে এসেছি এখানে। এ দেশের স্বাধীনতা, এ দেশের মানুষের আত্ম-প্রকাশ—এ স্বপ্ন নিয়ে একদা পা বাড়িয়েছিলাম পথে।

দেখতে দেখতে সে পথ বিস্তৃত হয়ে গেল ; এগিয়ে নিয়ে চল্‌ল। এল অন্তদিন। দেখলাম দেশবিদেশের ইতিহাসে স্বাধীনতার সাধনা, মানুষের জয়যাত্রা। বুঝলাম তার ঐতিহাসিক রূপ, তার স্বরূপ···বুঝলাম সেদিন মানুষের জীবন-সংগ্রামের পর্বে পর্বে তার স্বাধীনতার ক্রম-সিদ্ধি, তার মানবতার ক্রম-বিকাশ,—শ্রেণী-সংগ্রামের পথে পথে ইতিহাসের ক্রম-বিবর্তন ··

ইন্দ্রাণী জানে এসব, কিন্তু সে বুঝিল না, বুঝিবে না।···

স্বাধীনতার অর্থ কি, ইন্দ্রাণী ?

ইন্দ্রাণী অবশ্য জানে উচ্ছৃংখলতা নয়, না, বিশৃংখলাও নয়। কিন্তু ইন্দ্রাণী জানে না, শুধু শৃংখলমোচনই স্বাধীনতা নয়,—স্বাধীনতা সৃষ্টির সাধনা।

অমিত বলিল, ইতিহাসের অন্তর্নিহিত অর্থের খোঁজ নিলে দেখি—শুধু নেতি-বাচক নয় স্বাধীনতা। সত্য বটে বন্ধনমোচনে তার পরিচয় প্রত্যক্ষ হয় আমাদের চক্ষে। কিন্তু বন্ধন-মোচনও আসলে তার বাহ্যরূপ। তার আভ্যন্তরীণ সত্য হল প্রয়োজনের স্বীকৃতি—সৃষ্টির দাবীকে অঙ্গীকার। ইতিহাসের পর্বে পর্বে সৃষ্টির দাবী বাধা পড়ে অভ্যাসের ও নিয়মের গ্রন্থিতে। সেই গ্রন্থি মুক্ত করে দিতে হয়—মুক্ত করে দিতে হয় এভাবে সৃষ্টির প্রয়োজনকে প্রতিক্রিয়ার হাত থেকে ;—এইটাই বন্ধন-মোচনের দিক। কিন্তু সৃষ্টির সেই প্রয়োজনকে স্বীকার করে নিতে হবে বলেই এই গ্রন্থিচ্ছেদ। তাই শুধু মুক্তির-সাধনা নয়, আসলে সৃষ্টির সাধনাই স্বাধীনতা। সৃষ্টির সেই দাবীনিয়েই ইতিহাসে এসেছে আজ আর-একদিন, ইন্দ্রাণী, সৃষ্টির নতুন যুগ।

মুহূর্তেকের সন্দেহ জাগিল কি ইন্দ্রাণীর চোখে ?—মুহূর্তেকের, শুধু মুহূর্তেকের। কিন্তু না, ইন্দ্রাণী ইহা মানিবেনা। ইন্দ্রাণী তাহা বোঝে না, বুঝিল না, বুঝিবে না।···

অমিত তথাপি আবার বলিল, 'বুর্জোয়া স্বাধীনতা'র ভূতে তোমাকে পেয়ে বসেছে, ইন্দ্রাণী। ব্যক্তি-স্বাধীনতার সেই ফাঁকা বুলি রুশো ভল্‌তেয়ারের যুগেই মাত্র ছিল সত্য। গত পঞ্চাশ বছরে মরে মরে সে ভূত হয়ে গিয়েছে। তার এ যুগের পরিচয় ছাখো মার্কিন 'ফ্রি এণ্টারপ্রাইজ' ও এটম বোমার

মালিকানায়।…ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের নামে বিদ্রোহেও তাই এই মিথ্যারই বলবৃদ্ধি হয়। আজ আর-একদিন, সৃষ্টির নূতনতর পর্যায়। বিদ্রোহের পথে তুমি ঘুরে ঘুরে প্রতিক্রিয়ার পথেই গিয়ে তাই পৌঁছাও। কারণ, বিদ্রোহ আর বিপ্লব এক কথা নয়। বিদ্রোহ শুধু চলতি ব্যবস্থাকে অস্বীকার করে, বিপ্লব করে চলতি ব্যবস্থার রূপান্তর। বিদ্রোহ শুধু অস্বীকৃতি, বিপ্লব কিন্তু অঙ্গীকার—অঙ্গীকার প্রতিযুগের সৃষ্টির দাবীর।… তুমি স্বাধীন নও, স্বাধীনতা চাও না, তুমি বিচ্ছিন্ন মাত্র। আপনাকেই তুমি বিচ্ছিন্ন করেছ, ইন্দ্রাণী, আপনাকে সংযুক্ত করতে পার নি সৃষ্টির প্রয়োজনে, একালের সৃষ্টিশক্তির আয়োজনের সঙ্গে, জনতার সংগ্রামী জীবনের সঙ্গে, শ্রেণী-সৈনিকের দায়িত্বে আর তাহার উদ্‌যাপনে।…only in collective living do we reach plenitude.

কিন্তু ইন্দ্রাণী বোঝে নাই, বুঝিল না, বুঝিবে না এই যুক্তি।

কঠিন উদাস তাহার দৃষ্টি। অনেক অনেক দূরে মরুভূমির পার হইতে ইন্দ্রাণী দেখিতেছে যেন অনেক অনেক যুগের পুরাতন বন্ধুকে—আবেগহীন নিষ্পলক সেই দৃষ্টি।…

অমিতও সব বুঝিল। জীবনের যে দুই পথ একদিন একপথ হইয়া গিয়াছিল,—বিয়াল্লিশেই তাহা ভিন্ন হইয়া চলিতেছে জানিত অমিত;—বারে বারে পরস্পরকে তবু ছুঁইয়া গিয়াছে সেই দুই পথ আম বাগানের আড়াল হইতে, চষা-মাঠের মধ্য দিয়া, হাট-বাজারের আহ্বানে। দেখিল সে দুইপথকে অমিত কাল তখন: কোথায় পরস্পরকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে তাহারা,—দুই দিকে নয়—একেবারে বিপরীত-মুখী—ইন্দ্রাণী আর অমিত।…

দুই ভিন্নমুখী পথের বাঁক হইতে হইল এই সম্ভাষণ আর সংবর্ধণা—সন্ধ্যার চা ও খাবারে, রাত্রির লুচিতে আর মাংসে মিষ্টান্নে। শেষে ইন্দ্রাণী জানাইল, কাল দিল্লী মেলে ফিরে যাচ্ছি আমি। কবে দেখা হবে আবার তোমার সঙ্গে, জানি না। হাঁ, অমিত, এবার অনেক দূর এই দিল্লী। তোমাকে স্বীকার করেছি আমি বরাবর; স্বীকার করব তোমার জীবনকে, কিন্তু স্বীকার করবে

না ইন্দ্রাণী প্রাণ গেলেও তোমার মতবাদকে, তোমার সত্তার এই আত্মঘাতকে।... তারপর স্নিগ্ধ হাসির সঙ্গে সুদৃঢ় কঠিন বিজ্ঞপ্তি, বিদায়, অমিত—। তাই না?

অমিত উত্তর দিয়াছে, আমার মতবাদ, ইন্দ্রাণী, আমার জীবন ছাড়া নয়। জীবন জুগিয়েছে তথ্য আর চিন্তা তাকে যাচাই করে নিয়েছে—ইতিহাসের আলোকে।

ইন্দ্রাণী তাহা পূর্বেও মানে নাই, এখনো মানিল না, ভবিষ্যতেও মানিবে না।

তুমি মানুষ, অমিত। তোমাদের শ্রেণী-মতবাদের থেকেও মানুষ বড়। মানুষকে অশ্রদ্ধা করব না, কিন্তু মতবাদের মানুষকে আমি শ্রদ্ধা করি না।

হাঁ, আমার মন আছে, মত আছে, মতবাদইত জীবনধর্ম। আমি মনুষ্যবাদী, ইন্দ্রাণী, তাই আমি মার্কসবাদী, আর এযুগের মনুষ্যবাদই মার্কসবাদ—সৃষ্টির এই কর্ম যোগশাস্ত্র।

বিদায় অমিত?—বিদায় ইন্দ্রাণী ..

বিদ্রোহিনী ইন্দ্রাণী কাঁদে নাই...বিজয়িনী ইন্দ্রাণী দুঃখও করে নাই;—ইহাই ত তাহার বিদ্রোহের ট্র্যাজিডি, তাহার মিথ্যাবিজয়ের সর্বনাশিতা...।

অমিত, তুমি কাঁদিয়াছ কি?...কাঁদিয়াছে, অশ্রুহীন চোখে কাঁদিয়াছে অমিত কাল রাত্রিতে। জীবনের এই শোকাবহ পরাজয়ের কথা বুঝিয়াছিল সে বুঝি বিয়াল্লিশেই।—অথবা আরও পূর্বে,—হয়ত বা প্রথম সেই ইন্দ্রাণী-অমিতের জীবন-সংঘর্ষেই ...জানিতাম নাকি বিশ বৎসর পূর্বে, পঁচিশ বৎসর পূর্বেও? তখনো ইন্দ্রাণী তাহার জীবন-গতির আত্মহারা আনন্দে আমার মনের আত্মীয়া হইয়া উঠিতেছে:—অতি অবুঝ ভাবে জানিতাম ইহা তখনো। তবু কালই প্রত্যক্ষ করিলাম, কাল—ইন্দ্রাণী আত্মভ্রষ্টা আপনার গর্বিত গতিতে। অথবা, মিথ্যা কথা, কালই তাহা জানিলাম, কালই ইন্দ্রাণীর এই পরিণতি প্রত্যক্ষ করিলাম। কিন্তু এই পরিণতি ইন্দ্রাণীর অনিবার্য হইয়াছে তাহার স্বভাব বা নিয়তির জন্য নয়, দেহ-মনের নিজস্ব তেজোময় ঐশ্বর্যের জন্যও নয়, তাহার প্রাণময় গতিময় আচরণ আতিশয্যেরও জন্য নয়। অবশ্যম্ভাবী

হইয়াছে তাহার বিচিত্র নিষ্ঠুর পরিবার-পরিবেশের জন্য, একান্ত আত্মনির্ভরতার গর্বে আত্ম-কেন্দ্রিকতার জন্য, একালের গণসংগ্রামের বিপুল সৃষ্টিশক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন থাকার জন্য, আত্ম-মর্যাদা-সম্পন্না এ-দেশের মেয়ের এ-দেশের নিষ্ঠুর কদর্য শাসন-বিচারের বিরুদ্ধে একাকিনী বিদ্রোহের জন্য। ইন্দ্রাণীর মতবাদও তাই তাহার জীবন-ছাড়া নয়। পৃথিবী বাঁকিয়া-চুরিয়া দিয়াছে তাহার জীবনকে, তাহার মতবাদ সেই বাঁকা-চোরা জীবনেরই প্রতিলিপি…।

কবে শেষ হইবে এদেশের মানুষের জীবনের এই ট্রাজিডি? এ দেশের মেয়ে-জীবনের এই ট্রাজিডি? শেষ হইবে বিদ্রোহিণী ইন্দ্রাণীর জীবনের ট্রাজিডি—বিদ্রোহিনী মংলীর জীবনের ট্রাজিডি? শেষ হইবে ঐতিহ্য-মুগ্ধ সবিতার জীবনের ট্রাজিডি, সুর'র ট্রাজিডি? কিংবা ঐতিহ্যহীনা মিসেস্ সেনরায়ের জীবনের প্রহসন, আর মঞ্জুর জীবনের কৌতুক নাট্য?…

অমিত সুজাতা সেনকে বলিল: আপনার কি মনে হয় ধর্মঘট আর বেশি দিন টিঁকবে না?

কত টিঁকবে আর? সাতাশ দিন ত হল। নার্সরাও বলছিল, 'আর পারি না দিদি। একটা মীমাংসা করো।' আর ওরা তেমন প্রস্তুত নয়—ঘরে আত্মীয়-পরিজন অনাহারে রয়েছে।

অমিত তাহা বুঝিল। ইহা শেষ ধর্মঘট নয়, ইহাও সত্য। মীমাংসা একটা চাই। সে বলিল, আপনারও ত বোন্ আছে একটি। মিনা। কলেজে পড়ে বুঝি? কি পড়ে সে?

পড়ে মেডিকেল স্কুলে। ইন্দ্রাণীদি'ই ভর্তির ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। এখন অবশ্য তিনি চটে গিয়েছেন মিনার উপরও।

কেন?

মনুর সঙ্গে তার বন্ধুত্ব। ওর বিশ্বাস মিনাই মনুকে বাগিয়ে পার্টিতে টানছে।

ওরা বিয়ে করবে নাকি?

বিয়ে করবে কি? ওদের বয়স এখনো উনিশ-কুড়ি। তা ছাড়া, মানুরও কথা তার মায়ের মত। আমেরিকা ত গেলই না; এখন মায়ের থেকে টাকা নিয়েও আর পড়বে না। বলে, প্রোডাকটিভ্ কাজকর্মে নিজের জীবিকা অর্জন না করলে সে আবার মানুষ কি?…মিনাই কি কম? বিয়ের কথা বললে সে বলে—পাশ করবে, ডাক্তার হবে, উপার্জনক্ষম হবে; তারপর যদি করতে হয় বিয়ে করবে নিজের জোরে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে।

তা হলে ত মিনাই সিষ্টার ইন্দ্রাণীর উপযুক্ত পুত্রবধূ হতে পারে। তবে ইন্দ্রাণীর আপত্তি কেন?

আপত্তিও ওই—তেজী মানুষ ত তিনি। তিনি চান সকলে তাঁকেই মানবে, তাঁকেই স্বীকার করবে, বড় বলবে। কিন্তু মিনাও কম জেদী নয়। তাই ছেলেবেলায় মিনাকে তাঁর পসন্দও ছিল বেশি; আর বড় হতেই মিনাকে তিনি একটুও সহ্য করতে পারেন না। মনে করেন মিনা বুঝি ওঁরই প্রতিদ্বন্দ্বিনী।…

হাওড়া ষ্টেশন বুঝি এতক্ষণে আজ পিছনে পড়িয়া গেল। মিলাইয়া গিয়াছে মানবের মুখ প্ল্যাটফর্মের শত শত মুখ ও মাথার মধ্যে। একটা কথাও হয় নাই—এই আধ ঘণ্টা মাতা-পুত্রে। আপন আসনে আসিয়া বসিয়া পড়িয়াছে এবার ইন্দ্রাণী। চক্ষু মুদ্রিত, মাথা পিছনের গদীতে এলানো।…মানু তাহার মায়ের সহায়তাও ত্যাগ করিতেছে এইবার। মানু ত্যাগ করিল মাকে--কোথায় চলিল ইন্দ্রাণী? কোথায়? কোথায়? কোথায়?…

দিল্লী? কেন? কি কাজ আর তাহার কাজে? কিছু না, কিছু না। কোথায় তবে যাইবে সে? ইন্দ্রাণী তাহার নিজের ঠিকানাও আর জানে না।…

ইন্দ্রাণীর হাত পড়িল আপনার পার্শ্বস্থ কাগজখানার উপরে। সন্ধ্যার বিশেষাঙ্ক সংবাদপত্র বুঝি। খুলিয়া দেখিবার সময় হয় নাই এতক্ষণ, এইবার বরং পড়িবে তাহা ইন্দ্রাণী। টান হইয়া চোখ মেলিয়া বসিয়াছে ইন্দ্রাণী—"কমিউনিষ্ট পার্টি বে-আইনী"। ইন্দ্রাণীর চোখ বড় হইয়া উঠিল; মাথা ঝুঁকিয়া পড়িল কাগজের উপরে। দৃষ্টি সতেজ হইল, সুতীক্ষ্ণ হইল;—আগ্রহ আশঙ্কায়

তাহা দ্রুত ঠেলিয়া চলিয়াছে শব্দ, পংক্তি, প্যারা, স্তম্ভ···তারপর আর চলে না। চলে না, চলে না। কিছুই দেখে না চোখে ইন্দ্রাণী !···

আবার মাথা এলাইয়া চোখ বুজিয়া বসিয়াছে ইন্দ্রাণী। কাল অমিতকে সে বিদায় দিয়াছে—বিদায় লইয়াছে অমিতের নিকট··আর অমিত আবার ফিরিয়া গেল জেলে। সেই অমিত, তাহার অমিত, তাহার বিদায় দেওয়া অমিত।

···ইন্দ্রাণীর ভবিষ্যৎ হইতে মানু চলিয়া যাইতেছে; ইন্দ্রাণীর অতীত হইতে অমিত চলিয়া যাইতেছে···অতীত নাই, ভবিষ্যৎ নাই—কি আছে তোমার, ইন্দ্রাণী? কি আছে তোমার এইবার? কী তোমার ঠিকানা, কী তোমার পরিচয়?

··এ জীবনে তুমি আত্মদান করিতে পার নাই; এ জীবনে তুমি কাহাকেও আপনার মধ্যে গ্রহণ করিতে পার নাই—মানুকে নয়, অমিতকে নয়; পুত্রকে নয়, প্রিয়কে নয়। আপনারই জন্য শুধু তাহাদের চাহিয়াছ, পুত্রের জন্য পুত্রকে চাও নাই, প্রিয়র জন্য চাও নাই প্রিয়কে। আর তাই পুত্র আর পুত্র নাই, প্রিয় নাই প্রিয়—আর তুমিও বুঝি নাই তোমার আপনার।—তোমার অতীত অর্থহীন হইয়া গেল, তোমার ভবিষ্যৎ শূন্য হইয়া গেল···তোমার তুমি হইয়া গেলে খণ্ডিত, নিরর্থক, শূন্যময়।···

চোখের কোণ বাহিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে চাহিল।

ইন্দ্রাণী, ইন্দ্রাণী, ভাঙিয়া পড়িবে নাকি তুমি?···

না, ইন্দ্রাণী টান হইয়া বসিতেছে। অর্থহীন হোক অতীত, হোক্ শূন্য ভবিষ্যৎ—ইন্দ্রাণীর বর্তমান আছে, আর ইন্দ্রাণী—ইন্দ্রাণী,—বিদ্রোহিনী সে অপরাজিতা সে। কাহার সাধ্য ইন্দ্রাণীকে অস্বীকার করিবে?—অমিত? মানব?—

ইন্দ্রাণী আপনার সত্তায় আপনার দীপ্তিতে বাহিরে অনবনত। আর তাই তোমার সত্তায়, মানব, তোমার জীবনে, অমিত, ইন্দ্রাণী রহিবে চির-স্বীকৃত। না থাকুক ইন্দ্রাণীর অতীত, না থাকুক ভবিষ্যৎ,—ইন্দ্রাণী ইন্দ্রাণী—মহাশূন্যের কক্ষশূন্য ঠিকানাহীন ধাবমান জ্যোতিষ্ক।

বাহিরে তাকাইল ইন্দ্রাণী—অন্ধকারের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে দিল্লী মেল।···

কাল রাত্রিতে অমিত যখন গৃহে ফিরিয়াছে তখন রাত্রি অনেক—আকাশ পূর্ণিমালোকে উদ্ভাসিত। উৎসবের কোলাহলে পৃথিবী মুখরিত। আর অমিতের মনে হইয়াছে এই আলোর মধ্যে, উৎসবের মধ্যে, সে যেন কি হারাইয়াছে। সে বুঝি নিষ্প্রয়োজন—পূর্ণিমা রাত্রির এই ল্যাম্প পোষ্টের মতই নিষ্প্রয়োজন। তাহার দিন গিয়াছে—আর ইন্দ্রাণীর? কোথায় সে ইন্দ্রাণী? সে বুঝি কোন্ কক্ষচ্যুত মৃত নক্ষত্র। কখন নিবিয়াছে তাহাও সে জানে না। এখন শুধু সে টুক্‌রা-টুক্‌রা হইয়া যাইতেছে। খসিয়া যাইতেছে তাহার সংঘ, তাহার দান, তাহার প্রাণ, তাহার প্রেম, তাহার সৃষ্টি—অমিত, মানবও…

but, oh,

The difference to me.

বাষ্পাচ্ছন্ন অমিতের চক্ষু…

কাল রাত্রিতে পূর্ণিমার আকাশের তলায় অমিত মনে করিয়াছিল বুঝি সে নিরর্থক—পূর্ণিমা রাত্রির প্রদীপের মতই অনাবশ্যক।—আজ প্রভাতে রাত্রি পোহাইতে না-পোহাইতে কিন্তু সেই অমিত নিমন্ত্রণ পাইয়াছে—মহাশূন্যের এপারে এই সূর্যের সভায় জনতার শেষ যুদ্ধে।

ইন্দ্রাণী, ছেঁড়া-পাল, ভাঙা হাল অমিতের জীবন-তরণী আজও ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে—এই কক্ষে বসিয়া—মহামানবের সমুদ্র-তরঙ্গের মধ্যে। ছেঁড়া পাল, ভাঙা-হাল এই অমিত; তবু মানুষের তীর্থযাত্রায় আজও সে যাত্রী—আজও সে সঙ্গী ঝড় আর বিদ্যুতের, সঙ্গী মানুষের ও ইতিহাসের।…

আট

মাষ্টার সাহেবকে এতক্ষণে একলা পাওয়া গেল। সমস্তটা সময় এক-জন না-একজন তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়া ছিল। শান্ত মানুষটি, ধীরে ধীরে তাহাদের কথা শুনিয়াছেন। তাঁহাকে না বলিলে কাহাকে বলিবে কানাই হাজরা নিজের বাড়ির কথা? বুল্‌কনই বা স্ত্রীর পীড়া ও পুত্রকন্যার শিক্ষার পরামর্শ কাহার সহিত করিবে? মঞ্জু, বিজয়, দিলীপ কাহার নিকট শুনিবে রেগুলেশন থ্রি-র যুগের কাহিনী, কানপুর-মীরাট ষড়যন্ত্রের মামলার কথা?

উত্তেজনা নাই কোনো কথায়। শান্ত চোখ, শান্ত মুখ। বর্ষীয়ান মানুষের স্নেহ-শ্রীময় রূপ। কোথাও আতিশয্য নাই; বরং অকিঞ্চিৎকর, সাধারণ তাঁহার রূপ ও বেশবাস। সর্ব বিষয়ে একটি পরিচ্ছন্নতা আছে, আর শান্ত অমায়িকতা। মৃদু স্থির তাঁহার কণ্ঠস্বর, দৃঢ় স্থির তাঁহার মত। ব্যক্তিত্ব তাঁহার সরল বা অসামান্য,—এমন কথা কেহ বলিবে না। ঔজ্জ্বল্য বা কোমলতা, তীক্ষ্ণতা বা গাম্ভীর্য, জটিলতা বা সরলতা—ব্যক্তিত্বের এইরূপ কোনো একটা সুপরিচিত সংজ্ঞার মধ্যে পুরিয়া এই মানুষকে লইয়া নিশ্চিন্ত হইবার উপায় নাই।···ব্যক্তিত্ব আপনাতে আপনি প্রকাশ—কে বলিল? ব্যক্তিত্ব আপনাতে আপনি যেমন সম্পূর্ণ নয়, ইন্দ্রাণী, তেমনি প্রতি মানুষের ব্যক্তিত্ব দিন-রজনীর জ্ঞাত-অজ্ঞাত শত শত ঘটনা ও মানুষের মধ্য হইতে আপনার প্রাণরস সংগ্রহ করিয়াই হয় বিচিত্র ও বিশিষ্ট, অপূর্ব ও বিকাশশীল—এই আজও যেমন তাহা লইতেছ তুমি, অমিত,—লইয়াছেন মাষ্টার সাহেব সারাক্ষণ প্রত্যেকটি মানুষের কথা ও সমস্যাকে স্বচ্ছন্দ মনে গ্রহণ করিয়া,—প্রত্যেককে বিনা প্রয়াসে তাঁহার আপনার করিয়া, আর তেমনি আবার সহজ অমায়িকতায় প্রত্যেককে আপনার অভিজ্ঞতার ফল দুই হাতে সমর্পণ করিয়া সেই নব-নব ব্যক্তিত্বের বিকাশের মধ্যে আপনার ব্যক্তিত্বকেও আবার মিলাইয়া মিশাইয়া। অথচ তাঁহার চেতনা

ইহাদের সকলকার জীবনকে ঘিরিয়া আগাইয়া গিয়াছে উহার বাহিরে—যেখানে আজ শত শত কর্মী অকস্মাৎ ব্যাধ-বিতাড়িত শিকারের মত আপনাদের রক্ষায় ছুটিয়াছে ;—তাহাদের ব্যক্তিগত জীবন, তাহাদের কর্মী-জীবন, সকল কিছু ঘিরিয়া সেই চেতনা আবার চলিয়াছে গণনা করিয়া সাবধানী বৈজ্ঞানিকের মত—এই দিনের রাজনৈতিক পরিস্থিতির হিসাব।...

মাষ্টার সাহেবের সঙ্গে সারা দিনের শেষে এই মুহূর্তে সেই হিসাবটাই অমিত একবার মেলিয়া দেখিতে, বুঝিয়া লইতে চাহিতেছিল : সন্দেহ নাই, বড় অপ্রস্তুত তাহারা। কিন্তু আরও সন্দেহ নাই—প্রস্তুত আজ পৃথিবী, প্রস্তুত আজ ইতিহাস। এশিয়ায়ও তাহার পদপাত শোনা যায় ; চীনে তাহা সুনিশ্চিত ; এদেশেও তাহার পথ প্রস্তুত। এই ত কত দিক দিয়া, কত রূপে সেই ইতিহাস কত বিভিন্ন চরিত্রের মানুষকে আজ সবলে টানিয়া আনিয়া পাশা-পাশি দাঁড় করাইয়া দিতেছে—বুলকন্ ও সৈয়দ আলী ; কানাই হাজরা ও তপন, মঞ্জু ও সবিতা ! সাধ্য কি কেহ, কোনো সত্যকার সুস্থ-স্বভাব গভীর-চেতনার মানুষ আজ অস্বীকার করিবে ইতিহাসের এই দাবি ? অস্বীকার করিবে সভ্যতার এই প্রয়োজন, সৃষ্টির এই নির্দেশ ?...

'গাড়ী এসেছে, এবার আপনারা চলুন। দু'বারে নিয়ে যাবে।'—একখণ্ড কাগজ হাতে করিয়া একজন গোয়েন্দা কর্মচারী আসিয়া দাঁড়াইল।

কোথায় নেবে ?

জেল কাষ্টোডিতে।

কি ব্যবস্থা হয়েছে সেখানে আমাদের কাপড়-চোপড়ের ? ওবেলা আমরা নাই নি, খাই নি—

সব ব্যবস্থা আছে সেখানে।

বাজে কথা। জেলে খাওয়া-দাওয়া শেষ হয় বিকাল পাঁচটায় ! আর এখন রাত্রি আটটা।—মোতাহের বলিল,—কিছু পাওয়া যাবেনা।

গোয়েন্দা কর্মচারী বলিল, আমরা জেলে ফোন্ করে রেখেছি, সব আয়োজন তাঁরা করবেন,—

অমিত বিশ্বাস করে না। 'বেইমানের কথা,' বুল্‌কন্ তখনি জানায়। অন্তরাও তাহাই মনে করে। কিন্তু এই আপিসের ছোট বড় 'সাহেবরা' এখন একজনও কেহ নাই, এতগুলি লোকের কোনো ব্যবস্থা না করিয়াই তাহারা পালাইয়াছে। গোয়েন্দা কর্মচারীও নিরুপায়। আর, এই ঘরে এতক্ষণ আবদ্ধ থাকিয়া অমিতেরাও সকলেই শ্রান্ত। থানার হাজত আরও জঘন্য। জেলে, অন্তত প্রেসিডেন্‌সি জেলে, খানিকটা হাওয়া মিলিবে। খাবার মিলিবে না; বিছানাপত্র, কাপড়-চোপড় ও এ রাত্রিতে মিলিবে না। স্নানের জল? না, এই রাত্রিতে তাহাও মিলিবে না। তবুও এই ঘর ছাড়িতে পারিলেই এখন বাঁচা যায়—একাদিক্রমে বারো তেরো ঘণ্টা এতগুলি লোক একটা ঘরে, খাবার জলের বন্দোবস্ত পর্যন্ত যেখানে নাই, আছে শুধু পাহারার বন্দোবস্ত।

মাষ্টার সাহেবের সঙ্গে কথাটা আর শেষ হইল না। জেলেই হইবে আলোচনা—পাওয়া যাইবে মোতাহের ও সৈয়দ আলীকেও।

প্রথম গাড়ীতে যাহারা যাইবে তাহাদের নাম পড়া হইতেছে। হাস্য কৌতুকে সংবর্ধনা হয় প্রত্যেকটা নামের। শুনিতেছে অমিত। এক-একটা নাম শোনে আর তাহার মনে পড়ে এক-একটা জীবনের ছবি।

'সুরথ ভট্টাচার্য': চব্বিশ পরগনার কৃষক সভার···বছর পঁচিশের যুবক,··· ফর্সা রং রৌদ্রেও ময়লা হয় নাই···সাত বৎসর ধরিয়া নিঃশ্বাস ফেলেন নাই··· যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী···তারপর তেভাগা।···গ্রাম থেকে শহরে, শহর থেকে গ্রামে হাজার কাজ লইয়া ছুটিয়াছেন সুরথ···দুই একটা মামলায় গোড়ার দিকে এক আধবার ওয়ারেন্‌ট্ হইয়াছিল···জেলও একেবারে অচেনা নয়। কোর্টে সর্বত্র তাহাকে লোকে জানে—হাজার ব্যাপার লইয়া বুদ্ধিমান্ সুরথ ভট্টাচার্য লাগিয়াই থাকেন। কাজ করিতে জানেন, সর্বক্ষণ হাসিয়া কথা বলিতে জানেন,

সব চেয়ে বেশি জানেন এই কথা, সহজে কাজ করা যায় না, ধৈর্য চাই। তাই হাসি তাঁহার মুখ হইতে মিলাইয়া যায় না…

কিন্তু মিলাইয়া যায় মুহূর্তের মধ্যে চলচ্চিত্রের এ চিত্র, নূতন নাম কানে পৌঁছায়।

'মহেশ দাস'…বছর ত্রিশের যুবক, কাহার পাল্লায় পড়িয়া ঝুঁকিয়াছিলেন স্বদেশীতে…তারপর দেখিয়াছি তাঁহাকে সেবার—এ জেলেই। দেখিয়াছি কতবার চব্বিশ পরগণার গাঁয়ের কৃষক দলে, গ্রামের নানাকাজে। গাঁয়ের স্কুলটাকে হাইস্কুল করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে দেখা করিতে কাল শহরে আসিয়াছিলেন বুঝি? বেশ, আপাতত চলুন জেলে…

ফুটিতে না ফুটিতে চিত্রটা মিলাইয়া গেল আর একটি নামের ঘোষণায়।

'সৈয়দ আলী'…একটা হর্ষধ্বনি পড়িয়া গেল। অমিতও যোগ না দিয়া পারিল না: 'তাস নিয়েছেন ত? সিগারেট, পান জর্দা?' না, পান জর্দা যথেষ্ট না লইয়া সৈয়দ আলী জেলেও যাইবেন না। 'তিনি না এলে আমরা পান পাব কোথায়? সৈয়দ আলীকে না পেলে আমরা গল্প করব কার সঙ্গে? জেলটা চিনিয়ে দেবে কে? কয়েদিরা মানবে কেন আমাদের?' এতদিনকার জেলের অভিজ্ঞতা সৈয়দ সাহেবের—সেই ১৯২২ থেকে? ১৯৩০এও;—হাঁ, পালাটা একটু দীর্ঘ হইয়াছিল সেবার, সাত বৎসর। ১৯৪০এও আবার; কয়দিন মাত্র। এখন ১৯৪৮এও এবার—স্বাধীন ভারতে।

পাকিস্তানে গেলেই পারতেন?

সে কি আমার দেশ? সে ত আপনাদের 'বাঙালদের' দেশ! আমরা চব্বিশ পরগণার মানুষ—সৈয়দ আলী ভয়ানক ক্ষুব্ধ। স্বাধীনতার জন্য তাঁহারা পুরুষানুক্রমে সংগ্রাম করিয়াছেন, তিতু মিঞার সঙ্গে ছিল তাঁহাদের আত্মীয়তা, যোগাযোগে। সরকার কেন, কোনো কর্তৃপক্ষের নিকট তাঁহারা হাত পাতিতে জানেন না।…আলাপী, আয়েসি, লেখাপড়া জানা, সুশিক্ষিত আরবী উর্দুতে, দোরস্ত ইংরাজী বাংলায়, সৈয়দ সাহেব না চাহিলেন লীগের ছায়া মাড়াইতে, না চাহিলেন "কংগ্রেসী মুসলমান" হইতে। হইলেই, হইতে পারিতেন ঢাকায় বা

করাচীতে লীগের মন্ত্রী, হইতে পারিতেন কংগ্রেসী মুসলিম—দিল্লীর উজীর ওমরাহদের খাশমুন্‌সি। বাধা কিছুই ছিল না। বিদ্যাবুদ্ধি, পারিবারিক প্রভাব-প্রতিপত্তি,—ছিল সবই। কিন্তু বাধা হইয়াছে নিজের প্রকৃতি—'আঃ, এ কি হয় নাকি? একটা আন্দোলন করছি, সংগ্রাম চালাতে হবে…'হয় না, সংগ্রাম চালাইতে হইবে, তিতু মিঞার দিন হইতে তাহাই তাঁহারা জানিয়াছেন। তাই হইল না অন্য কিছুই করা:—আরামপ্রিয়, আলাপপ্রিয়, আড্ডাবাজ, অমায়িক, সৈয়দ আলীর রাজনৈতিক আন্দোলনে জেলে ছাড়া বাহিরেও বেশি দিন থাকা হয় না। শরীরটা তাই আর সুস্থ নাই; পঞ্চাশে পৌছিয়াছেন বই কি। কিন্তু দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ সুপুরুষকে দেখিয়া সকলকে তবু আপনা হইতেই সম্ভ্রম করিতে হয়; কথা বলিতেও ইচ্ছা হয়, আর তারপর তিনি মুখ খুলিলেই জমিয়া যায় আত্মীয়তা।

আসুন তা হলে অমিত বাবু;—হাস্যভরা কণ্ঠে ডাকিলেন সৈয়দ আলী,—কাঠের চেয়ারে বসে বসে পীঠ ধরে গেল। গিয়ে জেলের লোহার খাটটায় অন্তত টান হতে পারা যাবে।

একটু আগেই যান,—আমরা নয় রাত্রিতে নিজের ঘরেই ফিরে যাব।

আপনার আবার ঘর কি, মশায়? ঘর আমাদের।—ছেলে আছে, মেয়ে আছে। হাঁ, বড় মেয়ের ছেলে হয়েছে…বড় ছেলের বিয়ের কথা পাকা হয়েছে… একটা রেসপেক্‌টেব্‌ল সিটিজেন্ অব্ দি ইণ্ডিয়ান্ ডোমিনিয়ন।

বটে? না ফিফ্‌থ্ কলাম অব্ পাকিস্তান? আমাদের শিশুরাষ্ট্রকে নুন খাইয়ে মারবার ষড়যন্ত্র করছেন এখানে।

কথার কাটাকাটি ফুরায় না, হাসি মিলায় না। কয়েকটা নাম ইতিমধ্যে এক-একটা ক্ষীণ বিদ্যুদাভাসের মত চমকিয়া গিয়াছে—'কৈলাস দত্ত'…প্রাদেশিক কৃষক সভার।… 'শত্রুঘ্ন চক্রবর্তী', 'না, আমি নই, আমি শত্রুজিৎ…' 'আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক করছি শত্রুজিৎ'…বেলেঘাটার ট্রেড ইউনিয়নের কর্মী বুঝি,… সৈয়দ আলীর সঙ্গে পরিহাসে কানে যায় না, নাম চলিয়া যায়।

'বিনোদ ভট্টাচার্য'‥ আর প্রয়োজন নাই শুনিবার। ইতিহাসের পাতায়

ইহাঁরা পদার্পণ করিয়াছেন। ভূজঙ্গ সেনদের বন্ধু ছিলেন তাঁহারা সেদিনে, সহকর্মী ছিলেন একালের মন্ত্রিবর্গের…জেল, সংগ্রাম, সংগঠন…আবার জেল, আবার সংগঠন, মৃত্যুর যজ্ঞ। চট্টগ্রাম…শেষ যুগ স্বদেশীর…কালাপানি, আর কালা গরাদ…ইহাঁদের এই রক্ত অভিষিক্ত পথ বাহিয়াই স্বদেশীরথ পৌঁছিয়াছে লালদীঘিতে আর কালাবাজারে। কিন্তু আবার জেলে ফিরিতেছেন বিনোদ ভট্টাচার্য—নতুন ইতিহাসের নূতন পাতা খুলিতেছে ওদিকে। এদিকে খুলুন তাঁহার পূর্ববন্ধুরা জাতীয়তার নূতন হিসাব—কালোবাজারের পাকা খাতায়।

'মথুরা বাক্‌চি'…ইতিহাসের যাত্রাপথের প্রায় চল্লিশ বৎসরের সাক্ষী… কারো চোখে পড়িবেন না এই সামান্য মানুষ—কেহ এড়াইবে না তাঁহার অসামান্য দৃষ্টি। কোন আগে সেই স্বদেশীর প্রথম পর্বে প্রথম কৈশোরে তাঁহার যাত্রা হয় শুরু…তারপর আলোতে অন্ধকারে, গোপনে গোপনে পথ-চলা…পদে পদে দুঃখের কণ্টক জ্বালা, পদে পদে অবিশ্বাসীর সর্পদংশন, পদে পদে সংগঠনের নতুন স্থাপনা। জেল হইতে জেলে তাঁহার পথ চলে, দেশ হইতে বিদেশে,—কালাপানির পারে, মরুভূমির ছায়ায়। চোখে পড়িল তখন ইতিহাসের নূতন বাঁক নূতন মোড়। স্বদেশীর পথ মিলিল আসিয়া ইতিহাসের নূতন পথে। আবার যাত্রা। নিঃশব্দ নিরলস নিরভিমান আশ্চর্য মানুষের আশ্চর্য সংকল্প ফুরায় না।…চলে চলে, চলে…ক্ষীণহাসি, বাক্যকুণ্ঠ মানুষ যেন সকলের দৃষ্টিকে এড়াইয়া গিয়াই এখনো উঠিতে চাহিলেন জেলের গাড়ীতে।

'জ্যোতির্ময় সেন'…জ্যোতির্ময়—জেল আর আন্দোলনের মধ্য দিয়া জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলি তাহার নিঃশেষিত। মণীশের বন্ধু সে, সুধীনের আত্মীয়। মিনতিকে লইয়া ঘর বাঁধিতে গিয়াও যে ঘর বাঁধে নাই। ছুটিয়াছে পথে পথে, কৃষকদের গ্রামে গ্রামে। বারে বারে গড়িতে গিয়াছে পথ পূর্ববাঙলার মুসলমান চাষীদের লইয়া, বারে বারে ধুইয়া মুছিয়া দিয়াছে তাহা লীগ। ব্যর্থ প্রয়াসেও ব্যর্থতা বোধ করে নাই তবু এতদিন জ্যোতির্ময়…আর আজ বঙালী জাতির ঘর ভাঙিয়া যাইতে সে আকুল ঘরের চিন্তায়। মিনতি আর পাকিস্তানে যাইবে না… কেমন করিয়া পাকিস্তানে ফিরিবে তবে জ্যোতির্ময় সেন?…মিনতির আপত্তি

যে। মিনতি ফিরিতে দিবে না…কি হইবে তবে মিনতির? কি করিবে জ্যোতির্ময় সেনইবা?…

'বেণু ঘোষ', 'সূর্যনাথ', 'শংকর দয়াল', কয়েকটা নাম যেন কানে গেল না অমিতের।—কি করিবে জ্যোতির্ময় সেন? কি করিবে মিনতিই বা এখন?…কি করিবে? কি করিবে নিম্ন-মধ্যবিত্তের জীবনের টানে ছিটকাইয়া পড়া এমন কতজনে, কে কোথায়?…

'কান্তিলাল চতুর্বেদী': 'ইয়েস প্লিজ'। প্রিয়দর্শন যুবক বুঝি অধ্যাপকের নাম ডাকায় সাড়া দিতেছে। সকলে হাসিয়া উঠিল।

প্রাণবান্ যুবক-প্রকৃতি আপনার বিদ্যা ও বুদ্ধি লইয়া যেন তৃপ্ত হইতে পারে না। কাব্য পড়ে, তর্ক করে, ছাত্রদের রাজনীতির সভার চমক দিয়া যায় বিদ্যুতের মত। তারপর আলোকের মত ছড়াইয়া পড়ে; নাচিয়া বেড়ায় শ্রমিক আন্দোলনের বারি-বিস্তারে।…হাতে কাগজ, মুখে কথা, চটকলে-রেলওয়েতে ডকে…নাই কোথায় সে? এখানে, ওখানে সেখানে, কোথায় নাই কান্তি?… আর সর্বত্র দাবী 'কান্তি কো চাহি'।—বলিতে হইলে চাই, লিখিতে হইলে চাই, অন্ত ইউনিয়নকে বুঝাইতে হইলে চাই, অমুকখানে প্রতিনিধি পাঠাইতে হইলে চাই। কান্তিকে চাই হাসিতে হইলে, কান্তিকে চাই নাচিতে হইলে, কান্তিকে চাই গল্প করিতে হইলে। কান্তিকে চাই চা বানাইতে—পেয়ালা ভাঙিতে, কান্তিকে চাই দাবা খেলিতে—খেলার তর্ক করিতে, কান্তিকে চাই পড়িতে—পড়ার থেকে বেশি কথা বলিতে। মোটকথা কান্তিকে চাই সকলের। আর কান্তিরও তাই সময় হয় না—আম্বালায় তাঁহার মাকে দেখিবার, আহমদাবাদে তাহার ভাইকে দেখিবার, নৈনিতালে তাঁহার নতুন বৌদিকে দেখিবার। সময় পাইল কই দু বৎসরের মধ্যে কান্তি?…কিন্তু এবার তাঁহারা আসিতে পারিবেন ইচ্ছা করিলে এখানে—কান্তি আছে জেলেই, দেখা হইবে।…

প্রথম দল চলিয়া গেল—প্রায় ত্রিশজন।

একবারের মত শুব্ধ হইল যেন ঘরটা—লোক কমিয়া গিয়াছে বুঝা যায়। বুঝা যায় যাত্রা শুরু হইয়াছে। এতক্ষণ যে হাস্ত-মুখরতায় শ্রান্তি আসিয়াছিল

তাহার ফলেই হয়ত আসিল একটু বিশ্রামের প্রয়োজন। তবু নীরব থাকিবে না কেহ। থাকিতে পারিল না।

সাড়ে আটটা বাজিতেছে যে।

'আপনাদের ট্যাক্‌সি এসেছে'—মেয়েদের বলিল এক কর্মচারী।

ট্যাক্‌সি ?

হাঁ, আপনাদের ট্যাকসিতে নেবারই নির্দেশ হয়েছে।

হবেই ত। আমরা ত আর তোমাদের মত বাজে প্রিজ্‌নার নই—হাসিয়া বলিল মঞ্জু বিজয়কে।

যাবে আর কোথায় ? শুনলাম ত—দেখ্‌বে জেলখানায়—একেবারে জেনানায় ঢোকাবে—

সত্যি, অমি' মামা ?

সত্য কথা,—অমিত বুঝাইল।

আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে না আর জেলে ?…

সম্ভাবনা নেই। জেলে তোমাদের পক্ষে আমরা সকলেই পুরুষ—বাদে সুপারিনটেণ্ড্‌ন্ট, আর গোয়েন্দা কর্মচারীরা।

কিছুতেই তা হবে না। একটা উপায় করতেই হবে—আপনি আমার মামা এ বল্‌লেও দেখা হবে না ?

মামা ছেড়ে বাবা হলেও হবে না—দিলীপ পরিহাস করিল।

তা হলে ? কিন্তু আমি ওভাবে থাকতে পারব না—

এক কাজ করতে পার—ক্লেম্‌ করে বসো একজনকে হাজ্‌বেণ্ড বলে,—অবশ্য এমন বেকুফ যদি কেউ থাকে স্বীকার হবে তোমার দাবিতে।

মঞ্জু বলিল : মন্দ কি ? দেখি তোমাদের মধ্যে কে গল্পসল্প করতে পারে।

তার চেয়ে দেখো না কে ঝগড়া করতে পারে। নইলে তোমার জুড়ী হবে কে ?

ওঃ, তোমার দরখাস্ত পেশ করছ বুঝি ?—রিজেক্‌টেড্‌, এখনি বলে দিচ্ছি।

তা হলে একজন ডেফ্‌ এণ্ড ডাম্ব নাও—তোমার কথা যার কানে যাবে না—অথচ তুমি অজস্র বক্‌তে পারবে।

দরখাস্ত করো ত আগে।

এ্যাপ্লিকেশন্‌স্‌ আর ইনভাইটেড্‌ ফর্‌ এ ডেফ-ডাম্ব টু এ্যাক্টু এজ হাজব্যাণ্ড অন্‌ প্রোবেশন ফর এ চ্যাটারবক্‌স ?···দিলীপ বলিল।

কিন্তু ট্যাক্‌সি দাঁড়াইয়া।

গাড়ী দাঁড়াইয়া অমিতদেরও।

একের পর এক আবার নাম পড়িয়া যাইতে লাগিল কর্মচারী—কেহই বাদ যাইবে না, জানা কথা।

কিন্তু শুধু নাম নয়, চিত্র নয়, একটা নতুন অধ্যায়ের ইঙ্গিতও সঙ্গে সঙ্গে···

'মোতাহের'···বহু বহু দিনের বন্ধু অমিতের, শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসের অজ্ঞাত পর্ব হইতে আজ যে এই প্রবল শক্তিমান গতিমান বিপ্লবমুখী পর্বে আসিয়া পৌঁছিয়াছে···

'বুলকন্‌' : 'ট্রামকা বাহাদুর মজদুর'···

'মাষ্টার সাহেব'···

একবারের মত থামিয়া গেল সেই কর্মচারী ; কণ্ঠও নীরব সকলের। তারপর—

'দিলীপ দত্ত' : ছাত্র আন্দোলনের অক্লান্ত নায়ক। করতালি দিয়া উঠিল মঞ্জু !

'তপন ভট্টাচার্য' : ফিজিক্‌সের লেবরেটরি হইতে দেশলক্ষ্মী ইউনিয়নে যাহার পথ চলিয়া আসিয়াছে, আর গৌরীর স্বামী যে···

'বিজয়' চ্যাটুজ্জে' : খেলা আর ফটো তোলা হইতে কবিতায় যাত্রা করিয়া, হাত খোয়াইয়া পা হারাইয়া রশিদআলী দিবসের গুলিতে, আসিয়াছে গণ-আন্দোলনের দিকে—জনতার মর্মাবেগে যে কবিতায় মধু সংগ্রহ করিবে···

'অমিত'···ছেঁড়াপাল, ভাঙা হাল অমিত, তবে সত্যই তোমার আর-একদিনের যাত্রা হইল শুরু জোয়ারের মুখে···

তাহার ফলেই হয়ত আসিল একটু বিশ্রামের প্রয়োজন। তবু নীরব থাকিবে না কেহ। থাকিতে পারিল না।

সাড়ে আটটা বাজিতেছে যে।

'আপনাদের ট্যাক্‌সি এসেছে'—মেয়েদের বলিল এক কর্মচারী।

ট্যাক্‌সি ?

হাঁ, আপনাদের ট্যাকসিতে নেবারই নির্দেশ হয়েছে।

হবেই ত। আমরা ত আর তোমাদের মত বাজে প্রিজ্‌নার নই—হাসিয়া বলিল মঞ্জু বিজয়কে।

যাবে আর কোথায় ? শুন্‌লাম ত—দেখ্‌বে জেলখানায়—একেবারে জেনানায় ঢোকাবে—

সত্যি, অমি' মামা ?

সত্য কথা,—অমিত বুঝাইল।

আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে না আর জেলে ? ..

সম্ভাবনা নেই। জেলে তোমাদের পক্ষে আমরা সকলেই পুরুষ—বাদে সুপারিনটেণ্ড্‌ণ্ট, আর গোয়েন্দা কর্মচারীরা।

কিছুতেই তা হবে না। একটা উপায় করতেই হবে—আপনি আমার মামা এ বল্‌লেও দেখা হবে না ?

মামা ছেড়ে বাবা হলেও হবে না—দিলীপ পরিহাস করিল।

তা হলে ? কিন্তু আমি ওভাবে থাকতে পারব না—

এক কাজ করতে পার—ক্লেম্‌ করে বসো একজনকে হাজ্‌বেণ্ড বলে,—অবশ্য এমন বেকুফ যদি কেউ থাকে স্বীকার হবে তোমার দাবিতে।

মঞ্জু বলিল: মন্দ কি ? দেখি তোমাদের মধ্যে কে গল্পসল্প করতে পারে।

তার চেয়ে দেখো না কে ঝগড়া করতে পারে। নইলে তোমার জুড়ী হবে কে ?

ওঃ, তোমার দরখাস্ত পেশ করছ বুঝি ?—রিজেক্‌টেড্‌, এখনি বলে দিচ্ছি।

তা হলে একজন ডেফ্‌ এণ্ড ডাম্ব নাও—তোমার কথা যার কানে যাবে না—অথচ তুমি অজস্র বক্‌তে পারবে।

দরখাস্ত করো ত আগে।

এ্যাপ্লিকেশন্‌স্‌ আর ইনভাইটেড্‌ ফর্ এ ডেফ-ডাম্ব টু এ্যাক্টু এজ হজব্যাণ্ড অন্‌ প্রোবেশন ফর এ চ্যাটারবক্‌স্‌ ?…দিলীপ বলিল।

কিন্তু ট্যাক্‌সি দাঁড়াইয়া।

গাড়ী দাঁড়াইয়া অমিতদেরও।

একের পর এক আবার নাম পড়িয়া যাইতে লাগিল কর্মচারী—কেহই বাদ যাইবে না, জানা কথা।

কিন্তু শুধু নাম নয়, চিত্র নয়, একটা নতুন অধ্যায়ের ইঙ্গিতও সঙ্গে সঙ্গে…

'মোতাহের'…বহু বহু দিনের বন্ধু অমিতের, শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসের অজ্ঞাত পর্ব হইতে আজ যে এই প্রবল শক্তিমান গতিমান বিপ্লবমুখী পর্বে আসিয়া পৌঁছিয়াছে…

'বুলকন্‌' : 'ট্রামকা বাহাদুর মজদুর'…

'মাষ্টার সাহেব'…

একবারের মত থামিয়া গেল সেই কর্মচারী ; কণ্ঠও নীরব সকলের। তারপর—

'দিলীপ দত্ত' : ছাত্র আন্দোলনের অক্লান্ত নায়ক। করতালি দিয়া উঠিল মঞ্জু!

'তপন ভট্টাচার্য' : ফিজিক্‌সের লেবরেটরি হইতে দেশলক্ষ্মী ইউনিয়নে যাহার পথ চলিয়া আসিয়াছে, আর গৌরীর স্বামী যে…

'বিজয়' চ্যাটুজ্জে' : খেলা আর ফটো তোলা হইতে কবিতায় যাত্রা করিয়া, হাত খোয়াইয়া পা হারাইয়া রাশদআলী দিবসের গুলিতে, আসিয়াছে গণ-আন্দোলনের দিকে—জনতার মর্মাবেগে যে কবিতার মধু সংগ্রহ করিবে…

'অমিত'…ছেঁড়াপাল, ভাঙা হাল অমিত, তবে সত্যই তোমার আর-একদিনের যাত্রা হইল শুরু জোয়ারের মুখে…

গান ধরিয়াছে সবাই...গান ধরিয়াছে...গাড়ী তৈয়ারী।

অমি' মামার সঙ্গে কি কথা বলিবে, মঞ্জু আসিয়া দাঁড়াইল অমিতের কাছে।

অমি' মামা, সকাল থেকে আপনাকে একটা কথা বল্‌ব ভাবছি?—একটু স্থির হাসি মঞ্জুর মুখে এবার।

আর এতক্ষণে বল্‌ছ তা? কি এমন কথা, মঞ্জু?

এই মাত্র ঠিক করেছি—অবশ্য আর কাউকে জানাই নি—জানাব এর পরে,—আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেল।

অমিত একবারেই প্রস্তুত ছিল না। বিস্মিত হইল। পরে বলিল: হঠাৎ,—এখানে—ঠিক হল তোমার বিয়ে?

এই জন্যই ত এখানে এসেছিলাম—বর খুঁজতে, বলেছি আপনাকে সকল।—আবার পরিহাস মঞ্জুর। সেই দুষ্টু ইয়ার্কির হাসি।

সকাল বেলা এখানে পৌছিয়াই মঞ্জু দেখিল বিজয়। এবার আর বিজয়ের এড়াইবার উপায় নাই। মঞ্জু বলিল, 'এখন কথা দাও। আর 'না' বল্‌লেও শুন্‌ব না, তা ত জানোই।' কথাটা নূতন নয়। কিন্তু বিজয় আপনার সংকল্প প্রায় সুস্থির করিয়া ফেলিয়াছিল। আর যাহাই হউক, সে স্ত্রীলোকের প্রেম-প্রত্যাশা করিবে না। যাহার হস্ত প্রায় বিনষ্ট, একটি পদ প্রায় খঞ্জ, তাহাকে কেহ আত্মদান করিতে আসিবে না স্বেচ্ছায়। এমনি তাহাদের বিতৃষ্ণা থাকিবার কথা একটা বিকলাঙ্গ মানুষের প্রতি। আর যদি জানে ইহার উপরে বিজয়ের আহার কত সামান্য, ভবিষ্যৎ আর্থিকজীবন অনিশ্চিত, তাহা হইলে বিরাগ ছাড়া কিছুই বিজয় লাভ করিতে পারে না কোনো তরুণীর নিকট।

কাজের পথে তাহার পরিচয় ছিল মঞ্জুর সঙ্গে পূর্বেই। তখনো মঞ্জু ছিল হাস্যময়ী বন্ধু। কিন্তু দৈহিক দুর্বিপাকের পরে মঞ্জু তবু তাহার নিকটতর হইয়া উঠিতে লাগিল। আসিয়া গেল অন্তরের তটে। কিন্তু বিজয় আপনার সীমানায় আরও আপনাকে সুদৃঢ় করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইল। মঞ্জু কিছুতেই প্রবেশ-পথ পায় না তাহার অন্তর্লোকে। বিপ্লবের মুখে আজ পৃথিবী,

বিপ্লবের পথে সাথী তাহারা:—ইহার বেশি কোনো পরিচয়কে সত্য বলিয়া মানিতে স্বীকৃত নয় বিজয়। সত্য ইহার পরে—কবিতা।

তারপরে আজ এই কয় ঘণ্টার যুক্তিতর্ক, চিন্তা; আর শেষে—হয়ত সবিতার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পরে—উভয়ের উভয়কে স্বীকৃতি।

মঞ্জু জানাইল, বিজয় বলে কি না ওর এক হাত নেই, একখানা পাও প্রায় অচল। আমি বলি, বেশ ত, গিয়েছে যা মাত্র একটা করে, পাবে তা দ্বিগুণ করে। নাও আমার দুটো হাত, আমার এই দুটো পা।—আর জানো ত আমার হাত পায়ের মূল্য?—উম্যানস্ 'ভলি বলে' আমি সেণ্টার। আমার সঙ্গে দৌড়-ঝাঁপে পারবে তোমাদের ক'টা ছেলে? বাঃ; খেলাই বা ছাড়ব কেন? জর্জিয়ার নিনা বোলডেজডে যদি ঢাল ছুঁড়তে পারেন, ত্বিলিশের সোভিয়েটের সদস্যা হতে পারেন, জনসাধারণের হাজার কাজ করতে পারেন, আবার পালন করতে পারেন তাঁর দু' তিনটে' ছেলেমেয়ে,—তা হলে মঞ্জুও পারবে অন্তত বিজয়কে নিয়েও ওসব করতে—মিটিং করতে, মিছিল করতে, তাকে খাওয়াতে-দাওয়াতে, তার কবিতা শুনতে, আর 'ভলি বল্' খেলতে।

অর্থাৎ ঠিক হইয়াছে—মঞ্জু পথে চলিবে বিজয়কে বহিয়া লইয়া, আর বিজয় আকাশে চলিবে মঞ্জুকে বহিয়া লইয়া—অবশ্য যদি ইহার পরে, জেলের ফাঁকে ফাঁকে মিলে তাহাদের অবকাশ—পথ ও আকাশ।

গাড়ীতে উঠিতে হইবে এখনি অমিতের। তাড়াতাড়ি আপনার সুটকেস খুলিয়া কি সে খুঁজিল। তারপর বাহির করিল সেই পুরাতন বহুদিনের সহচর শেক্‌সপীয়ার। খুলিয়া মঞ্জুর হাতে দিয়া বলিল,—আর এই আমার আশীর্বাদ। মঞ্জু, তোমাকে বিজয়কে।

কিন্তু আপনি তা হলে পড়বেন কি জেলে, অমি' মামা?

জেলে পড়ার জিনিসের অভাব কি, মঞ্জু? দেখবে—এমন মহানাটক যা দেখেও শেষ করা যায় না। সৃষ্টির বিস্ময় সে, তার নাম মানুষ।

মানুষ···Man! What a noble word! সেই ত মহাকাব্য,—বিচিত্রতম মহাকাব্য সে সৃষ্টির;—আর আরও বিচিত্রতর মহানাটক সে করিতেছে সৃষ্টি।—

শেক্‌সপীয়ার এই মানব-সিন্ধুর তীরে দাঁড়াইয়াই বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন—What a piece of work is man…দেখেন নাই তখনো—What a Maker is Man. সেই মানব-রস সমুদ্রের গভীর অতল স্পর্শ করিতে পারিয়াছে অমিত মাঠে ঘাটে ক্ষেতে পথে—সহস্রের মধ্যে। স্পর্শ করিয়াছিল তাহা জেলেই; জানিয়াছিল, 'সবার উপরে মানুষ সত্য।' তাহাই স্পর্শ করিবে আবার এখন জেলে।…কিন্তু শুধু সেখানে কেন, অমিত, এখানেও—সর্বখানে—সর্ব দিকেই—তুমি পাইয়াছ সেই ভাবী মানুষের অঙ্গীকার—Man the Maker!…

অমিত মঞ্জুকে বলিল: আর বিজয় বোধ হয় প্রেমের কবিতাও লিখবে জেলে এবার। না হয় পড়বে তা'—তোমার স্তুতি—বলিয়া সে মঞ্জুর শির চুম্বন করিল।

মঞ্জু অমিতকে প্রণাম করিল—চপলা সেই মঞ্জু হঠাৎ স্থির' হইয়া গেল যেন পলকের জন্য।

কেমন একটা আনন্দ ও বেদনায় দুলিয়া উঠিল অমিতের মন:—এ দেশের মানুষও জীবনকে আজ স্বীকার করিতে জানে।…এদেশের মেয়েও—সবিতার মত ঐতিহ্য-বিমুগ্ধা ভীত সংকুচিতা মেয়েও—আসিয়া দাঁড়ায় তোমাদের পার্শ্বে। সুরর মেয়েও সুরর মত আর আপনার মধ্যে আপনাকে নীরবে নিঃশেষ করে না। ইন্দ্রাণীর মত বিদ্রোহের পথেও বিক্ষিপ্ত সে হইবে না…গৌরীর মত আপন বিক্ষোভে আঁপনি বিপর্যস্ত হইবে না, বিধ্বস্ত করিবে না স্বামী-সংসার।…মিনতির মত আঁকড়াইয়া ধরিবে না স্বামীকে, ভাগ্য-বিড়ম্বনায় মানিবে না পরাজয় নিজের ও স্বামীর।…অভিনন্দন করি, অভিনন্দন করি তোমাকে, মঞ্জু! 'মস্তিষ্ক-বিহীনা চপলা বালিকা' তুমি—তুমি 'সীরিয়াস' নও সবিতার মত? হয়ত তাই পৃথিবীতে তোমরা হালকা চরণে চলিতে শিখিয়াছ, আর হয়ত হালকা হাতে গ্রহণ করিতে শিখিয়াছ জীবনের পরম দান—জন্ম, মৃত্যু, প্রেম।…সত্য, ইতিহাসের চরম দায়িত্ব বিপ্লব। তাই বলিয়া কে বলিবে তোমরা অসার সেখানে?…গম্ভীর না হইলেই কি মানুষ গভীর হয় না? জীবন এমন কি

দুর্বহ, বিপ্লব এমন কি দুঃসহ, প্রেম এমন কি দুর্ভার—তোমরা হালকা হাসিতে তাহা গ্রহণ করিতে পারিবে না?…'মস্তিষ্ক-বিহীনা', চপলা তুমি—পিতার বিবাহের কথা বলিতেও যে সংকুচিতা হয় না এ দেশে; ভীতা হয় না যে পিতার ক্রোধে গ্রাসাচ্ছাদনের স্বাচ্ছন্দ্য বঞ্চিত হইয়াও, হাসিয়া যে নিজের জীবনকে নিজে গঠন করবার দায়িত্ব গ্রহণ করে, লঘু কণ্ঠে জানায় মাতার বেদনাময় জীবনের মর্মকথাও সে বোঝে,—আর লঘু হাস্যে যে ফাটিয়া পড়ে বন্ধুদের সঙ্গে পথ চলিতে, দাঁড়ায় ধর্মতলার মোড়ে বন্ধুদের পার্শ্বে, দাঁড়াইয়া ব্রিটিশের গুলিকে স্বচ্ছন্দে তুড়ি দেয়, গোয়েন্দা পুলিশের সঙ্গে মুখোমুখি করিতে ভয় পায় না, শালীনতা-শোভনতার বালাই লইয়াও মাথা ঘামায় না;—আর লঘুচিত্তে স্বীকার করে দিলীপের স্বচ্ছন্দ বন্ধুত্ব নিজের দায়িত্বে, স্বীকার করে বিজয়ের প্রেম আপনার দায়িত্বে। মস্তিষ্ক-বিহীনা, দায়িত্ব-বিহীনা, চপলা, মঞ্জু; তুমিও বুঝি নতুন নারী এ দেশের,—পার্বতীর মত, নারাণীর মায়ের মত, সুজাতার মত,—আর হয়ত বা দায়িত্বময়ী, কর্তব্যময়ী অনুর মতও।…

হয়ত অনুর সঙ্গে আর অমিতের দেখা হইবে না।…কঠোর গোপনতায় অনুর দিন যাইবে⋯শুরু হইল তাহার যাত্রা গভীরতর বাধা-বিঘ্নের পথে, তাহার ও শ্যামলের। সংগ্রামের বিষম পরীক্ষায় প্রতিটি মুহূর্তে যাচাই হইবে তাহারা। কিন্তু সে অনু; সে আত্মসচেতন, দৃঢ়চিত্তা;—মঞ্জুর মত হাস্যময়ী সে নয়, সে মমতাময়ী কিন্তু কর্তব্যময়ী। মাতৃহীন গৃহে সে গুরু দায়িত্ব লইয়াছে সহজ চিত্তে, মঞ্জুকে দিয়াছে স্নেহ, বার্ধক্যগ্রস্ত পিতাকে সেবা করিয়াছে তৃপ্ত অন্তরে; আপন শক্তিতে ইন্দ্রাণীর মতই সে আপনাকে গঠন করিয়াছে, বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি দিয়া আপনার পথ নির্বাচন করিয়াছে; আপন দায়িত্বে গ্রহণ করিয়াছে জীবনের সঙ্গীকে—দুইজনে স্থির পদে আগাইয়া চলিয়াছে এই কঠিন পথে—বাহুল্য নাই, চাপল্যও নাই; স্বভাবে তাহার সংকোচও নাই, কিন্তু আছে সহজ সম্ভ্রম বোধ, আছে মর্যাদাবোধ,—সাধারণ মানুষের মর্যাদায় বিশ্বাস।…হয়ত পিতৃ-স্বভাব পাইয়াছে অনু, পাইয়াছে সেই ব্যক্তিত্ব।…কত বড় রূপান্তর—ভাবো, অমিত,—কত বড় রূপান্তর সুর থেকে মঞ্জু; সেই সবিতা থেকে এই সবিতা, তোমার

পিতা থেকে মহু, অহু,—আর তুমি! সেদিনের উদার মানবতাবোধ আজ উদ্বুদ্ধ দৃষ্টিময় মানবতাবাদে···কোথায় এখন তোমার 'সপ্তম হইতে নবম শতাব্দীর বাঙলার ইতিহাস', কোথায় তোমার উনবিংশ শতকের বাঙালী জাগরণের বিশ্লেষণ, অতীত ভারতের ইতিহাসে শ্রেণী-সংগ্রামের অনুসন্ধান, অধ্যয়ন?···

'কোথায় তোমার পরিচয়' অমিত?' জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ব্রজেন্দ্র রায়। সে পরিচয় আর লেখায় ফুটিল না, কথায় ফুটিল না, ফুটিল না প্রেম-মণ্ডিত গৃহ-রচনায়; ধ্যান-সুন্দর, প্রীতি-সুন্দর গোষ্ঠী-রচনায়; একান্তে বসিয়া আত্ম-রচনায়। জ্ঞানে চিন্তায় ভাবনায়, কাব্যে-কলায়, শিল্পে—কোথাও আর কোনো পরিচয় নাই তোমার। পৃথিবীর চক্ষে তাই ব্যর্থ, বিক্ষিপ্ত তুমি। কিন্তু মানুষের এই মহদভিযানের মধ্যে মিলাইয়া গিয়াও সম্পূর্ণ তুমি। জীবনের এই জোয়ারের মধ্যে ডুবিয়া ভাসিয়া পাইয়াছ জীবন-রসের পরম আস্বাদন···মানুষের এই মহাস্রোতে আপনাকে ঢালিয়া দিয়াই পাইয়াছ কৌতুকে আনন্দে মানব-মহারসের অপরূপ উপলব্ধি। Only in intense living do we touch infinity.···

আশ্চর্য সুন্দর চন্দ্রালোকিত এই পৃথিবী। বাহিরে যে কৃষ্ণ-প্রতিপদের আকাশ এতক্ষণ এত জ্যোৎস্না ঢালিতেছিল কে জানিত? দেবদারুর পত্রান্তরাল হইতে আকাশের আলোক ছক্ কাটিয়া দিয়াছে গোয়েন্দা আপিসের প্রাঙ্গণের পথে, ঘাসে। চৈত্রের হাওয়া মাতলামি করিতেছে নবপত্রে রোমাঞ্চিত বৃক্ষরাজির ডালে ডালে। আর ইহারই মধ্যে বসন্তের কোকিলও ডাকিতেছে—এই গোয়েন্দা অপিসের ছায়াঘন গাছের শাখায়।···অস্বীকার করিবে—পৃথিবী পরমা সুন্দরী? কে না বলিবে—The poetry of earth is never dead.

ব্ল্যাক মেরিয়া আহ্বান করিতেছে? করুক আহ্বান।

The world's great age begins anew,

The golden years return.···

চলিয়ে! জেল তোড় দিয়ে ফিরব আমরা,—বুলকন সোৎসাহে বলিল, "ইন্‌কেলাব জিন্দাবাদ!'—লাফাইয়া গাড়ীতে উঠিল বুলকন্।

ইন্‌কেলাব জিন্দাবাদ!

জেলের যাত্রী, না, আমরা অগ্রযাত্রী আগামীকালের? অমিত আপনা-আপনি ভাবিতে লাগিল।

ট্যাক্সিতে উঠিয়া পড়িতেছে সুজাতা, টুলু; মঞ্জু করিতেছে কি? উঠিবে না নাকি?

আপনাদের গাড়ী না ছাড়তে আমরা যাব না—তারপরে আপনাদের গাড়ী ছাড়িয়ে যাব আগে।—অমিতকে বলিল মঞ্জু।

যাবেন আর কোথায়? একখানেই ত?—হাসিয়া ব্ল্যাক মেরিয়ার ভিতরে উঠিয়া গেলেন মাষ্টার সাহেব।···কতবারের চেনা তাহার এই ব্ল্যাক্‌মেরিয়া··· সেই একই ব্ল্যাক মেরিয়া উনিশ শ একুশেও ছিল, উনিশ শ আটচল্লিশেও আছে ··আই গো অন্ ফরএভার···আই গো অন ফর এভার···ব্ল্যাক মেরিয়া ও ব্ল্যাক অ্যাক্‌ট···পুলিশ রাজ ও শোষণ-তন্ত্র ··আর অন্যদিকেও একই মানুষ—মানুষের দরদে যাহার প্রাণ স্বস্তি পাইল না—সেই প্রথম জীবনের প্রারম্ভ হইতে—গতিমান মানুষ। to whom the miseries of the world Are misery, and will not let them rest.···

উঠিয়া বসিল তপন ভট্টাচার্য। 'বড় অন্ধকার ভিতরটা'। প্রথম যাত্রা তপনের এইপথে, এ গাড়ীতে···ফিজিক্‌সের লেবরেটারি আর ফিলজফির ক্লাশ-রুম পার হইয়া চটকল ও সূতাকলের সংগ্রাম ক্ষেত্রের মধ্য হইতে এই সে পা বাড়াইল···ইন্ কোয়েষ্ট অব রিয়ালিটি। বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ অধ্যাপক বংশের সন্তান সে—সে থামিবে না, থামিবে না···হে সত্য, আবীরাবীর্ম এধি। আবীরাবীর্ম এধি!—

কানাই হাজরা আস্তে আস্তে উঠিল। পুলিশে ধরিয়াছে কতবার, গাড়িতে চড়িয়া থানায় যাইতে পায় নাই, হাঁটিয়া যাইতে হইয়াছে। দুই একবার হাতকড়িও দিয়াছে। এখানে শহরে না হইলে এবারও দিত, আর কানাইয়ের সঙ্গে তাহা লইয়া ঝগড়া হইত, মারামারিও হইত, না হইলে হাতকড়ি পরাইতে পারিত কেহ তাহার হাতে? চাষীর ছেলে সে

কানাই হাজরা…লেনিনের পার্টির মেম্বর।…পা দানীতে পা-রাখিয়া ধীরভাবে উঠিল কানাই। কৃষকের সংগ্রামের পথ অগ্রসর হইয়া গিয়াছে—অগ্রসর হইয়াছে কানাই হাজরা শ্রমিক সংগ্রামের সহযাত্রীরূপে—শ্রমিকপার্টির অভ্যন্তরে ••

কি বিজয়—উঠ্ছ না?—পরিহাস স্বচ্ছ হাস্যে মঞ্জু তাড়না দিতেছে—কবিতা মনে পড়ে নাকি এই চাঁদ দেখে—

বিজয় তাহার দিকে তাকাইয়া হাসিল। বলিল, পড়ত, কিন্তু তোমাকে দেখে সাধ্য কি আর কিছু মনে করি রামনাম ছাড়া?

রামধুন গায়ক-গায়কীদের দলে যোগ দাও গে—মাসীমা আছেন—

বিজয় খোঁড়া পায়ে ত্বরিত-পদে গাড়ীতে চড়িতে গেল।

কিন্তু এখানে আছ তুমি—পালাই ত আগে।…অদৃশ্য হইয়া গেল বিজয় গাড়ীর ভিতরে।

একটা শাদা হাফ্‌শার্ট ও ধুতি আর একজোড়া চক্ষু যাহার চশমা অন্ধকারেও ঝক্‌-ঝক্‌ করিতেছে, আর তাহার পিছনে আছে একজোড়া চোখের দৃষ্টিও—নিশ্চয়ই মঞ্জুর উপর তাহা নিবদ্ধ। মঞ্জুর চঞ্চল চক্ষুও কি তাহাকে খুঁজিতেছে না? না, সে জানে না তাহার এই ইতিহাস?…প্রেমের কবিতা লিখিবে নাকি বিজয়? 'জন-সমুদ্রে লেগেছে জোয়ার'—আর সে জোয়ারে ভাসাইয়াছে বিজয় তাহার জীবন—কবিতার অভিসারে…জীবনের পথ…রসলোকের পথ ··তারপরে?…তারপরে 'হব ইতিহাস।'

উঠিয়া পড়ো অমিত, চলো চলো…এইত তোমারও পথ·· ইতিহাসের পথ, জীবনের পথ, মানব-তীর্থের পথ…

সানন্দ চরণে অমিত উঠিয়া গেল, গাড়ীর অভ্যন্তরে যেন লাফাইয়া প্রবেশ করিল। অনেকদিন পরে যেন পদে তাহার যৌবনের চপল অস্থিরতা।

উঠিয়া আসিতেছে সকলে। গান ধরিয়াছে বন্ধুরা…

গাড়ী এবার চলিবে। ইঞ্জিন ষ্টার্ট লইতেছে। সমবেত কণ্ঠে সবল ধ্বনির মধ্যে তাহা শোনা যায় না…'ইণ্টারন্যাশনাল মিলাবে মানব-জাত'…শুনিতে

পাও না, অমিত, তোমার বুকের হৃদ্‌পিণ্ডের তালে তালে সেই মানব মহামিলনের সঙ্গীত?—পাও না সেখানে অনু-মঞ্জুর বক্ষস্পর্শ? শোনো না পিতৃপিতামহের আশীর্বাণীর সঙ্গে উঠিতেছে ইতিহাসের অমর সঙ্গীত, জীবনের কল-কল্লোল, আর মানবতার জয়গান?

সারা দিনের মানুষের মুখচ্ছবি চমকিয়া উঠিতেছে অমিতের মনের পটে:

অণু আর মনু, মঞ্জু আর বিজয়, তপন আর বুলকন; কানাই আর মোতাহের, সৈয়দ আলী আর মাষ্টার সাহেব, সুবীর আর সুরেশ—তারপর, বাঙালী পার্বতী আর বিলাসপুরীয়া মংগলী·· আবার অণু আর শ্যামল, এবং আরও যাহারা চলিয়াছে দুর্গম অন্ধকারে, বিপ্লবের মহাশিল্পী···কত বিচিত্র এই সহযাত্রী দল!···শ্রমিকের পথ, বুদ্ধিজীবীর পথ, কর্মজীবীর পথ; কবিতার পথ, বিজ্ঞানের পথ, স্বাধীনতার পথ, মানবতার পথ,—জীবনের পথ, সৃষ্টির পথ;—সকল যাত্রীর সকল পথ কোথায় চলিয়াছে আজ?—না মানুক ইন্দ্রাণী, না বুঝুক সকলে,—অমিত তাহা দেখিতে পাইতেছে এ মুহূর্তে:

All roads lead to Communism.

সকল পথ পৌঁছিয়াছে সাম্যবাদে।···

হেড লাইট্ জ্বালিয়া টর্ন দিয়া ব্ল্যাক মেরিয়া বাহির হইয়া পড়িতেছে গোয়েন্দা আপিস ছাড়িয়া।—বিদ্যুৎদীপ্তিসমুজ্জল পথ অমিতের সম্মুখে।

'ইণ্টারন্যাশনাল মিলাবে মানব-জাত'···গাড়ীর মধ্য হইতে উঠিতেছে ঐকতান···উঠিতেছে অমিতের ব্যক্তি-জীবনের মধ্যেও শত দেশের শত বিচিত্র সহযাত্রীর এই ঐকতান।···মানবতার পথে, সৃষ্টির পথে, আমরা সতীর্থ, সহযাত্রী, সার্থক।···এই মুহূর্তে অমিতের বক্ষের ধ্বনি সেই সঙ্গীতের সঙ্গে আপনাকে মিলাইয়া সার্থক; এই মুহূর্তে বিশ্ব-জোড়া সেই বিচিত্র সহযাত্রীর করস্পর্শ তাহার করে; বিচিত্র বিপুল জগতের স্পন্দন তাহার রক্তে: জীবন্ত সেই The collective soul in "I". গতিময়, জ্যোতির্ময়, সৃষ্টিময় এই মানব-সত্তাকে কি করিয়া বলিবে আর a mere handful of dust?

অজিতের মন প্রত্যয়ে সমৃদ্ধ, বাঙ্‌মুখর ; জানিয়াছি আমরা এ যুগের [illegible]—Man : What a noble word !···আর সেই মানুষ তোমরা, তুমিও অমিত ; ··অণোরণীয়ান্ তুমি মহতোমহীয়ান—

এক-একটি মানুষের মধ্যে—প্রতিটি সাধারণ এই মানুষের মুখেও—আজ সেই বিচিত্র বিরাট ভাবী মানুষের মুখচ্ছবি—সৃষ্টির সুমহৎ স্বাক্ষর : Man the Maker।

এক-একটি দিনের মধ্যে—প্রতিটি এই সাধারণ দিনের মধ্যেও—রূপান্বিত ইতিহাসের সেই আর একদিন—বিঘোষিত তাহার মহদাশ্বাস : "অয়মহং ভো !"

শেষ